রিমেইক ভার্সন

জাকারিয়া মাসুদ

নারীদের যেন লবণের মতো। সবকিছুতেই একটু-না-একটু লাগবে। ১টাকার শ্যাম্পু থেকে নিয়ে লাখ টাকার গাড়ি—কোথায় নেই নারী? খবরপত্র কিংবা বিজ্ঞাপন, সবখানেই নারীর মুখচ্ছবি। ম্যাগাজিনের পাতায় পাতায় নারীকে যতটা উত্তেজক করে উপস্থাপন করা হয়, তার সিকিভাগও কি পুরুষকে করা হয়? নায়কেরা সব সময় কাপড় পরে থাকে, আর নায়িকারা খোলা রাখে বেশিরভাগ অঙ্গ। কী শীত কী গরম, কাপড় খোলা রাখতেই হবে। এমন আঁটসাঁট পোশাক পরতে হবে, যেগুলো দিয়ে শরীরের অবয়ব বোঝা যায়। দেখাতে হবে অদেখা অঙ্গগুলো। নয়তো মার্কেট জমবে না। পণ্যের পসরা সাজাতে পারবে না কর্পোরেটরা। জমবে না ক্যাসিনো কিংবা জুয়ার আড্ডা। নারী কি এতটাই কমদামি কোনো বস্তু?

আল্লাহর শপথ, নারীদের সম্মান বহু ঊর্ধ্বে। কিন্তু সেই সম্মানকে ধূলিসাৎ করেছ তোমরা। নিজ হাতে গলা টিপে হত্যা করেছ নিজেদের আত্মসম্মানবোধকে।

ফিমেইল ভার্সন

সূচিপত্র

চাঁদের আভা ছড়িয়ে যাবে তোমার হৃদয়গগনে ১১

ডুবিয়ে তরী ঝাঁপিয়ে পড়ি ২৭

এটার নামই জীবন? ৩৪

খুলো তব হৃদয়নন্দনদ্বার ৫০

সেই সে বিভাবরী ৬০

মৃত্যুকে তুমি সুন্দর করিয়াছ! ৬৮

কাছে আসার সাহসী গল্প ৮১

ফারাক সবিস্তর সকল কাজে ৯০

লজ্জা ঈমানের অঙ্গ ১০৮

চাঁদের হাসির বাঁধ ভেঙেছে ১১৯

ঘরনি হও, জান্নাত পাবে ১৩০

স্বাধীনতার সুখ ১৪১

আসমানি আবরণ ১৫২

তবুও অনেক দেরি হয়ে যাবে ১৬৯

তুমি ফিরবে বলে ১৭৪

ভূমিকা

বইটির কোনো ভূমিকা নেই। আমি চাচ্ছি না, ভূমিকা পড়ার সময়টুকুও নষ্ট হোক তোমার। এর চেয়ে বরং মূল আলোচনায় চলে যাই আমরা। ঝটপট এক কাপ কফি বানিয়ে ফেলো। দুধ-চিনি একটু বাড়িয়ে দিয়ো। ধোঁয়া ওঠা কফি খেতে খেতে আলোচনা শুনতে খুব একটা খারাপ লাগবে না আশা করি।

চাঁদের আভা ছড়িয়ে যাবে তোমার হৃদয়গগনে

রাকিব আমার ক্লাসমেট। ক্লাসে সে আর আমি পাশাপাশি বসি। দুজনেই ব্যাকবেঞ্চার। তবে আমাদের মধ্যে আকাশ-পাতাল ব্যবধান। রাকিব ধনী বাবার সন্তান, আর আমি নিতান্তই মধ্যবিত্ত ফ্যামিলির ছেলে। কিছুটা ব্যতিক্রমতা থাকে উচ্চবিত্তদের লাইফ স্টাইলে। আড্ডা-ফুর্তি-গান নিয়েই মত্ত থাকে তারা। রাকিবও তেমন। বলে রাখা ভালো, রাকিব ওর ছদ্মনাম। ইচ্ছে থাকলেও আসল নামটা বলতে পারছি না। ও বারণ করেছে।

ভার্সিটিতে লাঞ্চ ব্রেক হয় বেলা একটায়। একটার দিকেই মসজিদে আজান হয়। সোয়া একটায় সালাত। সালাত শেষে দুপুরের খাবার খেতে ক্যান্টিনে গেলাম দুজনে। লাঞ্চ করতে করতে রাকিব জানাল, নিজের জীবন নিয়ে এখন সে অতিষ্ঠ। কেন জানি হতাশার সাগরে ভেসে বেড়াচ্ছে নিয়মিত। কোনো কাজেই ওর মন বসছে না। তাই সিদ্ধান্ত নিয়েছে—লাইফস্টাইল চেঞ্জ করবে।

রাকিবের কথা শুনে বেশ খুশি হলাম। মনে হলো, আলো-আঁধারজড়ানো একটা জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটতে যাচ্ছে। কেউ এমন জীবনের দিকে ফিরে আসছে, যেখানে ঘনকালো মেঘের দেখা মিলে না কখনো। নেই পিলে চমকানো বজ্রপাতের আওয়াজ। এখানে কেবল আলো আর আলো।

রাকিব ওর হতাশার কারণগুলো জানাল। ধনী বাবার একমাত্র ছেলে সে। বাবা বড় ব্যবসায়ী। বাবার কাছে আবদার করে কোনো কিছু পায়নি, এমন রেকর্ড

নেই লাইফে। আইফোন থেকে শুরু করে ম্যাকবুক, সবই আছে ওর। কিন্তু এতকিছুর পরেও সে শূন্যতা অনুভব করে। মাঝে মধ্যে চুপিচুপি কাঁদে।

ক্লাস শেষে বাসায় ফিরছিলাম আমি। রাকিব জোর করে ফুচকা চত্বরে নিয়ে গেল। ওখানটায় একটা দীঘি আছে। ছোট ছোট বসার বেঞ্চ বানানো হয়েছে দীঘির পাড়ে। সেখানে বসে প্রকৃতির মনোরম দৃশ্য উপভোগ করা যায়। দুজন একটা বেঞ্চে বসলাম। সামনে দীঘি, আশেপাশে গাছপালা, গাছের ফাঁক-দিয়ে-আসা বিকেলের মিষ্টি রোদ, ঝিরিঝিরি বাতাস—সব যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছিল আমাকে। গাছগুলোতে বসন্তের হাওয়া লেগেছিল বলেই নতুন পাতা উঁকি দিয়ে যাচ্ছিল ডালে ডালে। পাখির কিচিরমিচির আওয়াজও ভেসে আসছিল কানে। বেশ সুন্দর লাগছিল পরিবেশটা।

রাকিব জানাল, কদিন ধরে ঘুমোতে পারছে না সে। চোখে ঘুম থাকলেও অন্তর জেগে থাকছে। রাত পেরিয়ে যাচ্ছে বিছানায় গড়াগড়ি করে আর গান শুনে। কাল ঘুমের ট্যাবলেট খেয়ে ঘুমোনোর চেষ্টা করেছে। তবুও প্রশান্তির ঘুম জুটেনি কপালে। কেন জানি একটা হাহাকার থেকেই যাচ্ছে অন্তরে। কিন্তু সেটা কিসের হাহাকার—তা ধরতে পারছে ঠিকমতন। বুঝে উঠতে পারছে না, কী করবে এখন। কিভাবে এই মনোবেদনার উপশম হবে।

ফুচকা খেতে খেতে আমি ওকে কিছু ঘটনা শুনালাম। ঘটনাগুলো একটু গুছিয়ে লিখেছি এখানে :

এক.

মডেল সিনহা রাজ। পুরো নাম মাহাতারা রহমান শৈলী। মা-বাবা'র একমাত্র সন্তান। ছোটবেলা থেকেই বেশ আদরে-যত্নে মানুষ হয়েছে সে। বাবা-মা'র চোখের মণি ছিল শৈলী। বিয়েও দিয়েছিলেন তাদের পছন্দে। কিন্তু স্বামীকে পছন্দ হয়নি তার। তাই নতুন করে সংসার গড়েছিল অভিজিতের সাথে। স্বামী-স্ত্রী দুজনেই কাজ করত মিডিয়ায়। অভিজিৎ অভিনয় করত বিভিন্ন নাটকে। পরিচালক হিসেবেও কাজ করত মাঝে মধ্যে। ওই জগতে তার নাম ছিল অভিজিৎ অভি।

মহাখালীর দক্ষিণপাড়া-র ভাড়া বাসায় থাকতেন দুজন। বাইরে বাইরে খুব ভালোই কাটছিল সাংসারিক জীবন। মিডিয়ার দুজনের উপস্থিতি স্বাভাবিকই

ছিল। কিন্তু কোনো এক মধ্যরাতে ফ্যানের সঙ্গে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখা যায় সিনহাকে। অভিজিৎ ও প্রতিবেশীরা তাকে নামিয়ে আনে। আশঙ্কাজনক অবস্থায় নিয়ে যাওয়া হয় মহাখালী মেট্রোপলিটন হাসপাতালে। কিন্তু ততক্ষণে সব শেষ। হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করে। তীব্র হতাশা আর বুকচাপা কষ্ট নিয়ে আত্মহত্যার পথ বেছে নেয় শৈলী।

দুই.

চেস্টার বেনিংটন। একজন মার্কিন গায়ক। গীতিকার এবং অভিনেতা। বহুল পরিচিত লিংকিন পার্কের ভোকাল। এ ছাড়া দুটো রক ব্যান্ড ডেড-বাই-সানরাইজ ও স্টোন-টেম্পল-পাইলটসের সাথেও জড়িত ছিল সে। চেস্টার পরিচিতি লাভ করে ২০০০ সালে—লিংকিন পার্কের 'হাইব্রিড-থিয়োরি'তে ভোকাল হিসেবে গান গাওয়ার মাধ্যমে। অ্যালবামটি ব্যাপক সফলতা পায়। ওই দশকের সেরা অ্যালবামের তালিকায় স্থান করে নেয় হাইব্রিড-থিয়োরি। এরপর আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি চেস্টারকে।

লিংকিন পার্ক-পরবর্তী ওর স্টুডিয়ো অ্যালবামগুলো হলো—মিটিয়োরা, মিনিটস্-টু-মিডনাইট, এ-থাউজ্যান্ড-সানস্ এবং লিভিং-থিংস্। এগুলো যথাক্রমে ২০০৩, ২০০৭, ২০১০ এবং ২০১২ সালে প্রকাশ পেয়েছে। বেনিংটন তার নিজের ব্যান্ড ডেড-বাই-সানরাইজ শুরু করে ২০০৫ সালে। ব্যান্ডটির প্রথম অ্যালবাম 'আউট-অব-অ্যাশেজ' প্রকাশিত হয় ২০০৯ সালের অক্টোবরের ১৩ তারিখ। বেনিংটনকে শ্রেষ্ঠ ১০০ হেভি মেটাল ভোকালিস্টদের একজন মনে করা হয়।

গত ২০ জুলাই, ২০১৭-তে ক্যালিফোর্নিয়ার নিজ বাড়িতে তার ঝুলন্ত লাশ পাওয়া যায়। লক্ষ জনতার মনজয়কারী এ গায়ক লস অ্যাঞ্জেলসের 'পালোস ভার্দোস স্টেটে' আত্মহত্যা করে। লাখ লাখ ফ্যান-ফলোয়ারদের কাঁদিয়ে নিজের অতৃপ্ত অশান্ত আত্মার কাছে পরাজিত হয় বেনিংটন। গলায় দড়ি দিয়ে দুর্বিষহ জীবনের সমাধান খুঁজে নেয় ও।

তিন.

২৪ মে, ২০১৭। মঙ্গলবার। ভোর ৫টা নাগাদ মিরপুরের রূপনগরের সাবলেট বাসা থেকে ফ্যানের সঙ্গে ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার করা হয় একটি লাশ। মডেল

সাবিরা হোসাইনের লাশ। ওই ভাড়া-বাসায় বাসায় একাই থাকত সে।

সাবিরা বিভিন্ন ফ্যাশন হাউজের মডেল হিসেবে কাজ করত। পাশপাশি মোহনা টেলিভিশন এবং গান বাংলা টেলিভিশনের মার্কেটিং অ্যাক্সিকিউটিভ হিসেবে কর্মরত ছিল। পারিবারিক ও প্রেমঘটিত কারণে বেশ ক'মাস মানসিকভাবে বিপর্যস্ত ছিল সাবিরা। ফেসবুকে আত্মহত্যার বিষয়ে ইঙ্গিতও দিচ্ছিল সে। শেষমেশ মানসিক বিপর্যস্ততার হাত থেকে বাঁচতে আত্মহত্যা করে সাবিরা। গলায় ফাঁস লাগিয়ে অনন্ত অসীমের পথে যাত্রা করে।

চার.

রক ব্যান্ড অ্যামারসন এবং লেক অ্যান্ড পামারের সহপ্রতিষ্ঠাতা কিথ অ্যামারসন। মারা গেল ৭১ বছর বয়সে। বিখ্যাত এই ব্যান্ডটির সদস্যদের ফেইসবুক পেইজে এ খবর নিশ্চিত করা হয়েছে। ফেইসবুক পেইজে প্রকাশিত বিবৃতিতে বলা হয়— 'আমরা অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, কেইথ অ্যামারসন সান্তা মনিকা, লস অ্যাঞ্জেলসে তার নিজের বাড়িতে মারা গেছেন।'

অ্যামারসনের গার্লফ্রেন্ড মারি কাওয়াগুচি শুক্রবার সকালে ওর মৃতদেহ আবিষ্কার করে। স্থানীয় পুলিশ জানিয়েছে, নিজের মাথায় গুলি করে আত্মহত্যা করেছে সে।

ওদিকে মোহাম্মদপুরের বাসায় গলায় ওড়না পেঁচিয়ে আত্মহত্যা করে লাক্স তারকা সুমাইয়া। একসময়ের জনপ্রিয় অভিনেত্রী ডলি আনোয়ারও একই পথে হাঁটে। গত ক'বছরে তারকাদের আত্মহত্যার তালিকা শুধু লম্বাই হচ্ছে। যেখানে রয়েছে—মডেল ও অভিনেত্রী মিতা নূর, লাক্স তারকা রাহা, মডেল ও অভিনেতা মঈনুল হক অলি, সিনহা, নায়লা, লোপা, সাবিরা, পিয়াস-সহ আরও অনেকেই। আর আত্মহত্যার চেষ্টা করেও বেঁচে আছে লাক্স তারকা জাকিয়া বারী মম, কণ্ঠশিল্পী নাজমুন মুনিরা ন্যানসি, মডেল ও অভিনেত্রী প্রভা এবং সারিকা। এর বাইরে অপ্রকাশিত তালিকায় যে কত শত অভিনেতা-অভিনেত্রী লুকিয়ে আছে, তা আল্লাহই ভালো জানেন।

এই ঘটনাগুলো শোনানোর পর আমি জিজ্ঞেস করলাম রাকিবকে—'আচ্ছা, এই তারকারা কেন আত্মহত্যা করল? কিসের অভাব ছিল ওদের? জনপ্রিয়তা?'

রাকিব বলল, 'নাহ। আমাদের থেকে হাজারগুণে বেশি জনপ্রিয় ছিল ওরা।'

'তা হলে কি টাকা-পয়সার অভাব ছিল?'

'নাহ, তাও তো না। অভিনেতা-অভিনেত্রীদের টাকা কম থাকবে নাকি?'

'তা হলে? কী ছিল না তাদের? কোন জিনিস না পাওয়ার বেদনা তাড়া করত ওদের? কেন মানসিকভাবে বিপর্যস্ত থাকত ওরা? আর এতকিছু পাওয়ার পর কেনই বা আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে হয়েছে?'

আমার প্রশ্নের কোনো উত্তর দেয়নি রাকিব। নিশ্চুপ বসে ছিল।

রাকিবকে করা প্রশ্নটা আমি তোমাকেও করতে চাই। তোমাকেও জিজ্ঞেস করতে চাই—ওরা কেন আত্মহননের পথ বেছে নিল?

আমি জানি না, তুমি কী উত্তর দেবে। তবে উত্তরটা শোনার আগে একটা হাদীস বলতে ইচ্ছে করছে। বলে নিই সেটা। প্রিয় নবি ﷺ বলেছেন,

> "জেনে রাখো, শরীরের মধ্যে একটি গোশতের টুকরো আছে। যখন তা ঠিক হয়ে যায়, তখন পুরো শরীরটাই ঠিক হয়ে যায়। আর যখন তা খারাপ হয়ে যায়, তখন পুরো শরীরটাই খারাপ হয়ে যায়। জেনে রাখো, সে গোশতের টুকরোটি হলো অন্তর।"[১]

অন্তর হলো জীবনের মূল চালিকাশক্তি। অথচ সেইটাকেই তোমরা অস্বীকার করো বিজ্ঞানের নাম দিয়ে! আজকাল বিজ্ঞানশরীফ হয়ে গেছে ছেলের-হাতের-মোয়া। যে যেভাবে চাচ্ছে, সেভাবেই ব্যবহার করছে। বিজ্ঞানের দোহাই দিয়ে দিনদিন মানুষকে বস্তুবাদী আর যন্ত্রপূজারি করে তোলা হচ্ছে।

এসব বিজ্ঞান-অজ্ঞানের চিন্তা ঝেড়ে ফেলে, চুপটি করে একবার ভাবো তো—অন্তর ভালো থাকলে জীবনটা কি সতেজতায় ভরে যায় না? আর মনটা খারাপ হলে জীবনটা কি থমকে যায় না ক্ষণিকের জন্যে? ঘনকালো মেঘ কি চেপে বসে না জীবনের নীলাজনীল আকাশে?

আমি জানি, বস্তুবাদ তোমায় এই সত্যিটা ভুলিয়ে দিয়েছে। তোমাদের শেখানো হয়েছে—জীবন মানেই সেক্স-মিউজিক-মুভি-ড্রাগ-মানি। এনজয় করো, মাস্তি

---

[১] বুখারি, মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল, আস-সহীহ, অধ্যায় : ঈমান, হাদীস : ৫০।

করো, ইচ্ছেমতো আমোদ-ফুর্তি করো, টাকা ওড়াও। এরপর মরে যাও। ব্যস, তুমি সফল। এর বাইরে আর কিছু নেই। কিছু পাওয়ার নেই, চাওয়ার নেই। এগুলোই জীবন।

তোমরাও দেধারছে ওসব গিলছ। হুমড়ি খেয়ে পড়ছ ওসবের ওপর। বৈশ্বিক বাণিজ্যবাদীরা যা যা নির্ধারণ করে দিচ্ছে, ওগুলো দিয়েই নিজের জীবন সাজাচ্ছ। হৃদয় প্রশান্তকারী উপাদান খুঁজে বেড়াচ্ছ ওদের বেঁধে-দেওয়া জীবনব্যবস্থার মধ্যে। ওদের সংস্কৃতির মধ্যে। ওদের আবিষ্কৃত দেহসজ্জার উপকরণের মধ্যে।

কিন্তু এসব কি আদৌ অন্তরকে নির্মল করতে পারে?

দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি দিতে পারে মানুষকে?

এসব যদি সত্যিই হৃদয়ের উঠোনে ফাগুনহাওয়া এনে দিতে পারত, তবে তো আত্মহননের পথ বেছে নিত না বিত্ত-বৈভবের মাঝে বেড়ে ওঠা মানুষগুলো। নির্জনে চোখের জল ফেলত না রাকিবের মতো ধনীর দুলালরা। না পাওয়ার বেদনা তাড়া করত না সুপার স্টারদের। লাখ লাখ ফলোয়ার থাকা সত্ত্বেও ধুলোর আস্তরণ জমত না সেলিব্রেটিদের হৃদয়পটে। স্বামী থাকার পরও যাস্ট ফ্রেন্ডের কাছে সবকিছু সঁপে দিয়ে প্রশান্তি খুঁজত না প্রভারা। আত্মহত্যা করত না শৈলিরা।

আধুনিক বিশ্বের সাথে খাপ-খাওয়াতে-চাওয়া মানুষগুলোর অন্তরটা শূন্যই রয়ে যায়। ওরা সারাক্ষণ 'আরও চাই' 'আরও চাই' স্লোগানে ডুবে থাকে। পান থেকে চুন খসলেই বেঁচে থাকাটা অর্থহীন হয়ে যায় ওদের কাছে। আসলে যাদের অভিধানে 'আখিরাত'-নামক কোনো শব্দের স্থান নেই, তাদের তো এমনটা হবেই। দুনিয়ার সুখ-শান্তিই যাদের কাছে মুখ্য বিষয়, হতাশা তাদের গ্রাস করবে না তো কাদের করবে!

আমার কাছে মনে হচ্ছে, রাকিবের মতো তুমিও হতাশায় নিমজ্জিত। জীবনের সঠিক গন্তব্য না থাকার কারণে, তোমার হৃদয়টাও হয়তো ক্ষত-বিক্ষত। না পাওয়ার বেদনাই তোমার নিত্যসঙ্গী।

আসলে বাহ্যিক উন্নতি-প্রগতিই তো মূল বিবেচ্য বিষয় তোমার কাছে। বয়ফ্রেন্ড-ফেইসবুক-মিউজিক-সেলফি-কসমেটিকস—এগুলোর চিন্তায় বিভোর হয়ে

আছ তুমি। আত্মিক জিনিসপত্তরের কোনো ঠাঁই নেই তোমার জীবনাকাশে। বোন আমার, বিশ্বাস করো, এসব ধোঁকার সামগ্রী তোমায় সাময়িক উত্তেজিত করতে পারে। কিন্তু কখনোই অন্তরকে নির্মল করতে পারে না। কক্ষনো না। শুধু একটা জিনিসের মাধ্যমেই অন্তর তৃপ্তি পায়। প্রশান্ত হয়। জানো, সেটা কী?

"জেনে রাখো, আল্লাহর স্মরণেই অন্তর প্রশান্ত হয়।"[২]

আসলে হৃদয়ের স্রষ্টা এভাবেই সেটাপ করেছেন হৃদয়কে। শুধু আল্লাহর স্মরণের মাধ্যমেই হৃদয়ের আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ ওঠে। নিশিতে জোছনা ছড়ায়। আলোকিত করে জীবন-চলার পথকে।

জীবন যবে রাঙিয়ে নিবে মহান রবের স্মরণে
চাঁদের আভা ছড়িয়ে যাবে তোমার হৃদয়গগনে
ওই আলোতে পদ ফেলে, হাঁটবে তব পরান মেলে
সমুখ-পানে চলবে তুমি একলা আপন-মনে
জোছনাখানি মিতে হয়ে থাকবে তোমার সনে

অন্তরে যখন মহান আল্লাহ ছাড়া প্রসাধনী-মেইকআপ-ড্রেসআপ ইত্যাদি জিনিস স্থান পাবে, তখন হতাশা কেবল বাড়তেই থাকবে। না পাওয়ার বেদনা তাড়া করবে ক্ষণে ক্ষণে। 'কী যেন নেই আমার', 'কোন জিনিস যেন পাইনি আমি', 'কোথায় যেন একটা শূন্যতা রয়ে গেছে'—মনে এমন ভাবনার উদয় থাকবে প্রতিটা মুহূর্তে।

"আর যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবিকা সংকীর্ণ হবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন উঠাব অন্ধ অবস্থায়।"[৩]

মহান আল্লাহই হলেন অন্তরের স্রষ্টা। আর তিনিই বলেছেন—অন্তরের প্রশান্তি একমাত্র তাঁকে স্মরণ করার মধ্যেই। তাই এর বাইরে গিয়ে তুমি যা কিছুই করো না কেন, কোনো লাভ নেই। অযথা সময় নষ্ট। আল্লাহর স্মরণ থেকে যে ব্যক্তি মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবনটা যাতনাময় হয়ে যাবে। সবকিছু পাওয়ার পরও সংকীর্ণ মনে হবে ধরণিকে। হাজার হাজার ফ্যান-ফলোয়ার থাকা সত্ত্বেও হতাশা

[২] সূরা রদ, (১৩) : ২৮ আয়াত।
[৩] সূরা ত্ব-হা, (২০) : ১২৩-১২৪ আয়াত।

কাটানোর জন্যে বেছে নিতে হবে আত্মহত্যার পথ। ইবনুল কাইয়িম খুব সুন্দর করে বলেছেন,

> "প্রত্যেকটা মানুষের অন্তরেই কিছু অস্থিরতা বিদ্যমান, যা শুধুমাত্র আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তনের মাধ্যমেই দূর করা সম্ভব। প্রত্যেকের অন্তরেই একাকীত্বের অনুভূতি বিদ্যমান, যা শুধুমাত্র আল্লাহর নৈকট্যলাভেই নির্মূল করা সম্ভব। প্রত্যেক অন্তরেই ভয় এবং উদ্বেগ বিদ্যমান, যা শুধুমাত্র আল্লাহর কাছে ছুটে যাওয়ার মাধ্যমেই কাটিয়ে ওঠা সম্ভব। প্রতিটা অন্তরেই কিছুটা দুখানুভূতি বিদ্যমান, যা কেবলমাত্র আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট থাকার মাধ্যমেই মোচন করা সম্ভব।"[৪]

আধুনিক বিশ্বের দিকে তাকালে এই সত্যিটা স্পষ্ট হবে তোমার কাছে। হতাশা কাটাতে পশ্চিমারা অ্যালকোহল গ্রহণ করে, পার্টিতে যায়, সেক্স করে, ড্রাগ নেয়—কিন্তু দিনশেষে মোটাদাগে হতাশাগ্রস্তই থেকে যায়। কারণ, নেশার-ঘোরে থাকলে হয়তো ব্যথা-বেদনা ভুলে থাকা যায়, কিন্তু নেশা কেটে গেলে তা আবারও চাঙা হয়ে ওঠে। এসব নেশার সামগ্রী তো সাময়িক সমাধানমাত্র। কিন্তু বাস্তব জীবনটা আর তো ক্ষণিকের নয়। এ তো সুদূর মঞ্জিল-পানে পথিকের পথচলার মতো।

বিখ্যাত বিটলস ব্যান্ডের জন লেননের এক সাক্ষাৎকার শুনছিলাম। যেখানে ও বলেছিল—আমাদের খ্যাতি আছে, অর্থ আছে কিন্তু কোনো আনন্দ নেই! এককালের খ্যাতনামা অভিনেতা জিম ক্যারিকে বলতে শোনা যায়, 'আমি প্রায়ই বলি—অর্থ ও খ্যাতির যে স্বপ্ন মানুষ দেখে... এগুলো এমন কিছু নয় যাতে তারা পূর্ণতা খুঁজে পাবে...।'[৫] অ্যাপলের প্রতিষ্ঠাতা মৃত্যুর আগে দুঃখ করে বলেছিল, 'I reached the pinnacle of success in the business world. In others' eyes, my life is an epitome of success. However, aside from work, I have little joy. In the end, wealth is only a fact of life that I am accustomed to...'[৬]

---

[৪] ইবনুল কাইয়িম, মাদারিজুস সালিকীন, ৩/১৫৬।

[৫] https://youtu.be/V80-gPkpH6M ভিডিয়োটির ১৯:১৩ মিনিটে দেখুন।

[৬] Steve Jobs Deathbed Speech; Retrieved form: https://www.snopes.com/steve-jobs-deathbed-speech/

পিচঢালা রাজপথ, অত্যাধুনিক প্রযুক্তি, আর দালান-কোঠার আধিক্য দেখে ভেবো না ওরা খুব শান্তিতে আছে। যদি শান্তিতেই থাকত, তবে আত্মহত্যায় ফার্স্ট হতো না পশ্চিমের দেশগুলো। ধনী দেশগুলোর তালিকায় ওরা যেমন সামনের সারিতে রয়েছে, তেমনই আত্মহত্যার তালিকায়ও সামনের সিটগুলোই দখল করে রেখেছে। এগুলো আমার কথা নয়, World Health Organization-এর পরিসংখ্যান এ কথা বলছে।[৭]

আচ্ছা থাক, ওত কঠিন হিসেবনিকেশ আপাতত বাদ দাও। চলো ঝটপট একটা ক্যালকুলেশান করে ফেলি। মনে মনে দুজন ব্যক্তিকে কল্পনা করো।

একজন দিবানিশি কেবল রূপচর্চার ছুটে চলে। ব্রাইট ক্যারিয়ারকে জীবনের মূল লক্ষ্য বানিয়েছে সে। তার কাছে বৈধ-অবৈধ সকলই সমান। যে-কোনো মূল্যে সে নিজের ইচ্ছেগুলো পূর্ণ করতে যায়। প্রবৃত্তির চাহিদাগুলোই ওর কাছে মুখ্য বিষয়। তাই প্রতিটি ক্ষণে ওসবের নেশায় বুঁদ হয়ে থাকে। ফলে নিদ্রাহীন রজনিযাপন-উদ্‌বেগ-উৎকণ্ঠা-হতাশা—তার নিত্য অভ্যাসে পরিণত হয়।

আরেকজন ব্যক্তি মুমিন। যে কিনা আখিরাতকেই তার ক্যারিয়ার বানিয়ে নিয়েছে। তাই সে বৈধ-অবৈধ পথ বেছে বেছে চলে। নিজের দুনিয়াবি খায়েশগুলো কতটা পূর্ণ হলো সেদিকে না তাকিয়ে, কে ইবাদতের মাধ্যমে জান্নাতের মর্যাদা বাড়িয়ে নিল—সর্বদা সেদিকে লক্ষ্য রাখে। ফলে গভীর রাতে প্রশান্ত-হৃদে সাজদায় গিয়ে রবের কাছে কাকুতি-মিনতি করে। তবে সে মিনতি দুনিয়াবি কোনো জিনিসের জন্যে নয়। বেশি বেশি নেক আমল করার সুযোগ পাওয়ার জন্যে। আল্লাহর প্রিয় বান্দা হবার জন্যে।

এবার বলো তো, এই দু-ধরনের ব্যক্তির মধ্যে কে বেশি সুখী হবে?

প্রথম প্রকার ব্যক্তি ক্ষণস্থায়ী সুখের মোহে অবৈধ সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে রাতের আঁধারে। কিন্তু দিনশেষে তার মনে কেমন জানি একটা অনুশোচনার জন্ম নেয়। সর্বদা এটা ভেবে সে উৎকণ্ঠিত থাকে যে, অন্তরঙ্গতার সময় কেউ দরজায় করাঘাত করছে কি না! তবে কি আজ গর্ভবতী হয়ে যাব! গর্ভপাতই কি করাতে হবে!... পরিস্থিতি অবনতি ঘটার সাথে সাথে তার উদ্‌বেগ কেবল বাড়তেই থাকে।

---

[৭] "Suicide rates Data by country". World Health Organization. 2016. Retrieved 23 September 2018.

দুনিয়াবি শান্তির খুঁজে নিজেকে পাপের এক রাস্তা থেকে অন্য রাস্তায়, এক বিছানা থেকে আরেক বিছানায়, পার্কের নির্জন স্থান থেকে লিটনের ফ্ল্যাটে, সফটকোর থেকে হার্ডকোর ভিডিয়োতে বেপরোয়াভাবে আবর্তন করায়। এভাবে পাপচক্রে অনবরত ঘুরপাক খেতে থাকে সে। আর আল্লাহর সাথে সৃষ্ট ক্রমবর্ধমান দূরত্ব তার অন্তরকে ধীরে ধীরে কঠিন থেকে কঠিনতর করে তোলে। জীবনকে করে তোলে অন্ধকারাচ্ছন্ন। তাই সে অন্তরের শূন্যতা পূরণ করতে চায় যে-কোনো মূল্যে। কিন্তু তার অনুসৃত পন্থায় হৃদয়ের শূন্যতা কখনোই পূরণ হয় না। দিন-দিন কেবল বাড়তেই থাকে।[৮]

অপরদিকে **দ্বিতীয় ধরনের** ব্যক্তি মনে করে, দুনিয়াটা ক্ষণস্থায়ী। তাই দুনিয়ার দুঃখ-কষ্টগুলোও ক্ষণস্থায়ী। এগুলো একদিন ঠিকই ফুরিয়ে যাবে। কিন্তু আখিরাতের দুঃখ-কষ্টগুলো ফুরোবে না কখনো। চূড়ান্ত ফয়সালা হওয়ার পর আর কাউকেই জান্নাতে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না।—এসব কথা সে মাথায় রাখে সব সময়। ফলে দুনিয়ার ক্ষতিকে পরীক্ষা, আর আখিরাতের ক্ষতিকে সর্বনাশা ক্ষতি হিসেবে বিবেচনা করে সে। এই আয়াত সর্বদা খেলা করে তার মানসপটে :

> "অতঃপর আল্লাহ খারাপ লোকদের একজনকে আরেকজনের ওপর রেখে সকলকে স্তূপীকৃত করবেন, এরপর এদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন। (প্রকৃপক্ষে) এই লোকগুলোই তো চরম ক্ষতিগ্রস্ত।"[৯]

তাই সে দুনিয়ার ব্যথা-বেদনাগুলোর ওপর সবর করে। এগুলোকে আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা পরীক্ষা মনে করে ধৈর্য ধরে। সে যা পায়নি, তা নিয়ে কখনো আফসোস করে না। কারণ সে বিশ্বাস করে : না-পাওয়া বস্তুটা তারই ছিল না। আর যে জিনিস তার নয়, সেটা নিয়ে দুশ্চিন্তা করাটা বোকামো মনে হয় তার কাছে। সে দুনিয়াকে পরীক্ষাক্ষেত্র হিসেবে দেখে। এবং সে বিশ্বাস করে—দুনিয়ায় তাকে বিভিন্নভাবে পরীক্ষা করা হবে। কখনো ফল-ফসলের ক্ষতির মাধ্যমে, কখনো ক্ষুধার মাধ্যমে, কখনো বা প্রিয় জিনিস তুলে নেওয়ার মাধ্যমে।

> "আমি তোমাদের ভয়, ক্ষুধা, জানমাল ও ফল-ফসলের ক্ষয়-ক্ষতি ইত্যাদি কিছু একটা দ্বারা অবশ্যই পরীক্ষা করব। আর তুমি সুসংবাদ

---

[৮] বিপদ যখন নিয়ামত, পৃষ্ঠা : ৬৮।

[৯] সূরা আল-আনফাল, (০৮) : ৩৭ আয়াত।

দাও ধৈর্যশীলদের।"[১০]

দুনিয়াবি পরীক্ষায় ভালো নম্বর পাওয়ার জন্যে, সব সময় প্রস্তুত রাখে নিজেকে। যদি ভালো কিছু পায়, তো রবের শুকরিয়া আদায় করে। আর যদি কিছু হারায়, তবে ধৈর্যধারণ করে। কারণ সে জানে, এই ধৈর্যই তাঁকে জান্নাতে পৌঁছে দেবে।

"তাদেরকে তাদের ধৈর্যধারণের প্রতিদানস্বরূপ জান্নাত দেওয়া হবে। সেখানে তাদের অভ্যর্থনা জানানো হবে সংবর্ধনা ও সালাম সহকারে। তারা সেখানে চিরকাল বসবাস করবে। অবস্থান ও আবাসস্থল হিসেবে তা কতই না উত্তম!"[১১]

আল্লাহর ভালোবাসা পাওয়ার জন্যে প্রচণ্ড গরমেও যখন সে নিজেকে আবৃত করে বাইরে বেরোয়, আর তাই দেখে পাড়া-প্রতিবেশীরা হাসি-তামাশা করে, তখনো সে বিচলিত হয় না। ইতস্তত বোধ করে না। কারণ সে জানে :

"আল্লাহ যখন কোনো বান্দাকে ভালোবাসেন, তখন জিবরীলকে ডেকে বলেন—'নিশ্চয়ই আল্লাহ অমুককে ভালোবাসেন। অতএব তুমিও তাকে ভালোবাসো।' (এ কথা শোনার পর) জিবরীলও তাকে ভালোবাসতে শুরু করেন। এরপর সে (জিবরীল) আকাশবাসীদের মধ্যে ঘোষণা করে দেন—'আল্লাহ অমুক বান্দাকে ভালোবাসেন। কাজেই তোমরাও তাকে ভালোবাসো।' তখন আকাশবাসীরাও ওই বান্দাকে ভালোবাসতে শুরু করে। অতঃপর পৃথিবীতে তাকে সম্মানিত করে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়।"[১২]

শত্রুভাবাপন্ন লোকদের হাজারও ঠাট্টা-মশকারা তাকে তার আদর্শ থেকে বিচ্যুত করতে পারে না। নিন্দুকেরা যখন তাকে নিয়ে কানাঘুষো করে, তখন এই আয়াত স্মরণ করে তার অন্তর প্রফুল্ল হয়ে ওঠে :

"সম্মান তো আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মুমিনদের জন্যেই, কিন্তু মুনাফিকরা তা জানে না।"[১৩]

---

[১০] সূরা বাকারাহ, (০২) : ১৫৫ আয়াত।

[১১] সূরা ফুরকান, (২৫) : ৭৫-৭৬ আয়াত।

[১২] বুখারি, আস-সহীহ, অধ্যায় : সৃষ্টির সূচনা, হাদীস : ৩২০৯।

[১৩] সূরা মুনাফিকুন, (৬৩) : ৮ আয়াত।

কেউই যখন তাকে বুঝতে চায় না, তার সমস্যাগুলো শুনতে চায় না, কিংবা প্রিয় কেউ ভুল বুঝে দূরে চলে যায়, তখনো সে একাকীত্ব অনুভব করে না। বরং খুশিমনে বলতে থাকে :

"আমি তো আমার দুঃখ ও অস্থিরতা আল্লাহর সমীপেই নিবেদন করছি।"[১৪]

যখন কোনো দুঃখ-দুর্দশা এসে কড়া নাড়ে তার দরজায়, তখন আল্লাহর বাণী তাকে সান্ত্বনা প্রদান করে :

"নিশ্চয় কষ্টের সাথে স্বস্তি রয়েছে।"[১৫]

রাত জেগে মাসের-পর-মাস পড়াশোনা করার পরও মেডিক্যালে ভর্তির সুযোগ যদি তার হাতছাড়া হয়ে যায়, কিংবা দুর্ঘটনায় যদি তার অঙ্গহানি হয়ে যায়, তবুও হাল ছড়ে না সে। কোনো প্রিয় জিনিস যদি হারিয়ে যায় তার জীবন থেকে—তখনো মনমরা হয়ে পড়ে থাকে না। কারণ, তার রবের ওয়াদা মমতার পরশে তাকে শুনিয়ে দেয় :

"আমি যখন আমার মুমিন বান্দার কোনো প্রিয়তম কিছু দুনিয়া থেকে তুলে নিই আর সে ধৈর্যধারণ করে, (তবে এর বদলায়) তার জন্যে জান্নাত ব্যতীত অন্য কোনো প্রতিদান নেই আমার কাছে।"[১৬]

সে কখনোই এ কথা বলে না যে—'আমি যদি আর-একটু সাবধানতা অবলম্বন করতাম, আর-একটু সচেতন হতাম, তবে তো এমনটা হতো না।' এমনকি 'ইশ' শব্দটা পর্যন্ত বেরোয় না তার মুখ থেকে। কারণ, তাকে শেখানো হয়েছে :

"...আর যদি তোমাদের ওপর কোনো (বিপর্যয়) আসে, তা হলে এমন কথা বলবে না যে, 'ইশ, যদি আমি এমনটি না করতাম, তা হলে আমার আজ এমন পরিণাম ভুগতে হতো না।' বরং বলবে, 'আল্লাহ (তাকদীরে) যা নির্ধারণ করে রেখেছিলেন, তা-ই হয়েছে।' 'যদি' কথাটা শয়তানের দরজা খুলে দেয়।"[১৭]

---

[১৪] সূরা ইউসুফ, (১২) : ৮৬ আয়াত।

[১৫] সূরা আশ-শারহ, (৯৪) : ৫ আয়াত।

[১৬] বুখারি, আস-সহীহ, অধ্যায় : কোমল হওয়া, হাদীস : ৫৯৮১।

[১৭] মুসলিম, আস সহীহ, হাদীস : ৬৪৪১।

কখনো যদি সে যাতনা-বিপদ-অসুস্থতা-উদ্‌বেগ-উৎকণ্ঠা কিংবা ভয়ানক ক্ষতির মধ্য দিয়ে জীবন অতিবাহিত করতে থাকে, তবুও সাহস হারায় না। মনোবল ভেঙে পড়ে না তার। কারণ, তার পিঠে হাত বুলিয়ে নবিজি ﷺ বলতে থাকেন :

> "সবচেয়ে বেশি পরীক্ষিত হন নবিরা, অতঃপর তাঁদের নিকটবর্তীরা, এরপর এদের নিকটবর্তীরা। মানুষকে তার ঈমান অনুযায়ী পরীক্ষা করা হয়। যদি তার ঈমান শক্তিশালী হয়, তা হলে তার পরীক্ষাও কঠিন হয়। আর যদি তার ঈমান দুর্বল হয়, তা হলে তার পরীক্ষাও সে অনুপাতে হালকা হয়। বিপদ বান্দার পিছু ছাড়ে না, পরিশেষে তার অবস্থা এমন হয় যে, সে পাপমুক্ত হয়ে জমিনে চলাফেরা করে।"[১৮]

সে আরও হিম্মত পায়, যখন শুনে :

> "মুসলিম ব্যক্তির ওপর যে-সকল যাতনা যাতনা, রোগ-ব্যাধি, উদ্‌বেগ-উৎকণ্ঠা, দুশ্চিন্তা, কষ্ট ও পেরেশানি আপতিত হয়, এমনকি যে কাঁটা তার দেহে বিদ্ধ হয়, এসবের দ্বারা আল্লাহ্ তার গুনাহসমূহ মাফ করে দেন।"[১৯]

ওর পাশের রুমেই কেউ যখন বয়ফ্রেন্ডের সাথে ডেটিং করতে থাকে, তখন সে মুখ ফিরিয়ে নেয় এগুলো থেকে। মেসেঞ্জারে গুতাগুতি করে না বিসিএস ক্যাডারের সাথে। লিটনের ফ্ল্যাটে গিয়ে ভার্জিনিটি বিসর্জন দেওয়ার শারীরিক পরীক্ষায় অংশ নেয় না সে। ভালোবাসার আধুনিক অগ্নিপরীক্ষা (!) দিতে গিয়ে অনলাইনে গোপন অঙ্গ দেখায় না কাউকে। সব সময় শক্ত করে জমিন কামড়ে ধরে অশ্লীলতা থেকে বাঁচিয়ে রাখে নিজেকে। কখনো ঝরে যায় না। হারিয়ে যায় না অমবস্যার নিকষকালো আঁধারে। কারণ, সে জানে—জান্নাতের অনাবিল সুখ-শান্তির কাছে ক্ষণিকের এসব মাজ-মস্তি তো কিছুই না।

> "তাদের কৃতকর্মের পুরস্কারস্বরূপ তাদের জন্যে যেসব চোখজুড়ানো বস্তু লুকিয়ে রাখা হয়েছে, তা কেউই জানে না।"[২০]

দ্বীনের ওপর চলার কারণে, হিজাব-নিকাব পরার কারণে, যাস্ট ফ্রেন্ড নাম দিয়ে ছেলেদের সাথে ঢলাঢলি না করার কারণে, যখন কেউ তাকে নিয়ে ঠাট্টা-

---

[১৮] তিরমিযি, আস সুনান, হাদীস : ২৪০১, আলবানি, আস-সহীহাহ্, হাদীস : ১৪৪।

[১৯] বুখারি, আস সহীহ, হাদীস : ২১৩৭।

[২০] সূরা সাজদা, (৩২) : ১৭ আয়াত।

মশকারা করে, ব্রেইন ওয়াশড বলে গালি দেয়, তখন সে এই আয়াত স্মরণ করে হৃদয়কে নির্মল করে :

> "অপরাধীরা মুমিনদের উপহাস করত। এবং তারা যখন মুমিনদের পাশ দিয়ে গমন করত, তখন পরস্পর চোখ টিপে ইশারা করত। যখন তারা পরিবার-পরিজনের কাছে ফিরত, তখন (মুমিনদের ঠাট্টা করে আসার জন্যে) তারা ফিরত উৎফুল্ল হয়ে। আর যখন মুমিনদেরকে দেখত, তখন বলত—এরা তো অবশ্যই বিভ্রান্ত।"[২১]

এই আয়াত স্মরণ করতে গিয়ে সে বিস্মিত হয়। সাড়ে চৌদ্দ শো বছরে আগেই ওসব লোকদের কথা তাকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, যারা আজ তাকে ব্রেইন ওয়াশড বলে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করছে। সে মোটেও মন খারাপ করে না ওদের অবজ্ঞাপূর্ণ কথা শুনে। সে জানে—একদিন সিংহাসনে রানির মতো বসে ওদের উপহাস ওদেরকেই ফিরিয়ে দেওয়ার সুযোগ আসবে তার কাছে।

> "আজ মুমিনগণ কাফিরদের উপহাস করছে। সিংহাসনে বসে তাদের অবস্থা দেখছে। (আর বলছে,) কাফিররা তাদের কৃতকর্মের ফল পেল তো?"[২২]

সে যদি সুখের মধ্যে থাকে, সেটাও তার জন্যে কল্যাণকর। আবার যদি কষ্টের ভেতরে থাকে, সেটাও তার জন্যে কল্যাণকর। কারণ, সে মুমিন। আর মুমিনের কোনো লস প্রজেক্ট নেই। সবটাই তার লাভ। শুধু কল্যাণ আর কল্যাণ।

> "মুমিনের বিষয়টি বড়ই বিস্ময়কর! তার সবকিছুই বিষয়ই কল্যাণকর। তবে মুমিন ছাড়া অন্য কারও ক্ষেত্রে এটি প্রজোয্য নয়। তার জীবনে সুখ-সমৃদ্ধি এলে সে কৃতজ্ঞতা আদায় করে। ফলে তা হয় তার জন্য কল্যাণকর। আর দুঃখ-দুর্দশার মুখোমুখি হলে সে ধৈর্যধারণ কর। ফলে তাও হয় তার জন্য কল্যাণকর।"[২৩]

এভাবেই একজন মুমিন সব সময় আত্মিক শান্তির মধ্যে থাকে। সর্বদা প্রশান্ত থাকে তার হৃদয়। জান্নাতীসুখ অনুভব করে জীবনের পরতে পরতে। কারণ,

---

[২১] সূরা মুতাফফিফীন, (৮৩) : ২৯-৩২ আয়াত।
[২২] সূরা মুতাফফিফীন, (৮৩) : ৩৪-৩৬ আয়াত।
[২৩] মুসলিম, আস সহীহ, হাদীস : ২৯৯৯।

আল্লাহর পক্ষ থেকে তাকে পবিত্র জীবন দান করা হয়। আর সে অপেক্ষা করে সেই রাজকুমারের জন্যে, যে কিনা বিয়ের পবিত্র ঘোড়ায় চড়ে তাকে নিয়ে হারিয়ে যাবে জান্নাতের বাগানে।

> "যে সৎকর্ম সম্পাদন করে—হোক সে ঈমানদার পুরুষ হোক কিংবা নারী—আমি তাকে পবিত্র জীবন দান করব।"[২৪]

আর যে পাপাচারী, অবিশ্বাসী, কুপ্রবৃত্তির দাস—তার কথা তো বলেছি আগেই। সে সর্বদাই বঞ্চিত হয় প্রশান্তি থেকে। না পাওয়ার বেদনা সারাক্ষণ হাহাকার সৃষ্টি করে রাখে তার অন্তরে। আত্মিক তৃপ্তিটা কোনো দিনও পায় না। শেষমেশ একরাশ হাহাকার আর বুকভরা বেদনা নিয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়। ইহকালীন ও পরকালীন জীবনে কোনো কল্যাণের দেখাই সে পায় না।

এই কথাগুলো আমি সেদিন বোঝানোর চেষ্টা করেছি রাকিবকে। আজ তোমায় বলছি—যদি সত্যিই হতাশার তীব্র উত্তাপের মধ্যে একপশলা বৃষ্টির ছোঁয়া পেতে চাও, হৃদয়কুঞ্জকে সুগন্ধী ফুলের সুবাসে সুরোভিত করতে চাও, জীবনের পরতে পরতে জান্নাতীসুখ অনুভব করতে চাও, তবে বদলে ফেলো নিজেকে। পুরোদস্তুর মুমিন হয়ে যাও। আপাদমস্তক নিজেকে আল্লাহর বিধানের অধীন করে নাও। দেখবে, কল্যাণের বারিধারা নেমে আসবে তোমার হৃদয়ে। আর সেই বারিতে অবাগাহন করে তোমার তনুমন প্রশান্ত হয়ে যাবে।

হৃদয়দহনজ্বালা লয়ে কেন আছ দাঁড়ায়ে,
পিছুটান দূরে ঠেলে হাত দাও বাড়ায়ে।
হতাশার যত গ্লানি সব ছুড়ে ফেলে,
এসো ফিরে দয়াময়ের নিবিড় ছায়াতলে।
কষ্ট তব ওড়ে যাক দখিনা সমীরণে,
ফাগুনহাওয়া বয়ে যাক তোমার পরানে।

কফিটা আস্তে আস্তে খাও। সামনের অধ্যায়গুলোতে আরও কিছু কথা হবে তোমার সাথে, সে পর্যন্ত যেন চলে। ইবনু তাইমিয়্যা ﷺ-এর কিছু কথা মনের মধ্যে উঁকি দিয়ে যাচ্ছে, ওইটা শুনিয়েই ইতি টানছি এই অধ্যায়ের।

---

[২৪] সূরা নাহল, (১৬) : ৯৭ আয়াত।

"সুতরাং মহান প্রতিপালকের ইবাদত, ভালোবাসা এবং তাঁর অভিমুখী হওয়া ছাড়া কোনো বান্দার অন্তর সংশোধিত হবে না, সফলতা লাভ করবে না, কোনোপ্রকার স্বাদ গ্রহণ করবে না, আনন্দিত হতে পারবে না, তৃপ্তি পাবে না, স্বস্তি লাভ করবে না এবং কিছুতেই প্রশান্ত হতে পারবে না। যেসব বিষয়ের দ্বারা সৃষ্টিজীব স্বাদ লাভ করে, এমন সবকিছুও যদি সে অর্জন করে ফেলে, তবুও তার অন্তর প্রশান্ত হবে না, স্বস্তি লাভ করবে না। কারণ তার অন্তর সত্তাগতভাবেই নিজ প্রতিপালকের মুখাপেক্ষী। তিনিই তার পালনকর্তা, প্রেমাস্পদ এবং কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য। তাই স্রষ্টাকে পেলেই কেবল প্রফুল্লতা, আনন্দ, স্বাদ, নিয়ামত, স্বস্তি এবং প্রশান্তি অর্জিত হতে পারে।"[২৫]

[২৫] ইবনু তাইমিয়্যা, দাসত্বের মহিমা, পৃষ্ঠা : ১০২।

ডুবিয়ে তরী ঝাঁপিয়ে পড়ি

আমার হৃদয়টা মিশে আছে এখানেই। গাঁয়ের পরতে পরতে, ধানের খেতের পাড়ে পাড়ে। কোকিলের কুহূ স্বর, ঘুঘুর মনভোলানো ডাক, নিশীথিনীর ঝিঁঝিঁ পোকা—বিমোহিত করে আমাকে। আমি চঞ্চল হই দখিনা হাওয়ায়, মৌমাছির গুঞ্জরণে। পদতলে পড়ে থাকা ছোট্ট ঘাসফুলের ঘ্রাণ যখন নিই, মনটা ভরে ওঠে। গোধূলির স্নিগ্ধ আলোয় যখন খেতের আইল ধরে হাঁটি, চিত্তখানি নেচে ওঠে। ঝরাপাতার মর্মর ধ্বনি আমায় সুখ এনে দেয়। আমি আমার গ্রামকে অনুভব করি প্রাণ দিয়ে।

আচ্ছা, তুমি কি প্রকৃতিকে অনুভব করেছিলে কখনো?

তুমি বোধহয় ভোরের শিশির দেখোনি। দেখোনি ঘাসফুলের বাহারি রঙ, বউ-কথা-কউ পাখি, মেঘমেদুর আকাশ। প্রজাপতির রঙিন পাখা, পাতার সাথে আলোর আলাপন, হেমন্তে ফসলের হাসি, রবির কিরণের সাথে শিশিরের প্রেম—এগুলোর সবটাই তোমার অপরিচিত। তোমার পরিচিতি বুফে কিংবা ক্যাফেটেরিয়ার সাথে। বোটানিক্যাল গার্ডেন কিংবা ফ্যান্টাসি কিংডমের সাথে। গোধূলির আভার বদলে রাস্তায় ফ্লোরোসেন্ট বাতিতে অবগাহন করো তুমি।

ইদানীং তুমি অনেক বদলে গেছ। যান্ত্রিকতার ছোঁয়ার অন্তরটাকেও যান্ত্রিক করে ফেলেছ। তুমি ভুলে গেছ তোমার আঁকড়। তোমার মাথায় চেপে বসেছে আধুনিক হওয়ার নেশা। নিজের অদেখাকে দেখিয়ে শিরোপা জিততে চাও তুমি। যদি

স্বল্পবসনা হয়েও সেখানে পোজ দিতে হয়, তবুও দেবে। মিস ওয়াল্ড বলে কথা! পুরো বিশ্ব তোমায় দেখবে। চারিদিকে ছড়িয়ে পড়বে যশ-খ্যাতি। সাংবাদিকরা ইন্টারভিউ নিতে ছুটে আসবে পঙ্গপালের মতো। মুহুর্মুহু ক্লিকের ঝলক পড়বে তোমার চেহারায়। এরপর... এরপর ফিরিঙ্গিদের কৃত্তিম আলোয় ঝকঝকে তকতকে হয়ে যাবে তোমার জীবন।

পঙ্কিল সরোবরে স্নান করা উর্বশী সাজার নেশায় মত্ত আছ তুমি। হিন্দু পুরাণে যেসব অপ্সরাদের কথা আছে, ঠিক তেমন করে তুমি চলতে চাও। ওরা মনোরঞ্জন করত স্বর্গের দেবতাদের, আর তুমি ধরণির পুরুষদের। এটাই নাকি সাহসী পদক্ষেপ!

নিকুচি করি তোমার সাহসিকতার। দেহসুষমা বিকিকিনি করাটা কবে থেকে সাহসী কাজ হয়ে গেল? তুমি কি আঁধারের তীব্রতাকে সক্ষমতা বলতে চাও?

বোন আমার, আলোতে অবগাহনের দাওয়াত দিচ্ছি তোমায়। ভোরের আভা থেকে সঞ্জীবনী লাভ করতে চাও না তুমি? ফজরের বিশুদ্ধ হাওয়ায় আলতো করে ছুঁয়ে দেখতে চাও না প্রকৃতিকে? জোছনাবিলাসে প্রাণটা জুড়ানোর ইচ্ছে জাগে না তোমার?

আমার বকবকানি শুনে ভেবো না—আমি উপদেশের গাট্টি চাপিয়ে দিতে এসেছি। তবে উপদেশ যে একেবারেই দেব না, সেটারও নিশ্চয়তা দিতে পারছি না। সূর্যের সামান্য আলো থেকেই তো গাছ তার খাদ্য প্রস্তত করে। আমিও হয়তো সেই সামান্য কথাটুকুই বলে যাব। আমার কথাগুলো কি শুনবে না তুমি?

খুলো তব হৃদয়ের বদ্ধ দুয়ার
ফেলো না ছুড়ে তুমি কথাটি আমার
গড়িয়েছে বেলা কত, ভুল জমা শত শত
নেই তো সময় আর হেলা করিবার
দিতে হবে পাড়ি আজ অকূলপাথার

একজন ভাই বলেছিলেন, নারীদেহ যেন লবণের মতো। সবকিছুতেই একটু-না-একটু লাগবে। ১টাকার শ্যাম্পু থেকে নিয়ে লাখ টাকার গাড়ি—কোথায় নেই নারী? খবরপাঠ কিংবা রিসিপশন, সবখানেই নারীর মুখচ্ছবি। ম্যাগাজিনের

পাতায় পাতায় নারীকে যতটা উন্মুক্ত করে উপস্থাপন করা হয়, তার সিকিভাগও কি পুরুষকে করা হয়? নায়করা সব সময় কম্প্লিট পরে থাকে, আর নায়িকারা খোলা রাখে বেশিরভাগ অঙ্গ। কী শীত কী গরম, কাপড় খোলা রাখতেই হবে। এমন আঁটসাট পোশাক পরতে হবে, যেগুলো দিয়ে শরীরের অবয়ব বোঝা যায়। দেখাতে হবে অদেখা অঙ্গগুলো। নয়তো মার্কেট জমবে না। পণ্যের পশরা সাজাতে পারবে না কর্পোরেটরা। জমবে না ক্যাসিনো কিংবা জুয়ার আড্ডা। নারী কি এতটাই কমদামি কোনো বস্তু?

আল্লাহর শপথ, নারীদের সম্মান বহু উর্ধ্বে। কিন্তু সেই সম্মানকে ধূলিসাৎ করেছ তোমরা। নিজ হাতে গলা টিপে হত্যা করেছ নিজেদের আত্মসম্মানবোধকে।

ইদানীং সিনেমার হট টপিক হলো 'আইটেম সং'। যেসব হিন্দি সিনেমা রমরমা ব্যবসা করতে চায়, তার প্রায় সবগুলোতেই এসব নষ্টামো থাকে। এখানে যে নাচে, তাকে বলা হয় 'আইটেম গার্ল'। একটা স্বল্পবসনা নারী নানান অঙ্গভঙ্গি করতে থাকে পুরুষদের সামনে। সুরের মূর্ছনায় যৌন-উত্তেজনা ছড়িয়ে দেয় দর্শকের রন্ধ্রে রন্ধ্রে। দর্শককে কামাতুর করাই এসব গানের মূল উদ্দেশ্য। সে গানের কলিগুলো কেমন? একটার অনুবাদ শোনাচ্ছি তোমায়।[২৬]

আমার চোখ যেন বিচ্ছু, চোখ টিপলে তাতে বড় বিষ।
শালা! এই চিকন কোমর এক ঝটকায় লাখো লোকের প্রাণ নেয়।
হাজারের নোটের বদলা দিতে এসেছি,
রূপের আগুনে বিড়ি জ্বালাতে এসেছি।
চিকনি চামেলী লুকিয়ে এসে গেছে একেলা মাতাল হয়ে...
জঙ্গলে আজ মঙ্গল করব,
ক্ষুধার্ত সিংহদের সাথে আজ খেলব আমি,
মাখনের মতো নরম হাতে কয়লা নেব আজ।
গভীর জলের মাছ আমি,
নদীর ঘাট আমার ঘোরা আছে,
তোর চোখের স্রোতের সাথে হেরেই আমি ডুবেছি।

[২৬] অনুবাদটুকু নেওয়া হয়েছে ডা. শামসুল আরেফীনের 'মানসাঙ্ক' বই থেকে।

ওহ! এই ঝলক প্রাণ কেড়ে নেয়,
কিন্তু দেখতে সহজ সরল,
প্রেমের পরশ দেব, খেয়ে নাও একটু।
এ তো কেবল ট্রেইলার, পুরো সিনেমা দেখাতে এসেছি,
রূপের আগুনে বিড়ি জ্বালাতে এসেছি।
চিকনি চামেলী লুকিয়ে এসে গেছে একেলা মাতাল হয়ে...
নিঃশব্দ বসতিতে আজ ফুর্তির আমেজ,
এমন নোনতা চেহারা তোর,
তোর গাঢ় রঙ আমার মন থেকে মোছে না।
ও রাজা, আমার যৌবন তো পাগল,
সব পর্দা আমি কেটে দেব,
আমার সন্ধ্যাগুলো একাকী কাটে,
তোর সাথে ভাগ করে নেব।
হায়, আমার কথার মধ্যেই আছে ইশারা,
যার মধ্যেই আছে সব খেল,
স্রেফ সিন্দুক ভাঙো আর লুটে নাও।
চুমু দিয়ে জখমে মলম লাগাতে এসেছি,
রূপের আগুনে বিড়ি জ্বালাতে এসেছি।
চিকনি চামেলী লুকিয়ে এসে গেছে একেলা মাতাল হয়ে...

আগেকার দিনের বাইজি-গানের সাথে এর কোনো পার্থক্য আছে কি?

একসময় বাইজি নামক একদল ললনার দেখা মিলত সমাজে। ওদের মহলে নিয়মিত যাতায়াত করত রাজা-বাদশাহরা। বাইজিনাচ আর সুরমূর্ছনায় যৌনসুখ খুঁজে নিত তারা। অনেক রাজার আবার জমকালো রঙ্গমহল থাকত। রাতেরবেলা সে মহল মুখরিত করে রাখত নর্তকীরা। মন্ত্রী-শেঠ-উজির-সহ অনেককেই নেমন্তন্ন করা হতো সেখানে। ঝুমুরঝুমুর নাচ দেখে দেখে নেশার ঘোরে হারিয়ে যেত অতিথিরা। অনেকেই আবার বাইজিদের শয্যাসঙ্গী হতো।

এখনকার দিনে বাইজি নেই, আছে বাইজির নৃত্য। মোবাইল, টিভি কিংবা পিসির স্ক্রিনগুলো নাচানাচির আড্ডাখানা। মানুষজন এখন আধুনিক বাইজির নৃত্য দেখে সাধ মেটায়। অল্প টাকার মেইগাবাইট কিনে জন্মের মতো উপভোগ করে নারীদেহ। কল্পলোকে হারিয়ে যায় সুদূর দূরে।

তোমার দাদি-নানিদের জিজ্ঞেস কোরো তো, যেসব নারীরা যাত্রাপালায় অংশ নিত সমাজ তাদেরকে কোন চোখে দেখত?

আগেকার দিনে বাইজি-নর্তকীরা মুখ দেখাতে পারত না সমাজে। কিন্তু আজ তারা বাহ্বা পায়। আইটেম সং, মুভি কিংবা কনসার্টের মতো আধুনিক যাত্রাপালায় যারা নেচেগেয়ে বেড়ায়, এরাই হয়ে গেছে নারী-জাতীর আদর্শ। রমণীরা আজ এদের মতো হতে চায়। এদের পোশাক-আশাক, ফ্যাশন, স্টাইল অনুসরণ করে পদে পদে। কবে থেকে বাইজিদের দাম এতটা বেড়ে গেল? আইটেম গার্লের পদ কবে থেকে এতটা সম্মানিত হয়ে গেল?

আফসোস! তোমরা কি পাশ্চাত্যের কাছে নিজের বিবেক বন্ধক রেখেছ? কেন 'মিস ইউনিভার্স' হওয়ার স্বপ্ন দেখো? সবকিছু বিকিয়ে দিয়ে যে ওখানকার শিরোপা জিততে হয়, জানো তো? আমি বললে হয়তো বিশ্বাস করবে না। চলো, একজন সাবেক মিসের জবানেই শুনি সেই কাহিনি।

লাক্স তারকা মম বলেছে, 'পৃথিবীব্যাপী সুন্দরী প্রতিযোগিতা হচ্ছে একটা ব্যবসা। মেয়েরা হচ্ছে ব্যবসার উপকরণ। ছোট কাপড়ের মেয়েরা ব্যবসার ভালো উপকরণ। আর বড় কাপড়ের মেয়েরা ব্যবসার অপেক্ষাকৃত কম উপকরণ। আমি নিশ্চয় বিষয়টা বোঝাতে পেরেছি। তাই সুন্দরী প্রতিযোগিতা শুধু ব্যবসার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এর চেয়ে বেশি কিছু না।... সুন্দরী প্রতিযোগিতা নাকি ষোড়শী ছাড়া হয় না।... কারণ অল্প বয়সী মেয়েদের পিক করা হয় বিপথগামী করার জন্য। যারা বুদ্ধিমান, যারা বিচক্ষণ তারা হয়তো ওই ট্র্যাপে পা না দিয়ে নিজের একটা পরিচয় তৈরি করতে চেষ্টা করে। কিন্তু প্রধান উদ্দেশ্য থাকে অল্প বয়সী ষোড়শী সুন্দরীদের নিয়ে ব্যবসা করা।'[২৭]

[২৭] ঢাকা রিপোর্ট টোয়েন্টিফোর.কম, ০৪ সেপ্টেম্বর ২০১৩; প্রতিবেদনটি এই সাইটে আর পাওয়া যায় না। সরিয়ে ফেলা হয়েছে। তবে অন্য সাইটে এখনো রয়ে গেছে। বার্তা-এর সাইটে এখনো সাক্ষাৎকারটি পাওয়া যায়। দেখুন: https://www.thebarta.com/archives/9292

নায়কের বয়স পঞ্চাশ হলেও সমস্যা নেই, কিন্তু নায়িকাকে হতে হবে টসটসে যুবতী। ষাট ছুঁই ছুঁই করা টম ক্রুজ বা পঞ্চাশোর্ধ আমির খান—কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু আইটেম সং চালানোর জন্যে লাগবে পূর্ণ যৌবনা, উর্বশী কোনো নারী। নয়তো জমবে না ব্যবসা। হিট হবে না সিনেমা।

তোমাদের আবেগ নিয়ে খেলছে বেণিয়ারা। ইচ্ছেমতো ব্যবহার করছে, আর বেলাশেষে ছুড়ে ফেলে দিচ্ছে ডাস্টবিনে। নারী যতদিন বাজার গরম রাখতে পারবে, ততদিন সে দামি। যতদিন তাকে দিয়ে রমরমা ব্যবসা চলবে, ততদিন তাকে কদর করবে বেণিয়ারা। কিন্তু যৌবন ফুরিয়ে গেলে ছুড়ে ফেলবে টয়লেট টিস্যুর মতন। যদি জনপ্রিয় হতে চাও, তবে বিকিয়ে দিতে হবে নিজের সম্ভ্রম। নিজের অদেখাকে খুলে দেখাতে হবে দর্শকের সামনে। পরিচালকের সাথে রাত কাটানো ছাড়া মিলবে না অভিনয়ের সুযোগ। না, এ কথা আমার না। অভিনেত্রী কঙ্গনা রনৌত বলেছেন, নায়িকা মানেই পরিচালকের কোলে বসতে হবে।[২৮]

কত ধুরন্ধর ব্যক্তি যে ফাঁদ পেতে রেখেছে মিডিয়া-জগতের আনাচে-কানাচে, হয়তো জানোও না। হলিউড-বলিউড হলো যৌন হয়রানির আখড়া। হাতেগোনা কজন বাদে, সবাই জড়িয়ে গেছে ধর্ষণ কিংবা ব্যভিচারে। যারা স্বেচ্ছায় রাজি হয়নি, তাদেরকে বাধ্য করা হয়েছে। হার্ভে ওয়েনস্টেইন, কেভিন স্পেইসি, বেন এফ্লেক, জর্জ ডাব্লিউ বুশ সিনিয়র, ক্রিয়া সাভিনো, রয় প্রাইস-সহ বাঘা বাঘা লোকেরা জড়িয়ে আছে এসব অপরাধের সাথে। হলিউডের চলচ্চিত্র পরিচালক জেমস ট্যাবোকের নামে যৌন হয়রানির অভিযোগ এনেছে ৩৮ জন নারী।[২৯]

একটা খবরের কিছু অংশ শোনাই :

> "আজ রোববার, ৭১তম বাফটা অ্যাওয়ার্ডের পর্দা উঠতে যাচ্ছে। এ বছর পশ্চিমের প্রতিটি পুরস্কার বিতরণী আসর অন্যগুলো থেকে আলাদা। হলিউডের যৌন হয়রানি আর এর প্রতিবাদের প্রভাব গিয়ে পড়েছে সব জায়গায়। সম্প্রতি সমাজের সব ক্ষেত্রে নারীর ওপর যৌন হয়রানি ঠেকাতে যুক্তরাজ্যের ২০০ নারী তারকা একটি খোলা চিঠিতে স্বাক্ষর করেছেন। যুক্তরাজ্যের 'দ্য অবজারভার' পত্রিকায় সেই চিঠি

---

[২৮] Doug Criss (2017). The (incomplete) list of powerful men accused of sexual harassment after Harvey Weinstein. CNN

[২৯] https://www.prothomalo.com/entertainment/hollywood/হলিউডে-এত-যৌন-হয়রানি

> প্রকাশিত হয়েছে। সাক্ষরকারীদের মধ্যে আছেন ব্রিটিশ টিভি, চলচ্চিত্র ও মঞ্চের অভিনেত্রী। নায়িকা এমা টমসন, কিরা নাইটলি ও এমা ওয়াটসন তাদের মধ্যে অন্যতম।"[৩০]

এই বিপথগামী নারীরাই আবার বিভিন্ন অনুষ্ঠানে লেজ হারানো শিয়ালের মতো লেজ না থাকার ফজিলত বয়ান করে বেড়ায়! আর তাদের ডাকে সাড়া দিয়ে তরুণীরা লাইন লাগায় সম্ভ্রম বিকানোর প্রতিযোগিতায়। "প্রথম বার এসেছি, কিন্তু শেষ বারের জন্য নয়", "দেখিয়ে দাও অদেখা তোমায়"—এসব চটকদার স্লোগানের খই ফুটে মুখ দিয়ে। পোকামাকড় যেমন আগুনে ঝাঁপ দেয় আশ্রয়ের খুঁজে, ঠিক তেমন করে তরুণীরাও ফেইমের জন্যে ঝাঁপায় যৌনতার পারাবারে। আর রবীন্দ্রনাথের মতো গাইতে থাকে—

ডুবিয়ে তরী ঝাঁপিয়ে পড়ি ঠেকব চরণ-'পরে,
আমি বাঁচব চরণ ধরে।[৩১]

আজ তোমার কী হলো? কেন আল্লাহভীতির জায়গায় আল্লাহদ্রোহী হবার নেশায় মত্ত হয়ে গেলে? আলোকোজ্জ্বল পথ ছেড়ে আঁধারের দিকে কি কেউ জেনেশুনে পা বাড়ায়? পাগলও তো তালে ঠিক থাকে। কিন্তু তুমি? তুমি তো পাগল নও। তবে এতটা অধঃপতন কী করে হলো তোমার?

বোন আমার, তোমার রব তোমাকে শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি বানিয়েছেন। না, তোমার সৌন্দর্যের জন্যে না। রূপলাবণ্যের জন্যেও না। তুমি শ্রেষ্ঠ, কারণ তোমার আত্মমর্যাদা আছে। তোমার কাছে আছে ঈমান। আছে আয়িশা, ফাতিমা কিংবা খাদিজার মতো মহীয়সী নারীদের আদর্শ। তুমি পৃথিবীসেরা সভ্যতার অনুসারী। এরপরেও কি অসভ্যতার অলিগলিতে ঘুরে ঘুরে নিজেকে নিঃশেষ করে দেবে?

[৩০] https://www.ittefaq.com.bd/entertainment/133048/

[৩১] গীতবিতান, পৃষ্ঠা : ৯৭।

এটার নামই জীবন?

ছোটবেলায় অনেক জেদি ছিলে তুমি। কনকনে শীতেও আইসক্রিম খাওয়ার জন্যে বায়না ধরতে। বাধা দিত সবাই। কিন্তু মানতে চাইতে না। শেষমেশ রাগে গদগদ হয়ে লুটোপুটি শুরু করে দিতে। বাধ্য হয়েই তোমার আবদার মেটানোর জন্যে দৌড়ঝাঁপ শুরু হয়ে যেত। কনকনে শীতে তোমার হাতে আইসক্রিম দেখে, অনেকেরই দাঁত শিরশির করত। কিন্তু তুমি দিব্যি খুশিমনে আইসক্রিমে কামড় বসাতে। আইসক্রিম গলে গলে তোমার হাত বেয়ে কনুই পর্যন্ত চলে আসত। আইসক্রিম ফুরিয়ে গেলে শেষমেশ কাঠিটাও চেটেপুটে খেতে।

প্রায়ই নতুন নতুন জিনিসের আবদার জানাতে তুমি। সেটা হাতে না পাওয়া অব্দি, জেদ ধরে বসে থাকতে। তুমি জেদ ধরতে মেলা থেকে ছোট্ট পুতুল কেনার জন্যে। সেই লাল টুকটুকে মিষ্টি পুতুল—যেটি কোলে নিয়ে তুমি ঘুমোবে। কিংবা রিমোট কন্ট্রোল একটি খেলনা গাড়ি, হাতের স্পর্শে যেটি দিগ্‌বিদিক ছুটোছুটি করবে। নয়তো রাস্তার মোড়ের কিছু রঙিন বেলুন, যেগুলো তোমায় নিয়ে উড়ে যাবে আকাশ পানে।

এসব কি মনে আছে তোমার?

দেখতে দেখতে অনেক বড় হয়ে গেছ। ফুটফুটে মিষ্টি শিশু থেকে এখন তুমি প্রাপ্তবয়স্কা, তরুণী। জ্ঞানের পরিধি আগের চেয়ে ঢের বেড়েছে। পৃথিবী থেকে

সূর্যের দূরত্ব, মঙ্গল গ্রহে অক্সিজেনের পরিমাণ, হলিউডে রিলিজ হওয়া নতুন মুভি—সবই তোমার জানা। কোন কোন অভিনেতার সিক্স প্যাক বডি আছে, সেইটাও বাদ যায়নি জানা জিনিসের তালিকা থেকে। সত্যিই, তোমার জ্ঞানের প্রশংসা করতেই হয়!

ছোটকালে তোমায় 'টেডি বেয়ার' দিয়ে ভুলানো গেলেও, এখন ম্যাকবুকেও মন ভরে না। দেশিয় ব্র্যান্ডের কসমেটিকস দেখলে তো ভুরু কুঁচকে ফেলো। নিত্যনতুন ডিজাইনের জামাকাপড় পানতা ভাতের মতো হয়ে গেছে তোমার কাছে। বান্ধবীদের নিয়ে রোজ রোজ আড্ডাটা ভালোই জমাও। তোমার খোঁপায়-সাজানো লাল গোলাপ যখন পুবালি হাওয়ায় দোলে—তখন নিজেকে অপরূপা মনে হয়, তাই না? তোমায় হাঁটতে দেখে তো গুনগুনিয়ে গান গায় অনেকেই।

তোমাগমনে নাচিছে দুলিয়া কৃষ্ণচূড়ার মঞ্জরি

চিত্তমাঝে উঠিছে মম বনমর্মর গুঞ্জরি

তব কোকিলসম সুমধুর সুর তুলিয়াছে প্রণয়ধ্বনি

উন্মদপবনে বাজিছে আজি তোমার আগমনী

হৃদয়মন্দিরে রাখিয়াছি সখী তোমারে সাজায়ে আমি

দিবস-রজনি তোমাতে করি ভালোবাসাময় পাগলামী

'সুইট হার্ট', 'লাভিউ', 'কিস ইউ', 'মিস ইউ'—এসব শুনতে শুনতে হয়তো কান ঝালাপালা হয়ে গেছে। ছেলেবন্ধুরা তো নিয়মকরে দুবেলা ক্রাশ খায় তোমার ওপর। তোমার লাল-শাড়ি-পরা সেলফি দেখে একাকী জিভের জল ফেলে ওরা। তোমায় নিয়ে নিশিতে হারিয়ে যায় ঘোরস্বপ্নের দেশে। এফবিতে ফলোয়ার তো কয়েক হাজার জুটিয়েছ। 'ওভার স্মার্ট' একটা বয়ফ্রেন্ড সারাক্ষণ তোমার পেছন ঘুরঘুর করে। তাকে নিয়ে সেলফি আপলোড করার সাথে সাথে লাইকের বন্যা বয়ে যায়। কমেন্ট বক্সটা ভরে যায়—লাভিউ, ওয়াও, অসাম, নাইস দিয়ে।

বলো তো, এর বাইরে আর কী কী চাও?

আর কিসের কিসের অভাব বোধ করো তুমি?

দেহজুড়ে হিরে-মুক্তো-পান্না-খঁচিত অলংকার? নাকি শেরাটনে ফ্রেন্ডসদের নিয়ে প্রতিমাসে একটা জমকালো পার্টি? নাকি বিশ্বসুন্দরী প্রতিযোগিতায় নিজের দেহপ্রদর্শন করে 'মিস ওয়ার্ল্ড' খেতাব?

সত্যি করে বলো তো, এগুলোই কি তোমার শেষ চাওয়া? এসব পেলেই কি তৃপ্ত হবে তুমি? এর বাইরে আর কিছুই পেতে চাইবে না?

> "আদম-সন্তানের যদি এক উপত্যকা-ভর্তি স্বর্ণ থাকে, তবে অবশ্যই আরেকটি (উপত্যকা-ভরা) স্বর্ণ চাইবে। মাটি ছাড়া আর কিছুই তার মুখ ভর্তি করতে পারবে না।"[০২]

ভেবে দেখো—নবিজি ﷺ যা বলেছেন, তা অক্ষরে অক্ষরে সত্যি।

তুমি যদি অ্যামেরিকার ফার্স্ট লেডিও হয়ে যায়, তবুও সন্তুষ্ট হবে না। তোমায় যদি অ্যাপলের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসিডর বানিয়ে দেওয়া হয়, তবুও তৃপ্ত হবে না। আরও পেতে চাইতে। আরও এগোতে চাইতে সামনের দিকে। কেন জানো?

কারণ তুমি কী কী পাওনি—এর হিসেব নিয়েই দিনমান ব্যস্ত থাকো। কে কে তোমার চেয়ে এগিয়ে আছে, সারাক্ষণ এ নিয়েই জল্পনাকল্পনা করো। রূপচর্চা, পোশাক-আশাক, কিউটনেস, যশ, খ্যাতি—এসব দিক থেকে কোন কোন বান্ধবী তোমায় ছাড়িয়ে গেছে, সে চিন্তায় বিভোর থাকো তুমি। ওদের দেখে বড্ড হিংসে হয় তোমার।

এজন্যেই বোধহয় প্রতি সপ্তাহে পার্লারে যাও তুমি। স্প্যা করাতে যাও অভিজাত এলাকায়। ওসব স্প্যা সেন্টারে যে দেহব্যবসা চলে, জানো তো? স্প্যা করার দৃশ্য গোপন ক্যামেরায় ধারণ করে কাস্টমারকে ব্ল্যাকমেইলও করা হয়, সে খবর পড়েছ নিশ্চয়?

আচ্ছা, ছাড়ো ওসব।

কাজের কথায় আসি। তুমি কি কখনো হুইল চেয়ারে বসে-থাকা থুরথুরে বৃদ্ধার দিকে দৃষ্টি দিয়েছিলে? ওই বৃদ্ধার দিকে, যে দু-মুঠো ভাতের জন্যে লাঠি হাতে ভিক্ষে করে মানুষের দুয়োরে দুয়োরে? কিংবা ডাস্টবিনের পাশে দাঁড়িয়ে-থাকা ওই ছোট্ট মেয়েটার দিকে, যে কিনা চটের বস্তা হাতে পলিথিন কুড়োয় উচ্ছিষ্ট

---

[০২] তিরমিযি, মুহাম্মাদ ইবনু ঈসা, আস-সুনান, অধ্যায় : সংসারের প্রতি অনাসক্তি, হাদিস : ২৩৪০।

আবর্জনার মধ্য থেকে? অথবা দিনাজপুরের সেই কৃষানির দিকে, যে মহিলা থ্যালাসিমিয়ায় আক্রান্ত সন্তানের চিকিৎসার খরচ জোগাতে না পেরে আঁচলে মুখ লুকিয়ে ডুকরে ডুকরে কাঁদে?

হয়তো দাওনি। দিলে বুঝতে পারতে—কতটা সুখের সাগরে তুমি হাবুডুবু খাচ্ছ।

আজ তো প্রত্যেকেই নিজের অবস্থানের চেয়ে একধাপ বেশি পাওয়াকে ন্যায্য পাওনা মনে করে। যে ফকিরটা দু-বেলা খেতে পায়, সে কেন তিনবেলা খেতে পায় না—এ নিয়ে ভাগ্যকে দোষারোপ করে। যে স্যামসাং গ্যালাক্সি চালায়, সে কেন আইপ্যাড কিনতে পারে না—এটা নিয়ে যেন আফসোসের সীমা নেই তার। যে করোলাতে চড়ে, সে কেন প্রাডো কিনতে পারে না—এ নিয়ে মাথাব্যথা যেন তার বেড়েই চলছে।

এটা কি শয়তানের ফাঁদ নয়?

এই ফাঁদ কি রবের দেওয়া নিয়ামত সম্পর্কে বান্দাকে গাফিল করে দেয় না?

কী করে খাবে, কী করে আরেকটু ভালো চলবে—খালি এসব চিন্তা ঘুরঘুর করে মাথায়। সারাক্ষণ দরিদ্রতার ভয়ে ভীত থাকো তুমি। অথচ এগুলো নিতান্তই অমূলক ভাবনা। আল্লাহ তাআলা পৃথিবীকে উন্মুক্ত করে দিয়েছেন আমাদের জন্যে। তাই তো ওসব ছাইপাঁশ নিয়ে নবিজি ﷺ ভীত হননি। তিনি কোন জিনিসটার ভয় করেছিলেন, জানো?

> "আল্লাহর কসম! তোমাদের ওপর দরিদ্রতা আসবে আমি এ ভয় করি না। আমি তোমাদের জন্যে এ ভয় করি যে, যেভাবে তোমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর দুনিয়া প্রশস্ত হয়ে গিয়েছিল, সেভাবে তোমাদের জন্যেও দুনিয়া প্রশস্ত হয়ে যাবে। এরপর তোমরা তেমনই প্রতিযোগিতা করবে, যেমন করে তারা প্রতিযোগিতা করেছিল। আর (এ প্রতিযোগিতা) তোমাদের সেভাবে ধ্বংস করে দেবে, যেভাবে তাদের ধ্বংস করে দিয়েছিল।"[৩৩]

তুমি যদি দুনিয়ার চাকচিক্যই কামনা করো, তবে আল্লাহ তোমায় প্রাচুর্য দেবেন। নিজের মনোমতো জীবন চালানোর সুযোগ পাবে তুমি। যা যা চাইবে, সবই

[৩৩] মুসলিম, আবুল হোসাইন ইবনুল হাজ্জাজ, আস-সহীহ, অধ্যায় : দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি, হাদীস : ৭১৫৮।

হয়তো পেয়ে যাবে। সপ্তাহজুড়ে সেন্ট মার্টিন কাঁপিয়ে বেড়াবে বান্ধবীদের সাথে... বয়ফ্রেন্ডকে সাথে নিয়ে হারিয়ে যাবে লং ড্রাইভে... ভরি ভরি গহনার জমাবে ব্যাংকের ভল্টে...

অসম্ভব না, এগুলো হতেই পারে।

আল্লাহকে মান্য করে না, এমন জাতিও তো উন্নতির শিখরে পৌঁছোতে পারে। পৌঁছোতে পারে প্রগতির শীর্ষে। পরিশ্রম করলে কাফিররা যদি প্রাচুর্যের সন্ধান পায়, তুমি কেন পাবে না?

কিন্তু জীবনটা কি এসবের জন্যেই?

সব সময় আনন্দের মধ্য দিয়ে বেঁচে থাকাটাই জীবন?

রকমারি খাবার খেয়ে আর ঝিলমিলে পোশাক পরে মাস্তি করাটাই কি জীবনের সার্থকতা?

এসবের জন্যেই কি দুনিয়ায় এসেছ তুমি?

> "অচিরেই আমার উম্মতের মধ্যে একটি শ্রেণীর বিকাশ ঘটবে, যারা প্রাচুর্যের মধ্যে জন্ম নেবে এবং তাতেই পরিপুষ্টি লাভ করবে। তাদের সকল প্রচেষ্টার লক্ষ্য হবে রকমারি খাবার ও রঙ-বেরঙের পোশাক লাভ করা। ওরা কথা বলবে দম্ভভরে। ওরা হলো আমার উম্মতের নিকৃষ্ট অংশ।"[৩৪]

জীবনের মানে কী?

বলো না, জীবনের মানে কী?

একটি বারের জন্যেও কি জীবনের উদ্দেশ্য তালাশ করেছ?

কেন এ ধরায় এসেছ, কেন সৃষ্টি হয়েছ মানুষ হিসেবে, কী উদ্দেশ্যে তোমায় শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি বানানো হয়েছে—এগুলোর উত্তর খুঁজেছ কখনো?

খুঁজোনি।

---

[৩৪] আহমাদ ইবনু হাম্বল, কিতাব আয-যুহদ (অনুবাদ : রাসূলের চোখে দুনিয়া), পৃষ্ঠা : ১০৪-১০৬।

বোন আমার, জীবনকে স্পাইসি করে তোলার সব আয়োজনই বৃথা, যদি আমরা না জানি—আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য কী। জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য কেউ যদি ঠাওর করতে না পারে, তা হলে দুনিয়ায় আসাটা তার জন্যে মূল্যহীন। আর মুসলিম পরিবারে জন্ম নিয়ে কেউ যদি এমনটা করে, তবে তার জীবনটা তো ষোলোআনাই মূল্যহীন। ওর জীবন আর নাদুসনুদুস গরুর জীবনের মধ্যে তেমন কোনো পার্থক্য নেই। ওই গরুটা Voracious Animal, আর সে Voracious Human—পার্থক্য সর্বোচ্চ এতটুকুই।

এসব নীতিকথা বলে লাভ নেই, তাই তো বলবে তুমি?

আমি জানি, এগুলো এখন আর তোমায় টানে না। ধর্মের বিধিবিধান তো অনেক আগ থেকেই সেকেলে মনে করো। রমাদানে তারাবীর সালাত ছাড়া বাদবাকি সালাতের কোনো খোঁজই রাখো না। এও জানো না—তাওহীদ কাকে বলে, সুন্নাহ কাকে বলে, তোমার ওপর স্রষ্টার দেওয়া দায়িত্ব কী কী। জানতে ইচ্ছেও করে না হয়তো…

> "আমার ইবাদত করার উদ্দেশ্যেই আমি জিন ও মানুষ জাতিকে সৃষ্টি করেছি।"[৩৫]

দুনিয়ার চাকচিক্য আর প্রসাধনীর মোহ তোমায় অন্ধ করে দিয়েছে। তাই তো তুচ্ছ মনে হচ্ছে আল্লাহর দেওয়া বিধিবিধানকে। ব্যাকডেইটেট মন হচ্ছে হিজাব-নিকাবকে। কুরআনের বদলে গানেই বেশি তৃপ্তি পাচ্ছ। মিনিস্কার্টকে মনে হচ্ছে আধুনিকতা। কাজলকালো চোখ আর মেইকআপ করা চেহারার মধ্যেই প্রশান্তি খুঁজে বেড়াচ্ছ। বাহ! দুনিয়া বেশ ভালোই প্রতারিত করেছে তোমাকে!

> "তারা তাদের দ্বীনকে খেল-তামাশার বস্তু বানিয়েছিল, আর দুনিয়ার জীবন তাদেরকে প্রতারিত করেছিল।"[৩৬]

আচ্ছা, একটা জিজ্ঞাসা : যে দুনিয়ার মোহে পড়ে তোমার রবকে ভুলে যাচ্ছ—এ দুনিয়ার গুরুত্ব কতটুকু? তুমি কি জানো, তোমার রবের কাছে এই দুনিয়ার মূল্য কেমন?

---

[৩৫] সূরা আয-যারিয়াত, (৫১) : ৫৬ আয়াত।

[৩৬] সূরা আল-আরাফ, (০৭) : ৫১ আয়াত।

> "দুনিয়ার জীবন খেল-তামাশা ছাড়া আর কিছুই না। (তবে) যারা তাকওয়া অবলম্বন করে, তাদের জন্যে পরকালের জীবনই অধিক কল্যাণময়। তবুও কি তোমাদের বোধোদয় হবে না?"[৩৭]

যিনি দুনিয়া সৃষ্টি করেছেন, তিনিই বলেছেন—দুনিয়া মূল্যহীন। নিছক ছেলেখেলার মতো। এটাই বাস্তবতা। কিন্তু বাস্তবতা তো তুমি বুঝতে চাও না। বুঝবে কী করে বলো, দ্বীনি কথাবার্তা তো এক কান দিয়ে শুনো, আরেক কান দিয়ে বের করে দাও। আল্লাহর কোনো কথারই গুরুত্ব দিতে চাও না।

গুরুত্ব দাও বা না-দাও, সে তোমার ব্যাপার। কিন্তু মহামহিম আল্লাহর কাছে এ দুনিয়ার কোনো মূল্য নেই। এটি একেবারেই তুচ্ছ একটা জায়গা।

> "এই দুনিয়া যদি আল্লাহর কাছে একটি মশার ডানার সমানও মূল্য রাখত, তবে তিনি এ (দুনিয়া) থেকে কোনো কাফিরকে এক ঢোক পানিও পান করতে দিতেন না।"[৩৮]

আমার কথাগুলো শুনে কি বিরক্তি বোধ করছ?

আমি তো কথাসাহিত্যিক নই, তাই হয়তো সুন্দরভাবে গুছিয়ে বলতে পারছি না। তবুও একটু শুনেই দেখো না। হিন্দি সিরিয়াল দেখেও তো অনেক সময় পার করো। আজ না হয় কিছুটা সময় আমার সাথে নষ্ট করলে। কেমন!

একবার কী হয়েছিল জানো?

একবার মদীনার বাজার দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন নবিজি ﷺ। সাহাবিরাও হাঁটছিলেন তাঁর সাথে সাথে। হাঁটতে হাঁটতে তাঁরা একটি বাজারের কাছে পৌঁছোলেন। বাজারের ধারেই পড়েছিল একটি মৃত বকরির বাচ্চা। আর ওইটার কান ছিল বেশ ছোট। নবিজি মৃত বাচ্চাটির কান ধরে বললেন, 'তোমাদের কেউ কি এক দিরহামের বিনিময়েও এটা নিতে আগ্রহী হবে?'

সাহাবিরা বললেন, 'আল্লাহর শপথ! কোনো কিছুর বিনিময়েও তো আমরা এটা নিতে আগ্রহী নই। এই মৃত বাচ্চা দিয়ে আমরা কী করব।'

---

[৩৭] সূরা আল-আনআম, (০৬) : ৩২ আয়াত।

[৩৮] তিরমিযি, মুহাম্মাদ ইবনু ঈসা, আস-সুনান, অধ্যায় : সংসারের প্রতি অনাসক্তি, হাদীস : ২৩২৩; আলবানি, মুহাম্মাদ নাসীরুদ্দীন, আস-সহীহাহ, হাদীস : ৯৪০।

রাসূল ﷺ বললেন, '(বিনে পয়সায়) তোমরা কি এটা নিতে আগ্রহী?'

সাহাবিরা বললেন, 'এর কান তো খুবই ছোট। এটা যদি জীবিত থাকত, তবুও আমরা নিতাম না, আর এখন তো এটা মৃত। কিভাবে আমরা তা নিতে পারি?'

তাঁদের উত্তর শুনে রাসূল ﷺ বললেন, 'আল্লাহর শপথ! এটা তোমাদের কাছে যতটা তুচ্ছ, আল্লাহর কাছে এ দুনিয়া তার চেয়েও তুচ্ছ।'[৩৯]

বোন আমার, এইটাই বাস্তবতা। এটাই হচ্ছে দুনিয়া, যার পেছনে হন্যে হয়ে ছুটছ তুমি। যার পেছনে ব্যয় করছ যৌবনের দামি সময়গুলোকে। নিজের শরীরকে পর্যন্ত বিলিয়ে দিচ্ছ এই মূল্যহীন দুনিয়ার পেছনে। বড় আফসোস তোমার জন্যে!

ইবনুল কাইয়িম ﷺ খুব সুন্দর কিছু কথা বলেছেন :

> "দুনিয়া হলো পতিতা নারীর মতো, যে একজন স্বামীর সাথে স্থির থাকে না বরং একাধিক স্বামী তালাশ করে—তাদের সাথে আরও বেশি ভালো থাকার আশায়। ফলে সে বহুগামী হওয়া ব্যতীত সন্তুষ্ট থাকে না। দুনিয়ার পেছনে ঘোরা হলো হিংস্র জানোয়ারের চারণভূমিতে বিচরণ করার মতো। এতে সাঁতার কাটা মানে কুমিরের পুকুরে সাঁতার কাটার মতো। দুনিয়ার দ্বারা আনন্দিত হওয়া মানে হলো নিশ্চিত দুশ্চিন্তায় পতিত হওয়া। দুনিয়ার ব্যথা-বেদনাগুলো এর স্বাদ থেকেই সৃষ্টি হয়। এর দুঃখ-কষ্টগুলো এর আনন্দ থেকেই জন্ম নেয়।"[৪০]

যে মেয়েটি পুরো শরীর ঢেকে বাইরে বেরোয়, তাকে দেখলে কেন জানি খুব হাসি পায় তোমার। মনে মনে ভাবো—'ছি! দেখতে কেমন বিচ্ছিরি লাগে। যেন জীবন্ত তাঁবু।' মাদ্রাসাপড়ুয়া মেয়েদের তো 'অবরোধবাসিনী' বলে দিনরাত গালি দাও। তোমার যে বান্ধবী প্রসাধনী মাখতে অপছন্দ করে, তাকে দেখলে কেমন জানি বিরক্তি ভাব জন্ম নেয় তোমার অন্তরে। মাঝে মধ্যে তো মুখ ফুটে বলেই ফেলো—'এসব ছোটলোকামো ছাড়, বুঝলি? যুগ বদলে গেছে। যুগের সাথে তাল মেলাতে শিখ। গেঁয়োভাব ছেড়ে, একটু স্মার্ট হয়ে চলার চেষ্টা কর।'

মনে মনে এদের সবাইকেই Loser মনে করো তুমি, তাই না?

---

[৩৯] মুসলিম, আবুল হোসাইন ইবনুল হাজ্জাজ, আস-সহীহ, অধ্যায় : দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি, হাদীস : ৭১৫০।

[৪০] ইবনুল কাইয়িম, মুহাম্মাদ ইবনু আবী বকর, মুখতাসার আল-ফাওয়াইদ, পৃষ্ঠা : ৩২।

আজ যাদের লুযার বলে হাসি-তামাশা করো, তারা অন্ধ হয়ে যায়নি স্মার্টনেসের নামে শরীরপ্রদর্শনীর মোহে। ওরা দুনিয়ার চাকচিক্য চায়নি, তাই হয়তো তোমার ধারেকাছেও পৌঁছোতে পারেনি। ওদের গায়ে Lacoste, Artistry কিংবা Adidas-এর ড্রেস নেই। DKNY Golden, Shalini, কিংবা Caron Poivre পারফিউমও ব্যবহার করার সামর্থ্য হয়নি তাদের। পার্লারের দরজাও হয়তো মাড়ায়নি কোনো দিন। দুনিয়াটাকে তারা হয়তো উপভোগ করতে পারে না তোমার মতন। কিন্তু এর পরেও ওরা ব্যর্থ নয়, লুযার নয়।

সত্যিকার অর্থে লুযার কারা, জানো?

> "বলো, আমি কি তোমাদের ওই সব লোকের সংবাদ দেব, যারা কর্মের দিক থেকে খুবই ক্ষতিগ্রস্ত (লুযার)? তারা হলো সেসব লোক—দুনিয়ার জীবনে যাদের চেষ্টা-সাধনা ব্যর্থ হয়ে গেছে, আর তারা মনে করছে যে তারা ঠিক কাজটিই করেছে।"[৪১]

আপাতদৃষ্টিতে ওদের লুযার মনে করতে পারো। কিন্তু এটা কোনো উপপাদ্য না যে, 'মনে করি' দিয়ে শুরু করে শেষটায় 'প্রমাণিত' লিখে দেবে। এটা বাস্তবতা। অবশ্য বাস্তবতা তো তোমার কাছে খুবই অবাস্তব!

তুমি যাদের লুযার বলো, ওরা কিন্তু খালি হাতে কবরে যাবে না। ওই লুযাররা (!) কবরের জীবনে অনেক কিছু সাথে নিয়ে যাবে। ওদের আমলনামা পূর্ণ থাকবে সালাত-সাওম-পর্দা-যিকির-তিলাওয়াত-সহ অনেক ইবাদত দিয়ে। কিন্তু তুমি? তুমি কী নেবে বলো?

তুমি দুনিয়ার চাকচিক্য চেয়েছ, আল্লাহ তোমায় তা-ই দিয়েছেন। যেমনটা নমরুদ রাজত্ব চেয়েছিল, আর আল্লাহ তাআলা ওকে দুনিয়ার রাজত্ব দিয়েছিলেন। কিন্তু মরার পর সাথে করে নমরুদ কী নিতে পেরেছে? ওর ধন-সম্পদ তো দুনিয়াতেই রেখে যেতে হয়েছে। নিতে পারেনি কিছুই।

তুমিও তো ওর পথেই হাঁটছ। সাথে করে নেওয়ার মতন কিছু আছে কি তোমার? জমিয়েছ কিছু? সখের মেইকআপ বক্স, রেভেন-এর ব্ল্যাক সানগ্লাস, পার্পল কালারের প্রিয় জামা, সদ্য-কেনা হাই হিল, সো স্মার্ট বয়ফ্রেন্ড—এইগুলো? এগুলো কি সাথে নিতে পারবে? একদিন চোখ খুলে দেখবে ওই সব লুযাররাই

---

[৪১] সূরা আল-কাহফ, (১৮) : ১০৩-১০৪ আয়াত।

তোমার চেয়ে অনেক উঁচুতে অবস্থান করছে। আর এত বিলাসিতার মধ্যে থেকেও শূন্য হাতে মাঠের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে দৌড়োচ্ছ তুমি।

সত্যিকার লুযার কে? ওরা নাকি তুমি?

> "যারা এ দুনিয়ার জীবন ও তার চাকচিক্য কামনা করে, আমি তাদের কৃতকর্মের ফল দুনিয়াতেই দিয়ে দিই। আর তাদের জন্যে কিছুই কম করা হয় না। তারা এমন লোক যে, আখিরাতে আগুন ছাড়া তাদের জন্যে কিছুই নেই। আর তাদের যাবতীয় কাজকর্ম বিফল হবে।"[৪২]

ধরো, প্রাইভেট ভার্সিটিতে লাখ লাখ টাকা খরচ করে তুমি পড়াশুনো শেষ করলে। কিন্তু সমাবর্তনের পরে দেখলে—চাকরির বাজারে তোমার সাবজেক্টের আদৌ কোনো চাহিদা নেই; অথবা রাতের-পর-রাত জেগে সেমিস্টার ফাইনালের জন্যে প্রস্তুতি নেওয়ার পর হলে গিয়ে দেখলে, তুমি ভুল পরীক্ষার জন্যে প্রস্তুতি নিয়েছিলে; কিংবা ফেইসবুকে সুদর্শন পুরুষ ভেবে ভালোবেসে যাকে হৃদয়ে স্থান দিলে, সে আসলে পুরুষ না, হিজড়া—এসব পরিস্থিতে পড়লে, কেমন লাগবে তোমার?

আমি যদি বলি—যে পথে হাঁটছ তুমি, সে পথটাও ঠিক তেমন। ওই পথ গোলকধাঁধার পথ! পথের শেষটায় আছে মরণঘাতী খাঁদ। ওখানে পড়ে গেলে আর রক্ষে নেই। ও পথে কোনো আলো নেই। কেবল অন্ধকার আর অন্ধকার। আসলে লুযাররাই আঁধারের পথে হাটে। আর যারা সত্যিকারের কামিয়াবি চায়, তারা হাঁটে আলোর পথে।

তুমি আজ যা কিছুকে কল্যাণকর মনে করছ, সেগুলো আদৌ কল্যাণকর নয়। হয়তো ভালো প্রফেশনকে সফলতা মনে করছ। স্মার্টনেস ঠাওরাচ্ছ ছেলেদের সামনে নিজেকে আকর্ষণীয় করে উপস্থাপন করাকে। বয়ফ্রেন্ডকে জড়িয়ে ধরে বাইকে উড়ে যাওয়াকেই সাকসেস ভাবছ। কিন্তু সত্যিকার অর্থে এগুলোর কোনোটিই সফলতা নয়। সফলতা কাকে বলে জানো?

> "মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদের জন্যে আল্লাহ এমন জান্নাতের ওয়াদা দিয়েছেন, যার তলদেশে ঝর্না প্রবাহিত থাকবে। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। আর (ওয়াদা দিয়েছেন) উত্তম বাসস্থানের, ওই

---

[৪২] সূরা হুদ, (১১) : ১৫ আয়াত।

স্থায়ী জান্নাতে। আর আল্লাহর সন্তুষ্টি হলো (তাদের জন্যে) সবচেয়ে বড় নিয়ামত। এটাই হলো মহা সাফল্য।"[৪৩]

হ্যাঁ, এটাই মহা সাফল্য। Greatest Success. সত্যিকারের সফলতা হলো জান্নাত। যাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে, সে-ই কামিয়াব। সে-ই সফল।

বোন আমার, সতর্ক হও। রাজাধিরাজ আল্লাহর হুকুমগুলোকে এভাবে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ো না। মনে রেখো—এ জমিন আল্লাহর। তাঁর ইচ্ছাতেই সবকিছু হয়। তিনি সবকিছুর ওপর পূর্ণ কর্তৃত্বশীল। তুমি প্রতিনিয়ত যে শ্বাস-প্রশ্বাস নাও, ওটা আল্লাহর হুকুমেই তোমার দেহে প্রবেশ করে। আল্লাহ না চাইলে, এক ফোঁটা অক্সিজেনও তোমার শরীরে ঢুকবে না। তাই আল্লাহর অবাধ্য হওয়ার পরেও নিজের সব চাহিদা পূর্ণ হচ্ছে বলে, ধরাকে সরা জ্ঞান কোরো না। আল্লাহ তাআলা ছাড় দেন, কিন্তু ছেড়ে দেন না।

"যখন তুমি দেখবে পাপাচার করা সত্ত্বেও আল্লাহ তাআলা কোনো ব্যক্তিকে দুনিয়ার জীবনে তার প্রিয় বস্তুগুলোকে দিয়ে দিচ্ছেন, তখন বুঝবে—এটা হলো তাকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেওয়ার জন্যে একটি টোপ মাত্র।"[৪৪]

আধুনিকতার ভয়াল স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়ো না। অনেক বিত্তশালী মহিলা এখন রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষে করে বেড়ায়। ভার্সিটির বহু অধ্যাপিকা বৃদ্ধাশ্রমে জীবনের শেষ দিনগুলো পার করে নিঃসঙ্গ অবস্থায়। একসময়কার পর্দা কাঁপানো অভিনেত্রীরা কিছু টাকা অনুদান পাবার আশায় এফ.ডি.সি-র গেইটে দাঁড়িয়ে থাকে অপলক দৃষ্টিতে।—এগুলো তো দুনিয়াতে কিছু নমুনা মাত্র, আর আখিরাতে!

"যারা কুফরি করে তারা যেন কিছুতেই ধারণা না করে যে, আমি তাদের যে অবকাশ দিয়েছি তা তাদের জন্যে কল্যাণকর। আমি তো শুধু এ জন্যেই তাদের অবকাশ দিই—যেন তাদের পাপের পরিমাণ আরও বেড়ে যায়। আর তাদের জন্যে তো আছে অপমানকর শাস্তি।"[৪৫]

---

[৪৩] সূরা আত-তাওবা, (০৯) : ৭২ আয়াত।

[৪৪] আহমাদ ইবনু হাম্বল, কিতাব আয-যুহদ (অনুবাদ : রাসূলের চোখে দুনিয়া), পৃষ্ঠা : ৪৯-৫০।

[৪৫] সূরা আলি ইমরান, (০৩) : ১৭৮ আয়াত।

তুমি কি জানো না, এই চাকচিক্যের মোহ একদিন শেষ হয়ে যাবে?

মাঝে মধ্যে তো ট্রল করে স্ট্যাটাস দাও—'একদিন চলেই যাব আমরা সবাই, থাকব না আমরা কেহ। শুধু মাটির বুকে পড়ে রবে দেহ।'

হ্যাঁ, মৃত্যুটা এমনই বাস্তবতা। আর এই বাস্তবতার মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে সবাইকেই। কী ছেলে কী বুড়ো, সবাই আলিঙ্গন করবে মৃত্যুকে। এমনকি যে ব্যক্তি আল্লাহকে বিশ্বাস করে না, সেও।

কেন জানি এ বাস্তবতাকে সব সময় এভয়েড করো তুমি। মৃত্যুর কথা স্মরণ করিয়ে দিলে, পাশ কাটিয়ে চলে যাও। আমি জানি না, কেন এমনটা করো।

তুমি কি কখনো এমন রাতের কথা চিন্তা করোনি, যার পরদিন সকালে তোমার মৃত্যু? নাকি এটাই মনে করো—তরুণীরা অমর, আর বৃদ্ধারা মরণশীল? তুমি কি দেখোনি তোমার বয়সী কত যুবতী এই দুনিয়া থেকে চলে গেছে? তোমার সামনেই তো ক্লাস সেভেনের কিশোরীটা লিউকোমিয়ায় মারা গেল। এই তো গত পরশু ইন্টারমিডিয়েট-পড়ুয়া মেয়েটা সেলফি তুলতে গিয়ে কাটা পড়ল ট্রেনের নিচে। আজ বিকেলেও তো এক কুমারীর জানাজা হলো আমাদের মসজিদে। এগুলো জানার পরেও কি তোমার হুঁশ হবে না?

> "তোমরা যেখানেই থাকো না কেন, মৃত্যু তোমাদের নাগাল পাবে। যদিও তোমরা সুদৃঢ় দুর্গে অবস্থান করো।"[৪৬]

আসলে প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা তোমায় মোহাচ্ছন্ন করে রেখেছে। তাই এগুলো থোড়াই কেয়ার করো! কত-না ভুলের সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছ তুমি। এই মোহ কবে কাটবে তোমার?

> "প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা তোমাদেরকে মোহাচ্ছন্ন করে রেখেছে, যতক্ষণ না তোমরা কবরে এসে উপস্থিত হও। (তোমরা যে ভুল ধারণায় ডুবে আছ) এটা মোটেই ঠিক নয়। শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে। আবার বলি, এটা মোটেই ঠিক নয়; শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে।"[৪৭]

---

[৪৬] সূরা আন-নিসা, (০৪) : ৭৮ আয়াত।

[৪৭] সূরা আত-তাকাসুর, (১০২) : ১-৩ আয়াত।

একদিন সুন্দর দেহটা মাটির সাথে মিশে যাবে। শেষ হয়ে যাবে বন্ধু-আড্ডা-গানের মেকির জগতটা। পড়ে রবে তোমার শখের পারফিউম-লিপস্টিক-স্কার্ট, সব। সবকিছু। একদিন চলে যেতে হবে এগুলো ফেলে। পরমবিশ্বাসে যে ছেলেটার কাছে নিজের সবকিছু সঁপে দিয়েছিলে, সেও সাথে যাবে না। যেসব বান্ধবীদের সাথে হিন্দি সিরিয়াল দেখে রাতের-পর-রাত পার করেছিলে, তারাও সাথে যাবে না। মিস-বাংলাদেশ প্রতিযোগিতায় পাওয়া স্বর্ণের মুকুটটা ওভাবেই পড়ে রইবে। শুধু তুমি চলে যাবে। একা। একাকী।

চোখ বুজে এই দৃশ্যগুলো উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছিলে কখনো?

> "তিনটি জিনিস মৃতব্যক্তিকে অনুসরণ করে থাকে। দুটো ফিরে আসে, আর একটি তার সাথে থেকে যায়। তার পরিবার, তার মাল, তার আমল তাকে অনুসরণ করে। তার পরিবার ও মাল ফিরে আসে, কিন্তু আমল তার সাথে থেকে যায়।"[৪৮]

মেহেদিরাঙা হাতে আজ হয়তো আইফোন শোভা পাচ্ছে। কিন্তু কাল সে হাত খালি থাকবে। খালি থাকবে নীলাজনীল-পোশাক-পরা শরীরটাও। রিক্ত-হস্তেই তুমি সাক্ষাৎ করবে আল্লাহর সাথে।

> "নিশ্চয়ই তোমরা খালি পা, উলঙ্গ... অবস্থায় আল্লাহ তাআলার সাথে সাক্ষাৎ করবে।"[৪৯]

আমি জানি না, তুমি কেন এই বিষয়গুলো বুঝতে চাও না। আর কেনই বা বুঝলেও মানতে চাও না।

বোন আমার, স্বেচ্ছায় বরবাদ করে দিয়ো না নিজেকে। যৌবনের দামি সময়গুলো এভাবে হেঁয়ালি করে পার কোরো না। ভুলে যেয়ো না—ফসলের সজীবতা কখনো চিরদিন থাকে না। একসময় তা খড়কুটো হয়ে উড়ে যায় ঘূর্ণি বায়ুর সাথে। ওর অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যায় চিরদিনের জন্যে। দুনিয়াটাও ঠিক তেমন। জাস্ট হোকাস পোকাস।

> "তোমরা জেনে রেখো, দুনিয়ার জীবন ক্রীড়া-কৌতুক, জাঁকজমক, পাস্পরিক অহংকার-প্রকাশ, ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে আধিক্য

---

[৪৮] বুখারি, মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল, আস-সহীহ, অধ্যায় : কোমল হওয়া, হাদীস : ৬০৭০।

[৪৯] বুখারি, মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল, আস-সহীহ, অধ্যায় : কোমল হওয়া, হাদীস : ৬০৮১।

> লাভের প্রতিযোগিতা-মাত্র। তার উদাহরণ হলো—বৃষ্টি, আর তা হতে উৎপন্ন শস্য—যা কৃষকের মনকে আনন্দে ভরে দেয়। তারপর তা পেকে যায়, তাই তুমি তাকে হলুদ বর্ণ দেখতে পাও। অবশেষে তা খড়-কুটোয় পরিণত হয়ে যায়। (কাফিরদের জন্যে) পরকালে রয়েছে কঠিন শাস্তি এবং (নেককারদের জন্যে আছে) আল্লাহর ক্ষমা ও সন্তুষ্টি। আর দুনিয়ার জীবন তো ধোঁকার বস্তু ছাড়া আর কিছুই নয়।"[৫০]

তুমি আমার কথাগুলো এভয়েড করতে করতে পারো। এক কান দিয়ে শুনে বের করে দিতে পারো আরেক কান দিয়ে। কিন্তু একদিন তো ঠিকই উপলব্ধি করবে। একেবারে দৃঢ় বিশ্বাসী হয়ে যাবে সুবোধ বালিকার মতো। কিন্তু তোমার সে উপলব্ধি কোনো কাজে আসবে কি?

> "সেদিন জাহান্নামকে উপস্থিত করা হবে। আর সেদিন মানুষ উপলব্ধি করবে। কিন্তু তার সে উপলব্ধি কোন উপকারে আসবে? সে বলবে, হায়! আমার এ জীবনের জন্যে যদি অগ্রিম কিছু পাঠাতাম!"[৫১]

সেদিন সত্যকে উপলব্ধি করে কোনো লাভ হবে না। কিভাবে হবে বলো? তোমাকে একটা লম্বা হায়াত দেওয়া হয়েছিল, সেটা শেষ করে দিয়েছ মাস্তি করে। আল্লাহর নিয়ামতের সবটাই তো যাচ্ছেতাই কাজের পেছনে ব্যয় করেছ। পরকালের জন্যে কিছুই করোনি। চটে যেয়ো না আমার কথা শুনে। জেদ একটু থামাও। মন দিয়ে শুনো কথাগুলো।

কত ওয়াক্ত সালাত তুমি মনোযোগ সহকারে আদায় করেছ?

রমাদানের কতটা সিয়াম পালন করেছ নিষ্ঠার সাথে?

রূপচর্চার নামে শরীর-প্রদর্শন বন্ধ করেছিলে কি?

অন্যের দোষচর্চা থেকে নিজেকে বিরত রেখেছিলে?

মানুষের উপহাস সয়ে নিয়ে সেক্যুলারদের ভাষায় 'জীবন্ত তাঁবু' হতে পেরেছিলে তো?

---

[৫০] সূরা আল-হাদীদ, (৫৭) : ২০ আয়াত।
[৫১] সূরা আল-ফাযর, (৮৯) : ২৩-২৪ আয়াত।

যত পারো নিজেকে ফাঁকি দাও। এ ফাঁকিই তোমার ধ্বংস ডেকে আনবে। কারও কিছু করার থাকবে না। ফাঁকি মারতে গিয়ে আজ যেভাবে আল্লাহকে ভুলে যাচ্ছ, কাল ঠিক সেভাবে তোমাকেও ভুলে যাওয়া হবে।

> "আল্লাহ বলবেন, এভাবেই তো আমার নিদর্শনসমূহ যখন তোমার কাছে এসেছিল তখন তুমি তা ভুলে গিয়েছিলে। আজ সেভাবেই তোমাকে ভুলে যাওয়া হলো।"[৫২]

বোন আমার, তুমি যে পথে হাঁটছ, ওটা অন্ধকারের পথ। বিন্দুমাত্র আলো নেই সেখানে। ও পথ যতই পাড়ি দেবে, ততই হারিয়ে যাবে নিকষকালো আঁধারে। তুমি অন্ধকারে হাঁটবে আর পথহারা হবে। ওখানে আঁধারের বাঁদুরেরা তোমায় ভয় দেখাবে ক্ষণে ক্ষণে। দুরুদুরু বক্ষে তোমার গা শিউরে উঠবে বারে বারে। একাকী তুমি আরও ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়বে। ভীত-বিহ্বল চিত্তে একসময় হতাশার সাথে আলিঙ্গন করবে। ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত হয়ে পা পিছলে হঠাৎ তলিয়ে যাবে ভয়ানক খাঁদে। একা, একাকী পড়ে রইবে ওখানে। ধীরে ধীরে আঁধারের ভীতি তোমায় গ্রাস করে নেবে। বেদনায় কাতরাতে থাকবে তুমি। দুঃসহ যন্ত্রণায় তড়পাতে থাকবে। কিন্তু কোনো সাথি খুঁজে পাবে না। কেউ সাড়া দেবে না তোমার আর্তচিৎকার শুনে। এরপর... এরপর একরাশ হাহাকার আর বুকভরা বেদনা নিয়ে সমাপ্তি ঘটবে একটি নির্মল জীবনের।

পথিক! তোমায় আলোর পথে ডাকছি আমি। এ পথে কোনো আলোআঁধারি খেলা নেই। কালোছায়ার ভীতি নেই। নেই আঁধারের বাঁদুরের কোনো উৎপাত। এখানে চারিদিকে কেবল আলো আর আলো। আলো থেকে ছিটকে-পড়া রশ্মিগুলো তোমায় ডাকছে হাতছানি দিয়ে। আলোক-আভা তোমার সাথে আলিঙ্গন করার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে। এ পথে হাঁটলে তুমি কখনো পথহারা হবে না। হারিয়ে যাবে না চোরাবালির অতল তলে। এখানে কেবল শান্তি আর শান্তি। সুখ আর সুখ। এ পথে চলতে থাকলে নিশ্চিন্তে-নির্ভয়ে পৌঁছে যাবে এর শেষ প্রান্তে। এর শেষটা যে মিশে আছে জান্নাতের সাথে।

তুমি ফিরবে না?

---

[৫২] সূরা ত্বহা, (২০) : ১২৬ আয়াত।

এসো সেই সে গগনতলে
যেথায় কেবলি আলোক জ্বলে
দিবস যেথায় উজলিত রবির আভা নিয়ে
নিশি যেথায় আলোকিত তারকারাজি দিয়ে
যেথায় ডানা মেলে উড়ে বেড়ায় প্রজাপতির দল
সকাল সাঁঝে নিত্য বাজে পাপিয়ার কোলাহল
মাতাল হাওয়া যেখান হতে নিয়েছে বিদায়
সুখ যেথায় দুখের পরে খেলা করে যায়
এসো সেই সে গগনতলে
যেথায় আলোর প্রদীপ জ্বলে
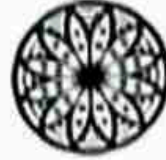
খুলো তব হৃদয়নন্দনদ্বার

বোন আমার, আল্লাহর এক নগণ্য দাস আমি। এর বাইরে দেওয়ার মতো কোনো পরিচয় নেই আমার। পড়াশোনায় ভালো ছিলাম বলে বাবা-মা'র অনেক স্বপ্ন ছিল আমাকে ঘিরে। সেগুলোর কোনোটাই আমি বাস্তবায়ন করতে পারিনি। একসময় জাহিলিয়াতের পথ ধরে অনেক দূর পর্যন্ত হেঁটেছি। ওই আলোআঁধারময় জগতের যত অলিগলি আছে, সবই আমার চেনা। ওগুলোর হাড়হদ্দ অবধি আমার বিচরণ ছিল। আল্লাহ তাআলা নিজ অনুগ্রহে ঈমানের সরোবর থেকে এক আজলা পানি পান করবার সুযোগ করে দিয়েছিলেন। সেই থেকেই জীবনটা বদলে গেছে। কৈশোর পেরিয়ে এখন আমি যৌবনে পদার্পণ করেছি। এই স্বল্পদৈর্ঘ্য জীবনে অল্পকিছু বাস্তব অভিজ্ঞতা ঝুলিতে জমা হয়েছে। সেইখান থেকেই আজ কিছু শোনাব।

২০১৭ সাল থেকে লেখালেখি করছি। সে হিসেবে এখন আমার লেখালেখির বয়েস মাত্র তিন বছর। অনেক বিষয় নিয়েই লিখেছি, লিখে চলছি। লেখালেখির মাধ্যমে সংশয়বাদীপ্রাণকে সত্যের পথে আহ্বান জানিয়েছি। মেঘরোদ্দুর-জড়ানো জীবন যারা যাপন করছে, তাদের জন্যে আবেগী ও আকুতিভরা লেখাও লিখেছি। লিখতে লিখতে কলম ক্লান্ত হয়ে গেছে। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, আমি কিছুই লিখিনি। যেসব ছাইপাঁশ নিয়ে এতদিন তৃপ্তির ঢেকুর তুলতাম, সেগুলো কোনো কাজেই আসেনি। অবাধ্যতা হুহু করে বেড়েই চলছে। অশ্লীলতা

ও নগ্নতার জোয়ারে ভেসে যাচ্ছে পুরো সমাজ। অপরাধের মাত্রা দিনদিন বেড়েই চলছে। এক দেশ থেকে অপর দেশে তা ছড়িয়ে যাচ্ছে পবনবেগে। করোনাভাইরাসের মতো নগ্নতার ভাইরাসেও গণহারে মানুষজন আক্রান্ত হচ্ছে। এমনকি ধর্মপ্রাণ-সমাজও এর কবল থেকে রেহায় পায়নি। যে সমাজে নারীদের গায়ে সূর্যের আলো পর্যন্ত লাগত না, আজ তারাই পর্দাকে জীবন্ত তাঁবু বলে উপহাস করছে। লেখিকারা পর্দানশীন নারীদের অবরোধবাসিনীর তালিকায় ফেলে দিচ্ছে। গোঁফওয়ালা বুদ্ধিজীবীরা পত্র-পত্রিকায় কলাম লিখছে হিজাব-নিকাবের বিরুদ্ধে।

আজ মনে হচ্ছে, আমাদের লেখনীগুলো সফল হয়নি। আকুতিভরা আহ্বানগুলো পাষাণ হৃদয়ে আঘাত হানতে পারেনি। আসলে হৃদয়রাজ্যে ঢোকার চাবি তো লেখকের হাতে নেই। আল্লাহ্ তাআলা ওই চাবির জিম্মাদারী তোমাদের কাছে ন্যস্ত করেছিলেন। আর তোমরা অন্তরকে তালাবদ্ধ করে রেখেছ। দীর্ঘদিন ধরে তালা না খোলার কারণে, ওখানে মরচে পড়ে গেছে। চাবিও হারিয়ে গেছে অনেক দিন আগে। সেই অবধি ওখানে কোনো আলো প্রবেশ করেনি। যেখানে কোনো আলো প্রবেশ করবার সুযোগ পায়নি, সেখানে আমাদের কথাগুলো পৌঁছোবে কী করে?

বোন হে আমার! খুলো তব হৃদয়নন্দনদ্বার

ওই নূতন উষার তরুণ আভা ডাকিছে বারংবার

যেতে দাও আজিকে তারে গহীন হিয়ার মাঝে

আলোকশিখা ছড়িয়ে যাক তোমার সকল কাজে

আমি জানি, প্রণয়রথের সারথি ছেলেরাই। ওরাই দাঁড়িয়ে থাকে তোমার পথের ধারে। দেখলেই মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করে। সুযোগ পেলে গোলাপ ধরিয়ে দিতে চায় হাতে। মেসেঞ্জারে নক করে বারবার জ্বালাতন করে। কিন্তু তোমার আশকারা না পেলে ওরা তো এমনটা করার সাহস পেত না। কাননে ফাগুনহাওয়া দেখেই ভ্রমর ব্যাকুল হয়। তুমি নম্রতা দেখাও, তাই সে গোঁ ধরে এগোতে থাকে। তুমি সদর-দরজা খুলে দিয়েছ, আর সে প্রবেশ করেছে। দুয়ার যদি বন্ধ রাখতে, তবে সে ডাকাতের বেশে প্রবেশ করা সুযোগ পেত না। বুনো নেকড়ে তো ভেড়ির গোশত খেয়েই বিদেয় হয়। কিন্তু ওই ডাকাত তোমার কাছে যা চায়, সেটা ভেড়ির গোশতের চেয়েও মূল্যবান। সেই মূল্যবান জিনিসের

সুরক্ষাদ্বার তুমি নিজ হাতে খুলে দিয়েছ। এরপর ডাকাত প্রবেশ করেছে। সে যদি এখন তোমাকে সর্বস্বান্ত করে, তবে এর দায় কি ওর একার?

প্রেমিকরা মুখে মুখে যা বলে, সেইটা বিশ্বাস কোরো না। ওদের অভিনয়ের ফাঁদে পা দিয়ো না। ওরা তোমার সাথে বন্ধুর মতো কথা বলে, 'আমরা তো বাস্ট ফ্রেন্ড' এই ধরনের মুখরোচক বুলি আওড়ায়। আল্লাহর শপথ, সব মিথ্যা কথা। সুযোগ পেলেই সে নেকড়ের মতন ঝাঁপিয়ে পড়বে। ছিঁড়েখুবলে খাবে তোমার পবিত্র দেহ। ওর হাসি বন্ধুত্বের হাসি না। ওর দুষ্টুমি নিছক ছেলেমানুষি না। অভিমান, ন্যাকামো, বাচ্চামো—এ সবকিছুর পেছনে ভিন্ন কোনো মতলব লুকিয়ে আছে।

আমি জানি, কথাগুলো বিশ্বাস করবে না। কারণ, সে একাকী তোমায় নিয়ে কিসব মন্তব্য করে, সেইটা কোনো দিন তুমি শোনোনি। ছেলেদের আসরে তোমার দেহ নিয়ে কী কী অশ্লীল মন্তব্য করা হয় সেটা যদি একবার বলতে পারতাম, তবেই হয়তো টনক নড়ত। কিন্তু ওসব বলতেও গা ঘিনঘিন করে। কল্পনার জগতে ওরা তোমাকে নগ্ন করে জিভের জল ফেলে। মোবাইলের স্ক্রিনে তোমার ছবি ভাসিয়ে যৌনতার অতলপারাবারে ডুব-সাঁতার কাটে।

এগুলো যদি পাশ কাটিয়ে যেতে চাও, তবে ক্ষতি তোমারই হবে। একদিন হয়তো তোমাকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে নিয়ে যাবে কোনো নির্জন স্থানে। ব্যস, বাকিটুকু ইতিহাস। তবে এই ইতিহাসখানি স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে না। এটা লেখা হবে তোমার শেষ সম্ভ্রমটুকু দিয়ে। ক্ষণিকের আনন্দের মাশুল পুরোটা জীবন ধরে দিয়ে যেতে হবে। এদিকে তুমি কলঙ্কের ছাপ নিয়ে সারাক্ষণ হতাশার সাগরে হাবুডুবু খাবে, আর সে নিত্যনতুন ফাঁদ পেতে অন্য কোনো শিকারের আশায় বসে থাকবে। কিন্তু লাঞ্ছনা আর অপমানের বোঝা মাথায় নিয়ে তোমাকে গুমরে গুমরে মরতে হবে। না সমাজ তোমায় ক্ষমা করবে, আর না নিজেই নিজেকে ক্ষমা করতে পারবে। হয়তো আর কোনো দিনই দখিনাহাওয়া এসে দোলা দেবে না কল্পনার বাতায়নে। বসন্তের বাতাসটুকু খেলা করবে না হৃদয়ের উঠোনে।

একটা কাহিনি শোনাই। রঙচঙ-মাখিয়ে বানানো কাল্পনিক না, বাস্তব। আমার খুব কাছের একজন বন্ধু হোয়াটস অ্যাপে এটা পাঠিয়েছে। ও বলে দিয়েছে, ঘটনাটা যেন তোমাকে শোনাই। ওর কোনো আবদারই আমি অপূর্ণ রাখিনি। এটাও তার ব্যতিক্রম হবে না।

সিরাজগঞ্জ ছেড়ে রাজশাহী সিটি কলেজে পড়তে এসেছিল এক নারী। নাম তার মিতা (ছদ্মনাম)। ছাত্রী হিসেবে ভালো ছিল বলে পিতা খুব কষ্ট করে মেয়ের খরচ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। মেয়েও পড়াশুনো চালিয়ে যাচ্ছিল দাঁতে দাঁত লাগিয়ে। কিন্তু এক কালবোশেখি ঝড়ে জীবনগতি অন্যদিকে মোড় নেয়।

তানভীর নামের এক ছেলের সাথে তার পরিচয় হয়। উল্লাপাড়া পৌরসভার ঝিকিড়া মহল্লার বাসিন্দা সে। সেও রাজশাহীতেই থাকত। পড়াশুনো করত। খুব দ্রুতই দুজনের মধ্যে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। মিতা জানত না, এই বন্ধুত্বই ওর জন্যে কাল হয়ে দাঁড়াবে। ওদের সম্পর্ক আস্তে আস্তে প্রণয়ে রূপ নেয়। চুটিয়ে প্রেম করতে থাকে দুজন। তানভীর যে প্রেমের অভিনয় করছে, এটা কল্পনাতেও আনেনি মিতা।

তানভীরের বাড়িতে নিয়মিত যাতায়াত করত মিতা। সুযোগ বুঝে প্রেমের অগ্নিপরীক্ষা নিত তানভীর। পরীক্ষায় পাশ করার জন্য নিজের সম্ভ্রম বিলিয়ে দিত মিতা। প্রতিটি অগ্নিপরীক্ষার দৃশ্য ধারণ করা হতো মোবাইলে। এই কাজে সহায়তা করত তানভীরের বন্ধু-বান্ধব। ওদের সামনেই পশুর মতো ব্যভিচারে লিপ্ত হতো দুজন। ঘটনাটা এখানেই শেষ হতে পারত। কিন্তু হয়নি। এরপর জল আরও অনেকদূর গড়িয়েছে!

বারবার অগ্নিপরীক্ষা নেওয়ার পরও তানভীর যখন পাশ মার্ক দিচ্ছিল না, তখন বেঁকে বসে মিতা। আর এতেই তানভীরের মুখোশ খুলে যায়। ধারণকৃত ভিডিয়োগুলো এলাকার লোকদের মধ্যে ছড়িয়ে দেয় তানভীর। লজ্জায় ক্ষোভে ভেঙে পড়ে মিতা। বেছে নেয় অবরুদ্ধ জীবন।

গত ১০ এপ্রিল মিতার বাবা বাদী হয়ে থানায় মামলা করে। অল্প সময়েই গ্রেপ্তার হয় তানভীর। পুলিশি-জেরায় বেরিয়ে আসে জড়িতদের নাম। ওই নোংরা ভিডিয়ো ধারনের কাজে তানভীরকে সহায়তা করত ছয় জন। তারা হলো—উল্লাপাড়া বিজ্ঞান কলেজের ছাত্র বন্ধন, রিফাত, পূর্ণতা ও মিম, ঢাকা কলেজের তুষার এবং টাঙ্গাইল পলিটেকনিকের ছাত্র সুমন। বন্ধন ও পূর্ণতার বাড়ি পাবনার সাঁথিয়া উপজেলায়। বাকিরা উল্লাপাড়ার।

পূর্ণতা ও মিম নাম শুনে চমকে উঠছ? আমিও প্রচণ্ড ঝাঁকুনি খেয়েছি। দুজন মেয়ে কিভাবে এমন অপকর্মের সাথে জড়িত হতে পারে, সেটা আমার মাথায়

ঢোকেনি। কোনো মেয়ের সম্ভ্রমহানির দৃশ্য যে আরেকজন মেয়ে সামনাসামনি দাঁড়িয়ে উপভোগ করতে পারে, এটা বিশ্বাস করতে বেশ কষ্ট হচ্ছিল। কিন্তু ওরা নিজেরাই অপরাধ স্বীকার করেছে পুলিশের সামনে।[৫৩]

উল্লাপাড়ার মিতা হয়তো এই পরিস্থিতিতে গলায় দড়ি দেয়নি, কিন্তু হাজারও মিতা এমন ঘটনার হাত ধরেই আত্মহত্যা করেছে। লজ্জায়-ঘৃণায়-অপমানে বিদায় নিয়েছে এই পৃথিবী থেকে। ইহকালে ওদের ললাটে জুটেছে নষ্টা মেয়ের উপাধি, আর পরপারে ব্যভিচারীর তকমা!

তোমায় আরও একটা ঘটনা বলি। কাহিনিটা যদিও অনেক বছর আগের, তবুও প্রাসঙ্গিক। এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে প্রভা নামের এক অভিনেত্রীর আখ্যান।

দীর্ঘ আট বছর ধরে রাজিবের সঙ্গে প্রেম করে যাচ্ছিল প্রভা। ঘর হওয়ার আগেই ঘরনির মতো জীবনযাপন শুরু করে দুজন! রঙেরসে প্রেমের ফাল্গুনী রচনা করতে নিজের মূল্যবান সম্ভ্রম বিলিয়ে দিচ্ছিল প্রভা। বিনিময়ে পেয়েছিল আঠারো লাখ টাকার গাড়ি। কিন্তু আট বছরের প্রেম পূর্ণতা পায়নি। প্রভার বিয়ে হয় অপূর্ব নামের আরেক অভিনেতার সাথে।

প্রভাকে অনেক বিশ্বাস করত অপূর্ব। কেননা সে আশ্বস্ত করেছিল, রাজিবের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব ছিল কেবল। কোনো অন্তরঙ্গ সম্পর্ক ছিল না। কিন্তু অপূর্বের সে বিশ্বাসে ফাটল ধরে একটি ভিডিয়োর মাধ্যমে। এরপর আরও কয়েকটি ভিডিয়ো প্রকাশ পায়। রাজিব-প্রভার ব্যভিচারের দৃশ্যগুলো একে একে সামনে আসতে থাকে। দীর্ঘ পাঁচ মাস বিচ্ছিন্ন থাকার পর অপূর্ব-প্রভার ছাড়াছাড়ি হয়।[৫৪]

আমি চাই না, তোমার অবস্থাও ওদের মতো হোক। কিয়ামতের দিন তুমি ব্যভিচারীর কাতারে দাঁড়াও, এটা কোনোভাবেই কাম্য না। তাই ছেলেবন্ধুর প্রথম সাক্ষাতেই সতর্ক হও। নমনীয়তা প্রদর্শন করার মতো ভুলটি দ্বিতীয়বার করবে না। এরপরও সে যদি বিরত না হয়, তবে অন্যায়ের বিরোধিতা করো মুখ দিয়ে। পারলে নিজের পা থেকে জুতা খুলে মারো। দেখবে, ও আর তোমার দিকে চোখ তুলে তাকানোর সাহস করবে না।

---

[৫৩] মানবজমিন, ২০ এপ্রিল, ২০২০।

[৫৪] দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন, ৯ই অক্টোবর ২০১০ ইং শনিবার এবং ২০ই ফেব্রুয়ারি ২০১১ ইং রবিবার।

বোন আমার, অর্থ-বিত্ত-যশ-খ্যাতি যতকিছুই থাকুক না কেন, হারাম-পথে পা বাড়ালে জীবন কিছুতেই স্বার্থক হয় না। শূন্যতার হাহাকার নিয়ে বাকি জীবনটা কাতরানো ছাড়া আর কোনো পথ খোলা থাকে না। প্রেম প্রেম খেলা কখনোই সফলতা এনে দিতে পারে না। কেবল লাঞ্ছনাই এনে দেয়। কত প্রভা যে জীনভর এর খেসারত দিয়ে যায়, তার ইয়ত্তা নেই।

বিয়ে-নামক পবিত্র বন্ধন ছাড়াই সালমান মুক্তাদিরের স্ত্রীর ভূমিকা পালন করে যাচ্ছিল জেসিয়া। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নিজেদের ঢলাঢলির ছবিও আপলোড দিত বিনা সংকোচে। ওদের একান্ত মুহূর্তের ভিডিয়োও নাকি অনলাইনে ভাইরাল হয়। এর পরেও থেমে যায়নি উশৃঙ্খল জীবন। বাইরে বাইরে বেশ মাস্তিতেই কাটছিল ওদের সময়। কিন্তু থলের বিড়ালটা তখন বেরিয়ে আসে, যখন সালমানের গেইটে ভাঙচুর করে জেসিয়া। দীর্ঘদিন ধরে জেসিয়াকে রক্ষিতা হিসেবে ব্যবহার করার পর, উচ্ছিষ্টের মতন ছুড়ে ফেলে দেয় মুক্তাদির। রাগে-ক্ষোভে সালমানের গেই..টে হানা দেয় সে। কিন্তু জেসিয়ার যা হারানোর ছিল, তা তো হারিয়ে গেছে। দুনিয়ার কোনো শক্তিই সেটা ফিরিয়ে দিতে পারবে না।

আসলে রক্ষিতাকে কেউ বিয়ে করতে চায় না। এমনকি খোদ প্রতারণাকারীও না। অল্প সময় মাস্তি করার জন্যে পুরুষরা পতিতার কাছে যায়। কিন্তু পতিতাকে জীবনসঙ্গী বানায় না। বিয়ের সময় চিরুনি-অভিযান চালিয়ে ঠিকই ভদ্রনারী খুঁজে বের করে। পুরুষ কখনোই চায় না, কোনো পতিতা তার ঘরের রানি হোক। কোনো ব্যভিচারীও চায় না, তার সন্তান কোনো ব্যভিচারীর গর্ভে জন্ম নিক। সালমান মুক্তাদিরের কুকীর্তি চোখে আঙুল দিয়ে সেটা দেখিয়ে দেয়। প্রভার সাথে রাজিবের আচরণ এর জ্বলন্ত উদাহরণ।

ইদানীংকালে গার্লফ্রেন্ডের সাথেই বিবির মতো সখ্যতা গড়ে তুলতে পারে ছেলেরা। মেয়েবন্ধুদের কাছ থেকেই স্ত্রীর অভাব পূরণ করার সুযোগ পায়। তাই সহজে বিয়ে করতে চায় না কেউ। বিয়ের বাজারে যেন মন্দা পড়ে গেছে। অনেক সম্রান্ত ঘরেই বিবাহযোগ্যা কন্যা আছে। অথচ তারা ভালো স্বামী খুঁজে পাচ্ছে না। জেসিয়ারাই এর জন্যে। দায়ী প্রভার মতো দুনিয়াপূজারিরা। এরা না থাকলে যৌনতার বাজারটা এতখানি রমরমা হতো না। ২ টাকার শ্যাম্পু বিক্রির জন্যে নারীদের অর্ধনগ্ন ছবি প্রচার করার সাহস পেত না মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিগুলো।

বোন আমার, তুমি কেন এসব নষ্টামোর বিরুদ্ধে সোচ্চার হও না? তুমি তো নারীজাতিরই একজন। নারীদের মনের ভাষা আমার চাইতেও ভালো করে বোঝো তুমি। তবে নিজ-জাতিকে কেন এসব ফিতনা থেকে সতর্ক করবে না? কেন জাহিলিয়াত থেকে ওদেরকে বাঁচানোর জন্যে পদক্ষেপ নেবে না?

আসলে তোমার মধ্যেও দুর্বলতা আছে। তোমার হৃদয়পটেও প্রেমতরঙ্গ আছড়ে পড়ছে। ডায়ারিটাও ভরে যাচ্ছে প্রণয়কবিতা দিয়ে—

তোমার লাগিয়া গাঁথিয়াছি সখা কুসুমকলির মালা

সাজায়েছি ফুলের ডালা

গগনশিরীষের পরতে পরতে, শিউলি ফুলের ঘ্রাণে

কী মধুর সুর আনে

মোর মন নাহি মানে

প্রভাতে তুলি সকরুণ সুর আপনি আপন মনে

পিয়াল তরুর বনে

কেহ নাহি তা জানে

আর যদি না আসো সখা, না দাও পরানে দোলা

করো মোরে অবহেলা

কেমন করে কাটিবে তবে আমার বিরহের বেলা?

এগুলো কী প্রমাণ করে? প্রেমের মনমাতানো-হাওয়া তোমার ওপর দিয়ে বয়ে যায়নি? সে হাওয়ায় নিজেকে ভাসিয়ে দাওনি? পত্রপল্লব রাঙিয়ে নাওনি বাসন্তী প্রণয়সাজে? আল্লাহকে ভয় করো। তোমার রূপ-লাবণ্যের মাত্রাতিরিক্ত প্রদর্শনীর জন্যেই যুবকরা এত উতলা হয়। চারপাশে সারাক্ষণ ঘুরঘুর করে। দিনদিন তোমার পোশাকের ধরনটাও পাল্টে যাচ্ছে। ধীরে ধীরে ফিরফিরে পাতলা জামাকাপড়ের দিকে এগোচ্ছ তুমি। গায়ে জামা থাকার পরও তোমার দৈহিক গঠন বোঝা যায়। বখাটে ছেলেগুলো বাঁকাচোখে তাকানোর সুযোগ পায়। অশ্লীল মন্তব্য করে তোমার অঙ্গভঙ্গি নিয়ে।

তুমি নিজের সৌন্দর্য পরপুরুষের সামনে কেন মেলে ধরো?

দেহসুষমা কি রাস্তায় দেখিয়ে বেড়ানোর মতো তুচ্ছ জিনিস?

টোকাইকে যৌন-উদ্দীপ্ত করার জন্যে কি আল্লাহ তোমায় রূপ-লাবণ্য দিয়েছেন?

কিসের জন্যি এতটা উম্মাদ হয়ে গেলে?

বোন আমার, যৌবন আর সৌন্দর্যের বাহাদুরি চিরদিন করা যায় না। হার মেনে নিতে হয় বার্ধক্যের কাছে। টসটসে চামড়াগুলো একসময় কুঁচকে যায়। যৌনতার আকর্ষণও ম্লান হয়ে যায়। শত উদ্দীপনাও তাকে আর উদ্দীপ্ত করতে পারে না। কিন্তু এই সত্যিটা সব সময় পাশ কাটিয়ে যাও তুমি।

মেয়েদের চিন্তার জগৎ এখন নারীবাদীরা নিয়ন্ত্রণ করে। ওদের মুখ্য এজেন্ডাই হলো যৌনতার বিস্তার ঘটানো। ওরা মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে তোমার ভাষায়। আদতে ওরা তোমার কাছের কেউ নয়। মন-মগজের দিকে দিয়ে তারা পশ্চিমাদের আজ্ঞাবহ দাস, অশ্লীলতা ছড়ানো ছাড়া যাদের আর কোনো কাজ নেই। ওরা তোমাদের যৌনযুদ্ধে নামিয়ে দিচ্ছে। নুডিস্টদের সংস্কৃতি সাজিয়ে-গুজিয়ে এনে দিচ্ছে দোরগোড়ায়। কোমলমতী নারীদের এগিয়ে দিচ্ছে লুলোপ পুরুষের বাহুডোরে।

আধুনিকতার মুখোশ পরে তুমিও ওসব নষ্টামোকে সায় দিয়ে যাচ্ছ। খ্যাতির নেশা তোমাকে অনেক নিচে নামিয়ে দিয়েছে। আঁটসাঁট পোশাক পরার পরও তোমার দিলটা একবারও কাঁপছে না। বাব-মা'র ধমক খেয়ে মাঝে মধ্যে বোধহয় হিজাব নাম দিয়ে একটা পট্টি মাথায় জড়াও। তোমার পট্টি কেবল দেহের আকর্ষণই বৃদ্ধি করে। ওই হিজাবের ওপর আরেকটা হিজাব পরা জরুরি।

আচ্ছা, পশু-পাখিকে ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করেছ তুমি?

সিংহের দিকে তাকাও। কেশরযুক্ত সুদর্শন গঠন চোখে ভেসে উঠবে। মোরগের দিকে নজর দাও। লম্বা ঝুঁটি আর রঙ-বেরঙের পালকজড়ানো নাদুসনুদুস একটা শরীর দেখতে পাবে। পশুপাখির মধ্যে পুংলিঙ্গের অধিকারীরাই অত্যধিক সুশ্রী। আকর্ষণীয় গড়নের অধিকারী। কিন্তু মানবজাতির ক্ষেত্রে তা সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকেই সুশ্রী করে সৃষ্টি করেছেন। আকর্ষণীয় রূপ-লাবণ্য দিয়েছেন। মেয়েরা পুরুষদের আকর্ষণ করতে পারে প্রবলভাবে। মায়াজাল পেতে

পুরুষকে নিমিষেই বোকা বানাতে পারে। মেয়েদের আবেগময় স্বভাবের সামনে বীরপুরুষ পর্যন্ত হার স্বীকার করে নেয়।

নারী আর পুরুষ আলাদা আলাদা বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। জন্মগতভাবেই উভয় লিঙ্গ পৃথক পৃথক বৈশিষ্ট্য নিয়ে বেড়ে ওঠে। সভ্যতার দোহাই সমান অধিকারের দিকে আহ্বানকারীরা চরম মিথ্যুক। ওরা মূলত কামুক পুরুষকে নারীদেহের স্বাদ আস্বাদন করার সুযোগ করে দেয়। কিন্তু স্পষ্ট ভাষায় সেটা উপস্থাপন করে না। সমানতার মোড়কে ওরা ওদের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করে নেয়। ইউরোপ থেকে এ মতবাদ যারা আমদানি করেছে, ওরা সকলেই তোমার শত্রু। ইসলাম তাদের আদর্শ নয়। প্যারিস, লন্ডন, বার্লিন ও নিউইয়র্ক থেকে আমদানিকৃত সংস্কৃতিই ওদের কাছে পূজনীয়। ওদের আদর্শ হচ্ছে হলিউডের নর্তকীরা। নারী-পুরুষের সহাবস্থান কখনোই গ্রহণযোগ্য নয়। যুবকের সাথে ওঠাবসা, পার্কে যাওয়া, গালগপ্প করা, গ্রুপ স্টাডি করা—কোনোভাবেই অনুমোদিত নয়। এমনকি ছেলেদের সাথে হ্যান্ডশেইক করার অনুমতিও ইসলাম দেয় না।

আমি যুবকদের সম্বোধন করছি না। আর আমি চাচ্ছিও না তারা আমার কথায় কান দিক। আমি জানি, যুবকদের কেউ কেউ আমার প্রতিবাদ করবে। কেউ বা আমাকে বেকুব ও গর্দভ উপাধি দেবে। কারণ, আমি এমন কিছুর স্বাদ থেকে ওদের বিরত রাখতে চাচ্ছি, যার জন্যে তারা সারাক্ষণ মুখিয়ে থাকে। তাই আমি তোমাকে সতর্ক করছি।

বোন আমার, নিজেকে ইবলীশের শিকার বানিয়ো না। সে তো ভদ্রবেশেই তোমার কাছে উপস্থিত হয়। সমানাধিকারের কলা দেখিয়ে ঘর বের করে আনে। এরপর পাপাচারগুলো সাজিয়েগুছিয়ে উপস্থাপন করে তোমার সামনে। সাবধান! ইবলিসের কসাইখানায় নিজেকে বলির পাঠা হিসেবে পেশ কোরো না। আর শয়তান-পূজারিদের কথায় কান দিয়ো না, যারা স্বাধীনতা-সভ্যতা-প্রগতির নামে দাজ্জালি সংস্কৃতিকে সুশোভিত তোলে। খোঁজ নিয়ে দেখো, ওদের অধিকাংশই পরিবারবিহীন নিঃসঙ্গ অবস্থায় দিন যাপন করে। আর বুড়ো কালে একাকীত্বের বোঝা বয়ে বেড়ায় বৃদ্ধাশ্রমে। ওরা তোমাকেও তেমন অবস্থানে নামাতে চায়।

ওদের ফাঁদে পা দিয়ে একবার যদি ইজ্জত হারিয়ে ফেলো, আর কোনো দিনই তা ফিরে পাবে না। 'সমানাধিকার' তো এমন কোনো বস্তু নয়, যা নারীকে তার

হারানো ইজ্জত ফিরিয়ে দিতে পারে। ছিনিয়ে-নেওয়া সম্মান কখনোই পুনরুদ্ধার করা যায় না। সম্ভ্রম হারিয়ে গৃহের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হলে, কেউই এসে তোমার হাত ধরবে না। বড়জোর পত্রিকায় একটা খবর ছেপে দুঃখ প্রকাশ করবে। হয়তো বা মার্কেট ধরে ধরে রাখার জন্যে একদিন বিকেলে শাহবাগ চত্বরে মানববন্ধন করবে। কিন্তু এসব করে কি ওরা তোমার হারানো-সম্ভ্রব ফিরিয়ে দিতে পারবে? সম্ভ্রমহীনা মেয়েই জানে, কী দুঃসহ স্মৃতি তাকে জীবনভর বয়ে বেড়াতে হয়।

প্রগতিবাদীদের মূল হোতারা বেশিরভাগই পুরুষ। ওরা তোমার সৌন্দর্যের প্রত্যাশী। সৌন্দর্য অবলোকন শেষ হলেই হুড়হুড় কেটে পড়বে। করোনাজনিত মৃতদেহ দেখে লোকেরা যেমন দৌড়ে পালায়, ঠিক তেমন করে। ক্ষণস্থায়ী সুখের স্বাদ আস্বাদন করিয়ে ওরা তোমার থেকে চিরস্থায়ী সুখ কেড়ে নিতে চায়। দাজ্জালের অনুসারী বানিয়ে নারীদের ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেওয়াটাই ওদের মূল এজেন্ডা। সেই সর্বনাশা বিপদ থেকে তোমায় সতর্ক করছি। এখনো সময় আছে, সাবধান হও।[৫৫]

[৫৫] প্রবন্ধটি লেখার জন্যে শাইখ আলি তানতাভির "হে আমার মেয়ে" পুস্তিকাটির সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

সেই সে বিভাবরী

রাতটি সেজেছিল এক অপরূপ সাজে। এমন সাজ সে কখনোই নেয়নি। আনন্দের লহরি ছড়িয়ে গিয়েছিল রাতটির আকাশে বাতাসে। সে রাতে ছিল না মরুভূমির উত্তাপের আনাগোনা। চারিদিকে ছিল কেবল নব-আনন্দের হিল্লোল। প্রশান্তির বাতাস বয়ে যাচ্ছিল আপন-মনে। সেই বাতাসে প্রাণভরে নিশ্বাস নিচ্ছিল নিশিথিনী। অপলক নয়নে সে অপেক্ষা করছিল এক নতুন ভোরের জন্যে।

আরও অনেক রাত হাজিগণ রাত্রিযাপন করেছেন 'মিনা' প্রান্তরে। তাঁবু খাঁটিয়ে ইবাদত বন্দেগি করেছেন। কিন্তু আজ এক অবিস্মরণীয় ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে একদল হাজিদের দ্বারাই। ইতোপূর্বে যা কখনো ঘটেনি। ধরণির সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষটি যে নুসরতের অপেক্ষায় ছিলেন, সেইটিই বাস্তবায়ন হতে যাচ্ছে এই নিশিথিনীর কোলে। একদল ঈমানদীপ্ত প্রাণ আনুগত্যের শপথ নিতে যাচ্ছে নবিজির হাতে। নিশীথনিবিড়ের মাঝে ঘটতে যাচ্ছে এক অভূতপূর্ব ঘটনা। এক নবযাত্রার সূচনা হবে এরই হাত ধরে। রাতটির অন্ধকার সাক্ষী হয়ে থাকবে সেই শুভক্ষণের।

এই রাতটির জন্যেই অপেক্ষা করছিল অত্যাচারে অতিষ্ঠ একদল অসহায় মানুষ। আল্লাহকে রব হিসেবে মেনে নেওয়াটাই ছিল যাঁদের একমাত্র গর্হিত অপরাধ। আর এই অপরাধের কারণেই দিনের-পর-দিন কুরাইশদের অত্যাচারের স্টিম রুলারের নিচে পিস্ট হতে হয়েছে তাঁদের। নরপশুদের শত লাঞ্ছনা গঞ্জনা মুখ

বুজে সয়ে নিতে হয়েছে। তাঁদেরই কাউকে মরুভূমির উত্তপ্ত বালুতে শুইয়ে রাখা হয়েছে। কাউকে আগুনের ফুলকিতে ছ্যাঁক দেওয়া হয়েছে। কাউকে আবার রক্তাক্ত করা হয়েছে গণপিটুনি দিয়ে। এই মানুষগুলো মুখিয়ে ছিল রাতটির জন্যে।

শ্রান্তির বেলা শেষে   শান্তির বাহ বেশে

আসিল সেই সে বিভাবরী

যাহার ব্যপদেশে   অবিচল অনিমেষে

চলিল সাধন যুগ-জুড়ি

বাহাত্তর-জন পুরুষ এগিয়ে এলেন সেই রাতে। তাঁরা সবাই হজের উদ্দেশ্যে মদীনা থেকে এসেছিলেন এইখানে। আর আল্লাহ তাআলা নিজ দয়ায় হিদায়াতের সরোবরে অবগাহন করিয়েছিলেন তাঁদের। যার জন্যে তাঁরা নবিজির কাছে ইসলামের বাইয়াত নিয়েছিলেন। এই বাইয়াতের নাম হলো 'বাইয়াতে আকাবা'।

একে একে সব পুরুষের বাইয়াত যখন শেষ হলো, তখন এগিয়ে এলেন দুজন নারী। তাঁরাও এই মুবারক কাফেলায় শামিল হলেন। আল্লাহ তাআলা এই দুজন মহীয়সীকে বাছাই করেছিলেন তাঁর দ্বীনের জন্যে। তাঁদের মধ্যে একজনের নাম ছিল নুসাইবা رضي الله عنها। পুরো নাম উম্মু উমরা নুসাইবা বিনতু কা'ব মাযিনিয়া। উম্মু উমরা নামেই তিনি ইতিহাসখ্যাত। আমাদের আলোচনা এই মহীয়সীকে নিয়েই।[৫৬]

সেই বাইয়াতের পর কেটে গেল অনেক সময়। নবি ﷺ মদীনায় হিজরত করলেন। ন্যায় ও ইনসাফ কায়েম করলেন মদীনাজুড়ে। মুসলিমরা প্রাণভরে নিশ্বাস নেওয়ার একটা জায়গা পেল। এই দৃশ্য দেখে, কুরাইশদের অন্তর্জ্বালা যেন বাড়তেই লাগল। মদীনার বিরুদ্ধে ওরা যুদ্ধের সিদ্ধান্ত নিল। বদরের ময়দানে তুমুল লড়াই হলো উভয়পক্ষের মধ্যে। শোচনীয় পরাজয় মেনে নিয়ে লেজ গুঁটিয়ে পালাল কুরাইশরা। পরাজয়ের গ্লানি সইতে না পেরে উহুদ-প্রান্তরে ওরা আবারও মুসলিমদের সাথে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হলো।

উম্মু উমরা رضي الله عنها শরিক হয়েছিলেন এই যুদ্ধে। তিনি পানি পান করাচ্ছিলেন

[৫৬] মিশরি, মুহাম্মাদ মাহমুদ, মহীয়সী নারী সাহাবিদের আলোকিত জীবন, পৃষ্ঠা : ৩৫৭-৩৭২; পাশা, আবদুর রহমান রাফাত, নারী সাহাবিদের ঈমানদীপ্ত জীবন, পৃষ্ঠা : ৫৫-৬৫।

আল্লাহর রাস্তায় লড়াইকারী সৈনিকদের। পাশাপাশি যুদ্ধাহত সেনাদের চিকিৎসা-সেবা দিচ্ছিলেন। ক্ষতস্থানে বেঁধে দিচ্ছিলেন ব্যান্ডেজ।

লড়াই চলছিল বীর-বীক্রমে। পর্যদুস্ত হচ্ছিল কুফফার বাহিনী। কিন্তু হঠাৎ মোড় ঘুরে গেল যুদ্ধের। মুসলিম-বাহিনীর একটি ভুলের কারণে কাফিররা আক্রমণ করার সুযোগ পেল। গিরিপথ ধরে ঝাঁপিয়ে পড়ল মুসলিমদের ওপর। বিক্ষিপ্ত হয়ে গেলেন সাহাবিরা। এদিক-ওদিক ছুটোছুটি করতে লাগলেন। সুযোগ বুঝে নবি ﷺ-এর কাছাকাছি চলে এল কাফির যোদ্ধারা। একের-পর-এক তির নিক্ষেপ করলে লাগল। পাথর দিয়ে অনবরত আঘাত করতে থাকল নবিজির ওপর। মাত্র দশজনের মতো সাহাবি তখন নবিজিকে ঘিরে রেখেছিলেন। মানববর্ম রচনা করে সুরক্ষা দিচ্ছিলেন প্রাণপ্রিয় নবিকে।

এই নাজুক পরিস্থিতি দেখে উম্মু উমরা ﵁ আর দূরে থাকতে পারলেন না। পানির পাত্র ছুড়ে ফেলে দিলেন হাত থেকে। ময়দানের দিকে ছুটে গেলে পবনবেগে। নিজেকে অবতীর্ণ করলেন এক বীরসেনানীর ভূমিকায়। যদিও তাঁর হাতে উল্লেখযোগ্য কোনো সমরাস্ত্র ছিল না, তবুও বিচলিত হলেন না। নিজের সবটুকুন শক্তি দিয়ে নবিজিকে সুরক্ষা দিতে লাগলেন।

কোনো ঢাল ছিল না নুসাইবার হাতে। সামনেই একজন মুসলিম-সেনা দৌড়ে পালাচ্ছিল ময়দান থেকে। তার কাছে ঢাল ছিল। নবি ﷺ ওই সৈন্যকে লক্ষ্য করে বললেন, 'ওহে যুবক, তোমার ঢালটি এমন কাউকে দিয়ে যাও, যে কিনা লড়াই করছে।'

এই কথা শুনে লোকটি ঢাল ফেলে দিল। নুসাইবা ﵁ সেটা তুলে এনে আক্রমণ ঠেকাতে লাগলেন। শত্রুদের তিরবৃষ্টির বিপরীতে ঠাঁয় দাঁড়িয়ে রইলেন নির্ভিক সৈনিকের মতো। নিজের বুক পেতে নবিজির ওপর আক্রমণ প্রতিহত করতে লাগলেন। কাফিরদের আঘাতে তাঁর শরীরে একের-পর-এক ক্ষত তৈরি হতে লাগল। এমনই কঠিন মুহূর্তে কাফির নেতা ইবনু কামিআ এগোতে লাগল নবিজির দিকে। তিনি ও মুসআব ইবনু উমাইর ওর মোকাবিলায় এগিয়ে গেলেন। ইবনু কামিআর আঘাতে শহীদ হলেন মুসআব ﵁। ইবনু কামিআ এরপর এগিয়ে গেল নুসাইবার দিকে। নুসাইবা তাকে আঘাত করলেন। কিন্তু শয়তানটার গায়ে দুই দুইটা বর্ম ছিল। তাই ওকে পরাস্ত করতে পারলেন না তিনি। উল্টো ইবনু কামিআর আঘাতে মারাত্মক আহত হলেন নুসাইবা। তবুও লড়াই চালিয়ে গেলেন।

ওদিকে তাঁর পুত্র আবদুল্লাহও লড়াই করে যাচ্ছিলেন প্রাণপণে। নবিজি ﷺ তাঁকে বললেন, 'তোমার মাকে দেখো, তোমার মা আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে।'

ছেলে দৌড়ে গেলেন। নবিজি তাঁদের জন্যে কল্যাণের দুআ করতে লাগলেন। দুআ শুনে উম্মু উমরা বললেন, 'আল্লাহর রাসূল, আমি জান্নাতে আপনার সাথি হতে চাই।'

নবিজি ﷺ বললেন, 'তুমি জান্নাতে আমার সাথি হবে।'

এমন সময় তাঁর ছেলের ওপর এক মুশিরক আক্রমণ করে বসল। সেই আঘাতে তার বাহু দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। রক্ত বেরোতে থাকল ফিনকি দিয়ে। এই দৃশ্য দেখে মমতাময়ী মা দ্রুত ছুটে গেলেন সন্তানের কাছে। ব্যান্ডেজ বেঁধে দিলেন ছেলের হাতে। মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, 'বাবা, ওঠো। এগিয়ে যাও সামনের দিকে। যতক্ষণ দেহে প্রাণ আছে, ততক্ষণ যেন এই লড়াই থেকে ক্লান্ত না হও তুমি।'

নবি ﷺ তখন বললেন, 'উম্মু উমরা, তুমি যা করতে পারলে, তা আর কেই বা করতে পারবে?'

উম্মু উমরা رضي الله عنها জবাব দিলেন, 'এই-যে দুনিয়াবি কষ্ট ও বিপদ আমার ওপর এসেছে, তাতে কোনো পরোয়া নেই। আমি আল্লাহর ফয়সালার ওপর সন্তুষ্ট আছি।'

এমন সময় ওই কাফিরটি এগিয়ে আসতে লাগল, যে কিনা উম্মু উমরার সন্তানকে আঘাত করেছিল। ওকে আসতে দেখে নবিজি বললেন, 'উম্মু উমরা, এই দেখো, এ-ই তোমার ছেলের ঘাতক।'

উম্মু উমরা رضي الله عنها দৌড়ে ওই কাফিরটার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। তলোয়ার দিয়ে আঘাত করলেন ঘাতকের পায়ে। অমনিই লোকটি ধপাস করে পড়ে গেল। তলোয়ারের উপর্যুপরি আঘাতে ওকে জাহান্নামে পাঠিয়ে দিলেন তিনি। এই দৃশ্য দেখে নবি ﷺ মুচকি হেসে বললেন, 'তুমি তো ওর কাছ থেকে দণ্ডবিধি আদায় করে ফেললে।'

উম্মু উমরা এভাবেই বীরের বেশে লড়াই করেছেন উহুদে। যুদ্ধে শেষ হওয়া অবধি ময়দানে থেকেছেন। নবিজিকে সুরক্ষা দিয়েছেন তলোয়ার উঁচিয়ে।

সয়েছেন শত্রুপক্ষের বারোটি আঘাত। উহুদেই থেমে যাননি উম্মু উমরা। পাড়ি দিয়েছেন অনেক দীর্ঘ পথ। হাজির হয়েছেন হুদায়বিয়াতে, খাইবারে, হুনাইনে। যেমন ছিল তাঁর সাহস, তেমন ছিল তাঁর ধৈর্য। এতক্ষণ তাঁর সাহসিকতার কথা বলেছি। এইবার তাঁর ধৈর্যের বিষয়টা বলব তোমায়।

নবি ﷺ-এর জীবদ্দশাতেই একজন মিথ্যুক নিজেকে নবি দাবি করেছিল। ওর নাম ছিল মুসাইলামা। দিনদিন ওর দৌরাত্ম্য বেড়েই চলছিল। অনেক মানুষের ওপর প্রভাব বিস্তার করেছিল সে। বৃদ্ধি পাচ্ছিল ওর অনুসারীর সংখ্যা। একদিন সে একটি পত্র পাঠাল নবি ﷺ-এর কাছে। জবাবি-পত্র পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন নবিজি। পত্রবাহক হিসেবে নির্বাচিত হলেন হাবীব ইবনু যাইদ। তিনি ছিলেন উম্মু উমরার সন্তান।

নবি ﷺ-এর পত্র নিয়ে তিনি ছুটলেন ভণ্ড মুসাইলামার কাছে। পত্রপাঠের পর-পরই বিদ্বেষে ফেটে পড়ল মুসাইলামা। আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন করে দূত হত্যার সিদ্ধান্ত নিল সে। তার নির্দেশেই পত্রবাহক হাবীবকে শেকলে আবদ্ধ করা হলো।

পরদিন হাবীবকে হাজির করা হয় মুসাইলামার সভায়। হাবীবকে সে জিজ্ঞেস করে, 'তুমি কি সাক্ষ্য দাও, মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল?'

হাবীব বললেন, 'হ্যাঁ, আমি তা সাক্ষ্য দিই।'

মুসাইলামা বলল, 'তুমি স্বীকার করে নাও যে, আমিও আল্লাহর রাসূল।'

হাবীব তখন মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বললেন, 'তোমার কোনো কথাই আমার কান অবধি পৌঁছোচ্ছে না।'

এই কথা শোনামাত্রই রাগে ক্ষোভে মুসাইলামার চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল। সে হাবীবের ডান হাত কেটে ফেলার নির্দেশ দিল। জল্লাদ তার ডান হাত কেটে নিল। এরপরও যখন হাবীবকে বাগে আনতে পারল না, তখন বাম হাত কেটে ফেলার হুকুম দিল। এরপর পা, এরপর জিহ্বা... আস্তে আস্তে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল হাবীব।

হাবীবের মৃত্যুসংবাদ পৌঁছে গেল তাঁর মা নুসাইবার কাছে। ছেলের এই অবস্থার কথা শুনে ঘাবড়ে যাননি তিনি। বঙ্গদেশীয় মহিলাদের মতো বিলাপ শুরু করে

দেননি। বরং বলতে থাকেন, 'আল্লাহ তাআলায় ফয়সালায় আমি সন্তুষ্ট আছি। আমি তো এমনই আত্মত্যাগের জন্যে ওকে বড় করেছিলাম। শৈশবে আকাবায় হাবীব যে শপথ নিয়েছিল, আজ সে তা বাস্তবায়ন করল। তবে আল্লাহ্ যদি মুসাইলামার ওপর আমায় ক্ষমতায় দেন, তবে আমি ওকে শায়েস্তা করব।'

নুসাইবা যে দিনটির জন্যে অপেক্ষা করছিলেন, তার আগমন খুব বেশি বিলম্বিত হলো না। আবু বকর ﷺ-এর শাসনামলে মুসাইলিমার বিরুদ্ধে আবার যুদ্ধ শুরু হলো। মুসলিম-বাহিনী এগিয়ে গেল সে যুদ্ধের উদ্দেশ্যে। নুসাইবাও শামিল ছিলেন সে বাহিনীতে। যুদ্ধ শুরু হলে, শত্রুবাহিনীর ব্যূহ্ ভেদ করে তিনি পৌঁছে যান মুসাইলামার কাছে। এ পর্যন্ত পৌঁছোনোর জন্যে অনেক খেসারত দিতে হয় তাঁকে। দেহের এগারোটি জায়গা প্রতিপক্ষের আঘাতে মারাত্মকভাবে জর্জরিত হয়। একটি হাত বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় দেহ থেকে। তবুও পিছপা হননি তিনি। সোজা পৌঁছে যান মুসায়ালামার কাছে। এরপর তলোয়ার দিয়ে ওকে আঘাত করেন। মুসলিম-যোদ্ধা ওয়াহশীও আঘাত করেন মুসাইলামাকে। দুজনের সম্মিলিত আক্রমণে নিহত হয় মুসাইলামা। যুদ্ধে তাঁর এই বিরোচিত ভূমিকা দেখে অবাক হন সেনাপতি খালিদ ইবনু ওয়ালিদ।

মহীয়সী এই নারী বেঁচে ছিলেন উমর ﷺ-এর শাসনামল পর্যন্ত। এরপর তিনি আল্লাহর কাছে চলে যান। মৃত্যুর সময় তির, তলোয়ার ও বল্লমের আঘাতে জর্জরিত ছিল তাঁর পুরো শরীর।

উমর ﷺ-এর সময়েই মুসলিমরা জেরুসালেম বিজয় করে। ইহুদিরা আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মসমর্পণ করে খলিফা উমরের কাছে। আর আর্চবিশপ সোফনিয়স উমরের হাতে গির্জার চাবি হস্তান্তর করেন। খ্রিস্টানদের ধর্মবিশ্বাস অনুযায়ী ওই গির্জার পাশেই পুনরুজ্জীবিত হয়েছিলেন যিশুখ্রিস্ট। বিশপের দেওয়া সেই চাবি উমর ﷺ তুলে দেন উবাদা ইবনু সামিত ﷺ-এর হাতে। তিনি ছিলেন জেরুসালেমের গভর্নর। উবাদার আরেকটি পরিচয় হলো, তিনি নুসাইবা ﷺ-এর বংশধর। নুসাইবা ﷺ-এর বংশধরেরা এখনো ওই গির্জার চাবির দায়িত্বে আছেন। বর্তমানে এই দায়িত্ব পালন করছেন ওয়াজিহ নুসাইবা ও তার ছেলে।

সুবহানাল্লাহ! এ তো একজন নারী। তোমাদের অভিধান যাকে 'অবলা' বলে, সেই নারী। সেই নারীর বীরত্বগাথা শোনাচ্ছি। ঈমানিশক্তিতে বলীয়ান এই নারী

নিজের জীবনকে তুচ্ছ মনে করেছিলেন যুদ্ধের ময়দানে। নবি ﷺ-এর সুরক্ষার জন্যে কাফিরদের সামনে দাঁড়িয়েছিলেন খোলা তলোয়ার হাতে। অনেক পুরুষও যখন ভীত হয়ে ময়দান ছেড়ে পালাচ্ছিল, সেই মুহূর্তেও এই নারী বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছিলেন অনিমেষনেত্রে। যখন ডান দিক থেকে কাফিররা এগিয়ে আসছিল নবিজির দিকে, তখন উম্মু উমরা ডান দিকে ছুটে যাচ্ছিলেন। বাম দিক থেকে কোনো ঘাতককে তলোয়ার উঁচিয়ে আসতে দেখে তিনি দৌড়োচ্ছিলেন বাম দিকে। নবি ﷺ তাঁর ব্যাপারে বলছিলেন, 'আমি যখন ডান দিকে তাকাচ্ছিলাম, তখন দেখলাম—উম্মু উমরা আমায় সুরক্ষা দিচ্ছে। যখন বাম দিকে তাকালাম, তখনো দেখলাম উম্মু উমরা আমায় সুরক্ষা দিচ্ছে।'

জীবন যায়, যাক; শত্রুবাহিনী মেরে ফেলতে চায়, ফেলুক। সমস্যা নেই কোনো। তবে আমি জীবিত থাকতে যদি নবিজির কিছু হয়, তবে আল্লাহর কাছে কী জবাব দেব?—উম্মু উমরা ﷺ এই মনোভাবেই বিশ্বাসী ছিলেন। উম্মু উমরার এই বীরোচিত পদক্ষেপ যেন সা'দ ইবনু মুআযের সেই ঘোষণা স্মরণ করিয়ে দেয়, যখন তিনি বলছিলেন—'ওহে আনসাররা, তোমাদের চোখে পলক ফেলার শক্তি থাকা সত্ত্বেও যদি নবিজির কিছু হয়, তবে আল্লাহর সামনে বলার মতো তোমাদের কোনো অজুহাত থাকবে না।'

উম্মু উমরা ﷺ কোনো অজুহাত দেখাননি। তিনি বলেননি যে, আমার দুই সন্তান ও স্বামী তো লড়াই করছেই। আমি নাহয় একটু সেইফ জোনে থাকলাম। আর আমি তো নারী। আমি কি সম্মুখ সমরে লড়াই করতে পারব যোদ্ধাদের সাথে?—এই ধরনের কোনো চিন্তা খেলা করেনি উম্মু উমরার মনে। 'যে করেই হোক, নবিজির সুরক্ষায় ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে'—এ নীতিতেই বিশ্বাসী ছিলেন তিনি। তাই তো বিপদ মাথায় নিয়েও হিম্মত হারাননি। ভয়ে জড়সড় হয়ে পালিয়ে যাননি ময়দান থেকে। বাইয়াতে আকাবায় নবিজির সাথে যে ওয়াদা করেছিলেন, সেইটা অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়ন করেছেন তিনি।

বোন আমার, তুমিও তো নবিজির সাথে ওয়াদা করেছ। মুসলিম-পরিচয় ধারণ করার মাধ্যমে নবিজির দেখানো-পথ অনুসরণ করার শপথ নিয়েছ। কিন্তু সে ওয়াদার কতখানি বাস্তবায়ন করেছ, বলতে পারো?

আমি যদি এখন বলি, নবি ﷺ তোমায় পর্দার বিধান মেনে চলার নির্দেশ দিয়েছেন, সেইটা মানতে প্রস্তুত হবে তুমি?

মনে হয় না। এখনই হয়তো মুখটা ঘুরিয়ে নেবে। বাকি কথাগুলোও আর শুনতে চাইবে না।

কোথায় তুমি আর কোথায় উম্মু উমরা ﵂! উম্মু উমরা নবিজির জন্যে জীবন দিয়ে দিচ্ছেন, আর তুমি সামান্য একটা বিধানও অনুসরণ করার সাহস করতে পারছ না। উম্মু উমরা তো সম্মুখ সমরে শত্রুপক্ষের সাথে লড়াই করেছেন, আর তুমি সামান্য শয়তানি ওয়াসওয়াসার বিরুদ্ধে লড়তে পারছ না? নারীবাদীদের পাতা ফাঁদকে ছিন্নভিন্ন করতে পারছ না? হায়! কত পার্থক তোমাদের দুজনার মধ্যে। একজন নবিজির সাথে জান্নাতে থাকবে চিরকাল। আরেকজন? কোথায় ঠাঁই হবে তোমার?

ক্যাটরিনার সাথে থাকতে চাও পরপারে? নাকি অ্যাঞ্জেলিনা জেলির সাথে?

নুসাইবারা দ্বীনের জন্যে যুদ্ধ করে আহত হয়, আর তুমি?

তুমি তো দেহপ্রদর্শনীর যুদ্ধে প্রতিনয়ত আহত হও কুদৃষ্টির বিষাক্ত তির দ্বারা। রাস্তার কুলিমজুর থেকে নিয়ে অফিসের বস পর্যন্ত তোমার দিকে যৌনতার বল্লম নিক্ষেপ করে। তোমার দেহে অদৃশ্য যৌনক্ষত তৈরি করে কামনার সূচালো তির দিয়ে। তুমি টেরও পাও না। প্রতিনিয়ত তোমার দেহে যে পরিমাণ যৌনাকাঙ্ক্ষার অদৃশ্য আঘাত আসে, তা হিসেব করেও শেষ করা যাবে না। নুসাইবার দেহে যুদ্ধের যতগুলো ক্ষত সৃষ্টি হয়েছে, তার প্রত্যেকটি থেকেই মিশকের গন্ধ বেরোবে কিয়ামতের দিন। আর তোমার ক্ষত থেকে এমন বিচ্ছিরি দুর্গন্ধ আসবে যে, মানুষের টিকে থাকাটাই কঠিন হয়ে যাবে।

আমি জানি না, আর কবে তুমি বুঝতে শিখবে। ঠিক কবে তোমার হুঁশ ফিরে আসবে। বোধকরি, তুমিও সেটা জানো না। কারণ তুমি তো উন্মাদ। পাশ্চাত্যের কাছে নিজের আত্মাভিমান সব বিকিয়ে দিয়ে, আধুনিকতার পঙ্কিল-সাগরে সূর্যস্নানে ব্যস্ত তুমি। ভাবলেশহীন এমন উন্মত্ত অবস্থায় তোমাকে বোঝানোর সাধ্যি কার আছে, বলো!

মৃত্যুকে তুমি সুন্দর করিয়াছ!

তুমি একদিন আমাকে কিছু প্রশ্ন করেছিলে মেইলে। ইসলাম নারীকে ঠকিয়েছে বা এই ধরনের কিছু একটা। ঠিকঠাক মনে নেই আমার। তবে ইসলাম নারীকে যে অধিকার দিয়েছে, ওইটাকে মধ্যযুগীয় বর্বরতার সাথে মেলানোর চেষ্টা করেছিলে বোধহয়। তোমার মেইল পেয়েও রিপ্লে দিইনি। আমি আসলে গাইরে মাহরামদের সম্পূর্ণরূপে এড়িয়ে চলি। তাই উত্তরটা দেওয়া হয়নি। অবশ্য মেইলে উত্তর দেওয়ার মতো ছোট্ট প্রশ্নও ওটা না। এর জন্যে বিস্তর আলোচনা প্রয়োজন। আমার যতটুকু মনে পড়ে, তোমার প্রশ্নটা ছিল—'ইসলাম পুরুষকে হাত উজাড় করে দিয়েছে, আর নারীকে,দিয়েছে করুণার মালা। এটা না দেওয়ারই শামিল।'

প্রশ্নের উত্তর দেবার আগে তিনটি ভিন্ন ভিন্ন স্থানের ইতিহাস বলব—জাহিলি আরবের, তৎকালীন ভারতবর্ষের ও পশ্চিমাসমাজের। আমাদের প্রিয় নবি ﷺ যেহেতু আরবে এসেছেন, তাই ওখান থেকেই শুরু করি চলো।

জাজিরাতুল আরবে ইসলাম পৌঁছোনোর আগের সময়টাকে 'জাহিলিয়াত' বলা হয়। দীর্ঘদিন ধরে এই অঞ্চলে কোনো আসমানি কিতাব আসেনি। আসেনি কোনো নবি। তাই অজ্ঞতার অন্ধকারে ছেয়ে গিয়েছিল পুরো সমাজ। ওই সময়টাতে মেয়েদের কোনো দাম ছিল না। মেয়েদেরকে মনে করা হতো অপয়া, অশুচি। এমনকি কন্যাসন্তান জন্মের খবর পাওয়ার সাথে সাথেই পিতারা লজ্জায় ঘৃণায়

মুখ লুকিয়ে ফেলত। ক্রোধ সৃষ্টি হতো ওদের মনে। অনেকেই কন্যাকে জীবিত অবস্থায় কবর দিত।[৫৭] কাইস ইবনু আসিম একে একে দশটি জীবন্ত কন্যাকে কবর দিয়েছিল। আরবের কোনো গোত্রই এই অপরাধ থেকে মুক্ত ছিল না।[৫৮] কুরআন এই ঘটনার বর্ণনা দিয়ে গিয়ে বলেছে :

> "যখন এদের কাউকে কন্যাসন্তান জন্মের সুখবর দেওয়া হয়, তখন তার চেহারা কালো হয়ে যায় এবং সে ভেতরে ভেতরে গুমরে মরতে থাকে। লোকদের থেকে লুকিয়ে ফিরতে থাকে। কারণ এ দুঃসংবাদের পর সে লোকদের মুখ দেখাবে কেমন করে! সে ভাবতে থাকে—অবমাননার সাথে মেয়েকে রেখে দেবে, নাকি মাটিতে পুঁতে ফেলবে!"[৫৯]

জাহিলি যুগে রক্ষিতা রাখা দোষের কিছু ছিল না। পুরুষদের অসংখ্য রক্ষিতা থাকত। ব্যভিচার ছড়িয়ে গিয়েছিল পুরো সমাজে। দশ জন পুরুষ পালাক্রমে একজন মহিলার সাথে ব্যভিচার করত। কিন্তু ওই নারী টুঁ শব্দটিও করতে পারত না। অনেক স্বামীই তার স্ত্রীকে পাঠিয়ে দিত সম্ভ্রান্ত কারও বিছানায়। পরপুরুষের দ্বারা স্ত্রী গর্ভবতী না হওয়া অবধি সে স্ত্রীর সাথে সহবাস করত না।[৬০] সহোদর বোনকে একসাথে বিয়ে করত তারা। এমনকি সন্তান বিয়ে করত সৎমাকে। পুরুষের একচ্ছত্র অধিকার ছিল তালাকের ওপর। পুরুষরা যাকে খুশি বিয়ে করত, মনোমতো তালাক দিত। নারীরা কোনোরূপ আপত্তি তুলতে পারত না। এমনকি বিচারও চাইতে পারত না। সম্পত্তিতে নারী-অধিকারের অধ্যায়টা চিরদিনের জন্যে মুছে ফেলা হয়েছিল। দাসীদের অবস্থা তো আরও শোচনীয় ছিল। ন্যূনতম কোনো অধিকারও জুটেনি ওদের কপালে। কেবল পুরুষের মনোরঞ্জন করাই ওদের মুখ্য দায়িত্ব ছিল।[৬১]

আরবের দুর্দশা দেখে একথা ভেবো না, ভারতবর্ষের নারীরা বেশ সুখে দিন কাটাচ্ছিল। হিন্দু অধ্যুষিত ভারতের অবস্থা তো আরও শোচনীয়। বেদপাঠ থেকে নিয়ে পুজো অবধি—কোথাও স্থান পেত না ব্রাহ্মণ নারী। ব্রাহ্মণ বালকের

---

[৫৭] সাইয়িদ কুতুব শহীদ, তাফসীর ফী যিলালিল কুরআন, ১২/১০৬-১০৮।

[৫৮] নজিবাদি, আকবর শাহ খান, ইসলামের ইতিহাস, ১/৬৮।

[৫৯] সূরা আন-নাহল : ৫৮-৫৯ আয়াত।

[৬০] বুখারি, মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাইল, আস-সহীহ, অধ্যায় : বিয়ে, ৮/৪৭৫১;

[৬১] মুবারকপুরি, শফিউর রহমান, আর রাহীকুল মাখতুম, পৃষ্ঠা : ৬০-৬৪; Edward Gibbon, The Decline and fail of the Roman Empire, 2/50; Robert Spencer, The Truth About Muhammad, p.34.

জীবনে 'উপনয়ন' নামে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় ছিল, কিন্তু নারীদের জীবনে এই অধ্যায়টি ছিল মৃত। তাই বেদ পড়তে পারত না নারী। কোনো কিছু উৎসর্গ করার সুযোগ পেত না পুজোয়। আর নিম্নবর্ণের হিন্দুদের তো কোনো অধিকারই ছিল না সমাজে। ব্রাহ্মণদের পোষা কুকুর যে অধিকার পেত, নিম্নবর্ণের হিন্দুরা তার কানাকড়িও পেত না।

ওদের ধর্মগ্রন্থ থেকে জানা যায়, ভগবান আপন মুখ থেকে ব্রাহ্মণকে, হাত থেকে কায়স্থকে, উরু থেকে বৈশ্যকে এবং পা থেকে শূদ্রকে সৃষ্টি করেছেন।[৬২] তাই শূদ্রদের তুলনা করা হয় শুকরের সাথে।[৬৩] শূদ্রের মেয়েকে যদি কোনো ব্রাহ্মন তার পালঙ্কে বসায়, তবে সে নরকে যাবে।[৬৪] এমনকি কেউ যদি শূদ্রকে ধর্মীয় শিক্ষা দেয়, ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়ার সুযোগ করে দেয়, তবে সেও শূদ্রের সাথে নরকে জ্বলবে।[৬৫] কোনো শূদ্র যদি স্বেচ্ছায় বেদের বাণী শোনে, তা হলে গলানো রাং ঢেলে দিতে হবে তার কানে। যদি সে পড়ে, তো তার জিহ্বা কেটে দিতে হবে। আর যদি সে বেদ মুখস্থ করে, তবে তার দেহ টুকরো টুকরো করে ফেলতে হবে।[৬৬] শূদ্রদের একমাত্র কাজ হলো ব্রাহ্মণদের সেবা করা।[৬৭] এর বাইরে গিয়ে কোনো পেশায় জড়িত হওয়ার অধিকার তার নেই। কারণ, সে গোলাম। আর গোলামের দায়িত্ব হলো মনিবের তাবেদারি করা।[৬৮]

দক্ষিণ ভারতের শূদ্র নারীরা বুকের ওপর কোনো কাপড় রাখতে পারত না। পদ্মনাভ মন্দিরের পুরোহিতরা বলত, শূদ্র নারীদের স্তন ঢেকে রাখা শাস্ত্রবিরোধী কাজ। তাই শূদ্র নারীদের বুক খোলা থাকত সব সময়। কেউ বুক ঢেকে রাখতে চাইলে কর দিতে হতো। এটিই মূলত স্তন-কর। স্থানীয় ভাষায় একে বলা হতো 'মুলাকরম'। স্তনের আকার অনুযায়ী কর কমবেশি হতো। যাদের স্তন ছোট তাদের কর কম। আর যাদের বড়, তাদের বেশি। এই কর পুরোটাই চলে যেত ব্রাহ্মণ ও তাদের সহচরদের পেটে। এই ঘৃণ্য প্রথা প্রচলিত ছিল উনিশ শতকের দক্ষিণ ভারতে।

---

[৬২] ঋগবেদ, ১০:৯:১২, ভগবত পুরান, ২ : ৫-৩৭।
[৬৩] মনুসংহিতা, ১২ : ৪৩।
[৬৪] মনুসংহিতা, ৩ : ১৭।
[৬৫] মনুসংহিতা, ৪ : ৮১।
[৬৬] মনুসংহিতা, ১২ : ৪-৬।
[৬৭] মনুসংহিতা, ১০ : ১২৩।
[৬৮] মনুসংহিতা, ১০ : ১২৯।

কুমারীত্ব ছিল হিন্দুদের জন্যে অভিশাপ। ঋষি কুণির কন্যা সুভ্রু চিরকুমারী ছিল। মৃত্যুক্ষণ ঘনিয়ে এলে সে জানতে পারে, তার জন্যে স্বর্গের দ্বার বন্ধ। কারণ সে অবিবাহিতা। এটা শুনে ওই মুমূর্ষু অবস্থাতেই বিয়ের পিঁড়িতে বসে সুভ্রু। এক বৃদ্ধ ঋষির সাথে বিয়ে হয় তার। হিন্দু ধর্মবিদদের একাংশের মতে—কুমারী কেউ মারা গেলে, তার লাশকেও বিয়ে দিতে হবে। তবেই সে স্বর্গে যাওয়ার অনুমতি পাবে। এ ছাড়া স্বর্গপ্রাপ্তি অসম্ভব।[৬৯] কোনো নারীর স্বামী মারা গেলে, সে পুনরায় বিয়ে করতে পারত না। স্বামীর মৃত্যুর পর তাকে হতে হতো নিরামিষভোজী। সাদা কাপড় পরে মিতাহার করে করে দেহক্ষয় করতে হতো। বিয়ের কথা সে মুখেও আনতে পারত না। পরপুরুষের নাম মুখে নিলে পরজন্মে শিয়ালের যোনি দিয়ে পৃথিবীতে আসার ভয় দেখানো হতো।[৭০]

পুরুষ জীবিত থাকাবস্থায় নিজের অর্জিত অর্থের মালিকানা পেত না নারী। সম্পত্তিতে ছিল না কোনো অধিকার। পিতা বিয়েতে যা দিতেন, ওতেই শেষ। এর বাইরে চাওয়ার কিছু ছিল না। স্বামীর সম্পত্তিতে দেশের রাজা পর্যন্ত উত্তরাধিকার পেত। কিন্তু ঘোড়ার ডিম ছাড়া আর কিছুই জুটত না বিধবাদের কপালে।[৭১] উত্তরাধিকার হিসেবে স্বামীর চিতায় জ্যান্ত কাবাব হওয়ার সুযোগ পেত কেবল। এই ঘৃণিত প্রথার নাম ছিল 'সতীদাহ'। নারীর সতীত্বের পরীক্ষা ছিল এইটি।

৭০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে সতীদাহ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে হিন্দুসমাজে। স্বামী যেন পরলোকে পাপ থেকে মুক্তি পায়, তারই অংশ হিসেবে বিধবাকে জ্বলতে হতো আগুনে। সতীদাহবাদীরা বলত, "স্বামী মরিলে পর যে স্ত্রী এ পতির জ্বলন্ত চিতাতে আরোহণ করে সে অরুন্ধতী যে বশিষ্ঠের পত্নী তাঁহার সমান হইয়া স্বর্গে যায়। আর যে স্ত্রী ভর্তার সহিত পরলোক গমন করে সে মনুষ্যের দেহেতে যত লোম আছে যাহার সংখ্যা সাড়ে তিন কোটি তত বৎসর স্বর্গে বাস করে।"[৭২]

উত্তর ভারতে এ প্রথা ছড়িয়েছিল দাবানলের মতন। রানিরা, রক্ষিতারা দলে দলে রাজাদের চিতায় ওঠে সতীদাহের চাকা সচল রেখেছিল। মারওয়ারের রাজা অজিত সিংহের চিতায় উঠেছিল ৬৪জন নারী। রাজা বুধ সিং পানিতে ডুবে মারা

[৬৯] Altekar, A S, Position of Women in Hindu Civilization, p. 33
[৭০] মনুসংহিতা, ৫:১৫৭, ৫:১৬৪, ৫:১৬৮, ৮:৪১৬।
[৭১] Altekar, A S, Position of Women in Hindu Civilization, p.250-270
[৭২] রামমোহন রায়, সহমরণ বিষয়ক প্রবর্তক ও নিবর্তকের সম্বাদ, পৃষ্ঠা : ৩-৪।

গেলে তার চিতায় ওঠে ৮৪জন নারী। ১৬২০ খ্রিস্টাব্দে এক রাজপুত্রের চিতায় উঠেছিল ৭০০ সতী। ১৮১৫-১৮২৮ সালে সতীদাহের কারণে আত্মাহুতি দেয় ৮১৩৫ জন নারী।[৭৩] চিতার আগুনে আরোহণ করাকে 'বীরত্ব' আখ্যা দিয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখেন,

> "বস্তুত দল বাঁধিয়া মরা সহজ। একাকিনী চিতাগ্নিতে আরোহণ করিবার মতো বীরত্ব যুদ্ধক্ষেত্রে বিরল। বাংলার সেই প্রাণবিসর্জ্জনপরায়ণা পিতামহীকে আজ আমরা প্রণাম করি।... হে আর্য্যে... তুমি যেমন দিবাবসানে সংসারের কাজ শেষ করিয়া নিঃশব্দে পতির পালঙ্কে আরোহণ করিতে,—দাম্পত্যলীলার অবসানদিনে সংসারের কার্য্যক্ষেত্র হইতে বিদায় লইয়া তেমনি সহজে বধূবেশে সীমন্তে মঙ্গলসিন্দূর পরিয়া পতির চিতায় আরোহণ করিয়াছ। মৃত্যুকে তুমি সুন্দর করিয়াছ, শুভ করিয়াছ, পবিত্র করিয়াছ—চিতাকে তুমি বিবাহশয্যার ন্যায় আনন্দময়, কল্যাণময় করিয়াছ। বাংলাদেশের পাবক তোমারই পবিত্র জীবনাহুতিদ্বারা পূত হইয়াছে—আজ হইতে এই কথা আমরা স্মরণ করিব।"[৭৪]

এবার চলো, একটু পাশ্চাত্যের দিকে নজর দিই। হাজার হোক, ওদের কাছ থেকে তুমি নারী-অধিকারের তালিম নাও। ওদের অতীত ইতিহাস জানাটা তো আরও বেশি জরুরি।

কন্যাসন্তান জন্ম দেওয়াটা ওদের কাছে লোকসানের ব্যাপার হিসেবে গণ্য হতো।[৭৫] ওদের ধর্মগ্রন্থ বলে বেড়াচ্ছিল, স্বর্গের প্রথম বিধানটি লঙ্ঘন করেছিল একজন নারী।[৭৬] শয়তান প্রথম নারীকেই ধোঁকায় ফেলেছিল। পাপের সূচনা হয় নারীর হাত ধরেই।[৭৭] একে বলা হয় 'আদিপাপ'। এর সম্পূর্ণ দায় নারীর। এই পাপের কারণেই ঈশ্বর নারীজাতিকে অভিশাপ দেন। যার ফলে নারীরা যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে সন্তান প্রসব করে।[৭৮] ওই পাপের জন্যেই ঈশ্বর নারীদের

[৭৩] হুমায়ুন আজাদ, নারী, পৃষ্ঠা : ৭৬।

[৭৪] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিচিত্র প্রবন্ধ, মা ভৈঃ, পৃষ্ঠা : ৬৮-৬৯।

[৭৫] Ecclesiasticus 22:3

[৭৬] She gave me some fruit from the tree and I ate it. [Genesis 3:12]

[৭৭] And Adam was not one deceived; it was the woman who was deceived and became a sinner. [1 timothy 2:14]

[৭৮] I will greatly increase your pains in child-bearing; with pain you will give birth to

কামনা-বাসনা সব পুরুষের অধীন করে দেন।[৭৯] বিয়ের পর স্ত্রীর ধন-সম্পদ স্বামীর অধিকারভুক্ত বলে গণ্য হয়। এ বিধানের কারণে স্ত্রী সম্পত্তির অধিকার হারায়। সেবাদাসী হিসেবে বিবেচিত হয় সমাজে।[৮০]

নারীশিক্ষার কঠোর বিরোধী ছিলেন ধর্মগুরুরা। সেন্ট পল বলতেন, আমি মেয়েদের শিক্ষকতা কিংবা পুরুষের ওপর কর্তৃত্বের অনুমতি দিই না। কেননা, আদম নয়, হাওয়া-ই ধোঁকা খেয়ে পাপের ভাগী হয়েছে।[৮১] ৮ম হেনরী মেয়েদের বাইবেল পড়তে নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। ইহুদি পণ্ডিত R. Eliezer তো আর-একটু এগিয়ে বলেন, যে তার কন্যাকে তাওরাত শেখায়, সে যেন অশ্লীলতা শেখাল।[৮২]

ঋতুমতী নারীকে ভয়ংকর চোখে দেখত ওরা। বাইবেলের ভাষায়—ঋতুমতী কোনো বিছায়া শয়ন করলে সেটা অশুচি হয়ে যাবে। কেউ যদি ঋতুমতী নারীকে স্পর্শ করে, সন্ধ্যা পর্যন্ত সে অশুচি থাকবে। কেউ তার শয্যা স্পর্শ করলে, তাকে জামাকাপড় ধুয়ে গোসল করতে হবে। আর ঋতুর রক্ত যদি কোনো পুরুষের গায়ে লাগে, তবে সে সাতদিন পর্যন্ত সে অশুচি থাকবে।[৮৩]

নারীদের যে 'মন' বলে কিছু আছে, পাশ্চাত্য সেটা স্বীকারই করত না। গ্রিসে নারীর অবস্থা ছিল আরও শোচনীয়। সপ্তদশ শতাব্দীতে রোম নগরীর Council of the wise এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, নারীর কোনো আত্মা নেই। ৫৮৭ সালে ফ্রান্সের সভাদষগণ মহিলাদের ব্যাপারে এই মত প্রকাশ করে—whether a women could truly be considered a human being or not.

নারীদের মর্যাদা চরমভাবে ভুলণ্ঠিত হয় সভ্যতার দাবিদার ইংল্যান্ডে। মধ্যযুগের ক্যাথলিক চার্চের গুরুগণ মহিলাদের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক মনে করত। ১৯৬৪ সালের আগে অক্সফোর্ড এবং ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ছেলে-মেয়ের সমান অধিকার ছিল না। ১৮৫০ সালের আগে ইংল্যান্ডের নারীরা নাগরিক

---

children. [Genesis 3:16]

[৭৯] Your desires will be for your husbands and he will rule over you.

[৮০] Women in Judaism: The Status Of Women In Formative Judaism, Leonard J. Swidler 1976

[৮১] 1 Timothy 2: 11-14

[৮২] Babylonian Talmud: Tractate Sotah, Folio 20a

[৮৩] Leviticus 15: 19-23

হিসেবে গণ্য হতো না। এমনকি ১৮৮২ সালের আগ পর্যন্ত ইংলিশ মহিলাদের ব্যক্তিগত অধিকার বলে কিছু ছিল না।[৮৪]

তালাক দেওয়ার ক্ষেত্রে নারীদের কোনো অধিকার ছিল না। ছিল না সম্পত্তির অধিকার। সামাজিক কোনো কাজেই নারীর মতামত নেওয়া হতো না। ওদের কাছে নারী ছিল চতুষ্পদ জন্তুর মতো। Iron Maiden বানিয়ে নারীদের খুঁচিয়ে মারা, Breast Ripper দিয়ে স্তন ছিন্নভিন্ন করে ফেলা কিংবা Heretic's Fork লাগিয়ে গলা এফোঁড়-ওফোঁড় করাটা তো ওদের কাছে ডালভাতের মতো ছিল। ১৪০০ থেকে ১৭০০ অব্দের মধ্যে ওরা ডাইনি নাম দিয়ে পুড়িয়ে মারে পাঁচ লাখ অসহায় নারীকে।[৮৫] কাজটি সম্পূর্ণরূপে পরিচালিত হয় চার্চের তত্ত্বাবধানে। পাদরিরা এর পক্ষে ফতুয়া জারি করে। "Women are always ready for sex...and they need no preparation for it," অস্টিয়ার বিশপদের থেকে এই ধরনের ফতুয়াও শোনা যায়।[৮৬]

পৃষ্ঠার-পর-পৃষ্ঠা লেখা যাবে এসব নিয়ে। এগুলো হলো মধ্যযুগের কাণ্ডকারখানা, যা পশুদেরকেও হার মানিয়েছিল। এসব বর্বরতাই চলছিল পাশ্চাত্য ও ভারতবর্ষজুড়ে। এগুলোকে মধ্যযুগীয় বর্বরতা না বলে, কেন ইসলামের ওপর মিথ্যের কালিমা লেপন করতে চাও? ওদের পাশবিকতাকে ইসলামের পর্দা দিয়ে আড়াল করার মতো মহান দায়িত্ব পালনে কে বাধ্য করেছে তোমায়? এত ক্ষোভ কেন ইসলামের ওপর?

ইসলামের কোন বিধানটা বর্বর মনে হয়েছে তোমার কাছে?

মানুষ হিসেবে নারীকে মর্যাদা ও অধিকার দেওয়া হয়েছে, এইটাকে?

মধ্যযুগে যে এলাকাগুলোতে ইসলামের বার্তা পৌঁছোয়নি, ওখানে নারীরা

---

[৮৪] Vivian C. Fox, Historical Perspectives on Violence Against Women, Journal of International Women's Studies, Volume 4 | Issue 1, Nov-2002, p.5

[৮৫] The European Witch Craze of the 14th to 17th Centuries: A Sociologist's Perspective, Nachman Ben-Yehuda, American Journal of Sociology, Vol. 86, No. 1 (Jul., 1980), pp. 1-31

[https://www.jstor.org/stable/2778849?seq=1#page_scan_tab_contents]

[৮৬] James A. Brundage, Law, Sex, and Christian Society in Medieval Europe (Chicago, 1987) p.427.

পশু হিসেবে বিবেচিত হতো। পুরুষের পাশাপাশি তাদেরও যে অর্থনৈতিক-সামাজিক-রাজনৈতিক অধিকার আছে, তা স্বীকার করত না কেউ। নারী ছিল ভোগের সামগ্রী। পুরুষের বিছানা গরম আর দাসীদের মতো খেদমত করা—এগুলোই ছিল তাদের মুখ্য দায়িত্ব। ইসলাম বিদ্রোহ ঘোষণা করে এসব বর্বর নীতির বিরুদ্ধে। পদে পদে অধিকার দেয় নারীদের। কুরআনে একটা বিশাল অধ্যায়ই স্থান পায় নারী-অধিকার নিয়ে। সূরাটির নাম হলো 'নিসা', মানে 'মহিলা'। এটি শুরুই হয়েছে মানবজাতির অংশ হিসেবে নারীদের মর্যাদার বিবরণ দিয়ে :

> "হে মানবজাতি, তোমাদের রবকে ভয় করো। তিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন একটি প্রাণ থেকে। আর সেই একই প্রাণ থেকে সৃষ্টি করেছেন তার জোড়া। তারপর তাদের দুজনার থেকে সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে দিয়েছেন বহু পুরুষ ও নারী।... নিশ্চিতভাবে জেনে রাখো, আল্লাহ তোমাদের ওপর কড়া নজর রেখেছেন।"[৮৭]

এরপর পর্যায়ক্রমে আরও কিছু নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। বর্ণনা করা হয়েছে নারী অধিকারের ইশতেহার।

- এতিমদের ব্যাপারে সুবিচার।[৮৮]
- লাগামহীন বিয়ে সীমিতকরণ।[৮৯]
- ইনসাফ নিশ্চিত করতে পারলে সর্বোচ্চ চার বিয়ে। আর সংশয় থাকলে একটি। এর বাইরে যাওয়ার রাস্তা চিরতরে বন্ধ।[৯০]
- স্ত্রীর সিকিউরিটি মানি হিসেবে স্বামীকে মোহরানা দিতে হবে। নিতে হবে ভরণপোষণের পূর্ণ দায়িত্ব।[৯১]
- সম্পত্তিতে নারীরা অধিকার পাবে।[৯২]
- নারীর ওপর ব্যভিচারের দোষ আরোপ করতে চাইলে চারজন সাক্ষী

---

[৮৭] সূরা নিসা, ৪ : ০১।
[৮৮] সূরা নিসা, ৪ : ০৩।
[৮৯] সূরা নিসা, ৪ : ০৩।
[৯০] সূরা নিসা, ৪ : ০৩।
[৯১] সূরা নিসা, ৪ : ০৪-০৫
[৯২] সূরা নিসা, ৪ : ১১-১২।

আনতে হবে। মুখের কথায় কাউকে দোষী সাব্যস্ত করা যাবে না।[১৩]

- নারী মৃতব্যক্তির সম্পত্তি নয়। তাকে জোর করে বিয়ে করা বা টাকার বিনিময়ে অন্যত্র বিয়ে দেওয়া যাবে না। বিধবা তো দূরের কথা, কোনো নারীর সম্পত্তিই আত্মসাৎ করা যাবে না। এটা হারাম।[১৪]

এটা তো গেল সামান্য নমুনা। পর্যায়ক্রমে আরও অনেক বিধান বর্ণিত হয়েছে কুরআনে ও হাদীসে। ইউরোপে যখন নারীদের কুকুরের সাথে তুলনা করে বলে হচ্ছে—"A spaniel, a woman and a walnut tree, The more they're beaten, the better they be", ঠিক সেই সময়টাতে ইসলাম বলে দিচ্ছে—কেউ যদি তার মেয়েদের আদর দিয়ে, ভালোবেসে বড় করে তোলে, তো কিয়ামতের দিন সে মহানবির কাছাকাছি থাকবে।[১৫] ঋতুমতী নারীরা যখন অপয়া হিসেবে লাঞ্ছিত হচ্ছে ক্যাথলিক সমাজে, সেই সময়টাতেই ঋতুমতী স্ত্রীর সাথে একই বিছানায় ঘুমাচ্ছে ইসলামের স্বামীরা।[১৬] নারীদের মত প্রকাশের সব পথ যখন বন্ধ করে রেখেছে ওরা, তখন উম্মু সালমা-র পরামর্শ গৃহীত হচ্ছে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে।[১৭] মসজিদে দাঁড়িয়ে খলিফা উমর ﷺ-এর ভুল সংশোধন করে দিচ্ছে একজন নারী।

Elizabeth Freke দুঃখ-কষ্টে জর্জরিত হয়ে যখন তার ডায়ারিতে লিখছিল, "My dear husband, borrowed of me but not without some force and cruelty"[১৮], সেই মুহূর্তে একজন কুমারী নবি ﷺ-এর কাছে এসে নালিশ জানিয়ে বলছে, বিয়েতে তার অনুমতি নেওয়া হয়নি। আর সে বিয়ে বাতিল হয়ে যাচ্ছে।[১৯]

ভারতবর্ষের বিধবারা যখন স্বামীর চিতায় আত্মাহুতি দিচ্ছে, তখন আমাদের বিধবারা পিতা-স্বামী-সন্তান এমনকি নাতির সম্পত্তিতে অধিকার ভোগ করছে।

[১৩] সূরা নিসা, ৪ : ১৫-১৮।
[১৪] সূরা নিসা, ৪ : ১৯-২১।
[১৫] মুসলিম, আবুল হোসাইন ইবনুল হাজ্জাজ, আস-সহীহ, হাদীস : ২৬৩১; নাবাবি, মুহিউদ্দীন ইয়াহইয়া ইবনু আশরাফ, রিয়াদুস সালিহীন, ১/২৭২।
[১৬] বুখারি, আস-সহীহ, ১/২৯৪; মুসলিম, আস-সহীহ, ২/৫৮১, আহমাদ ইবনু হাম্বল, আল-মুসনাদ, ১/৩২৬, ইবনু মাজাহ, আস-সুনান, ১/৬৩৭।
[১৭] বুখারি, আস-সহীহ, অধ্যায় : শর্তাবলী, হাদীস : ২৭৩১-২৭৩২।
[১৮] Vivian C. Fox, Historical Perspectives on Violence Against Women, Journal of International Women's Studies, Volume 4 | Issue 1, Nov-2002, p.8
[১৯] বুখারি, মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল, আস-সহীহ, ১০/৬৯৪৮।

পাচ্ছে পুনরায় বিয়ের অধিকার। কুমারী নারীরা যখন ব্রাহ্মণদের লালসার শিকার হচ্ছে, ইউরোপের নারীরা হয়ে যাচ্ছে সেবাদাসী, তখন ইসলাম ঘোষণা দিচ্ছে—তোমরা স্ত্রীদের সাথে উত্তম আচরণ করো।[১০০] ওদের কষ্ট দিয়ো না।[১০১] স্ত্রীকে ভালোবাসো। ওর মুখে খাবার তুলে দাও। বিনিময়ে সদাকার সওয়াব পাবে।[১০২] জেনে নাও, ওই লোকই উত্তম যে কিনা তার স্ত্রীর কাছে উত্তম।[১০৩]

তাওরাত, বেদ, গীতা ছোঁয়া যে সময়টাতে নিষিদ্ধ ছিল নারীদের জন্যে, তখন রাষ্ট্রীয়ভাবে নারীদের দ্বীন শেখানোর ব্যবস্থা করছিল ইসলাম। একটি দিন নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল মহিলাদের দ্বীনি তালিমের জন্যে।[১০৪] এমনকি দাসীদেরকেও সতীত্ব রক্ষার ব্যবস্থা করে দিয়েছিল।[১০৫] ওদেরকেও শিক্ষিত করে তোলার আদেশ দিয়েছিল।[১০৬] ফলে, দাসীদের মধ্যেও অনেক জ্ঞানীগুণীর আবির্ভাব ঘটতে লাগল পর্যায়ক্রমে। ৩য় আবদুর রহমান ও তার ছেলে হাকামের ব্যক্তিগত সচিব ছিল লুবনা নামের এক দাসী। গণিতে বেশ দক্ষ ছিল সে। ৫ লক্ষ বইয়ের রাজকীয় গ্রন্থাগারের দায়িত্ব তার ওপরেই ন্যাস্ত ছিল।[১০৭]

রোমান সাম্রাজ্য যখন সেন্ট পলের ফতোয়া[১০৮] জারি করে নারীশিক্ষা নিষিদ্ধ করে রেখেছে, তখন মদীনার মসজিদে উম্মুল খাইর ফাতিমা, দামিশকের বনু উমাইয়া মসজিদে আয়িশা বিনতু আবদুল হাদী, কায়রোর মসজিদে সিত্তুল উযারা বিনতু উমর 'বুখারি' পড়াচ্ছেন। জামিয়া আল-মুযাফফরিতে 'তাবারানি' পড়াচ্ছেন যাইনাব বিনতু কামাল। নিজ বাসায় ক্লাস নিচ্ছেন ফাতিমা বিনতু আলি, উম্মুল ফাখস জুমুআ, যাইবান বিনতু আলাম-সহ অনেকেই। আল-

---

[১০০] সূরা নিসা, ৪ : ১৯ আয়াত।

[১০১] আলবানি, মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন, আদাবুয যিফাক, পৃষ্ঠা : ১৫৯-১৬০; সহীহ সুনানুত তিরমিযি, হাদীস : ১১৬৩।

[১০২] বুখারি, আস-সহীহ, ১/৫৪।

[১০৩] নাববি, রিয়াদুস সালিহীন, ১/২৮৩; আলবানি, আদাবুয যিফাক, পৃষ্ঠা : ১৫৮; আলবানি, সিলসিলাতুল সহীহা, হাদীস : ২৮৪।

[১০৪] বুখারি, আস-সহীহ, ১/১০২।

[১০৫] সূরা আন-নূর, ২৪ : ৩৩ আয়াত।

[১০৬] "যার নিকট কোনো দাসী আছে এবং সে তাকে শিক্ষা দান করে, ভালোভাবে সুশিক্ষার ব্যবস্থা করে, ভদ্রতা ও শালীনতা শিক্ষা দেয়, এবং মর্যাদা দান করে, তার জন্যে রয়েছে দ্বিগুণ প্রতিদান।" (বুখারি, আস-সহীহ, হাদীস : ৯৭)

[১০৭] Ibn Bashkuwal, Kitab al-Sila (Cairo, 2008), Vol. 2: 324.

[১০৮] "I don't permit a woman to teach or have authority over a man... And Adam was not the one deceived, it was the woman who deceived and became a sinner."(1 Timothy 2: 11-14)

মিযযী, ইবনু তাইমিয়্যা, যাহাবি-সহ অনেক বিখ্যাত ইমাম পড়াশোনা করছেন যাইনাব বিনতু মাক্কী-র কাছে।[১০৯]

কেবলমাত্র নারী হওয়ার অপরাধে ব্রাহ্মণ নারীরা যখন পুজোর মন্ত্র পড়তে পারছিল না, বেদ স্পর্শ করার অপরাধে যখন শাস্তি পাচ্ছিল নিম্নবর্ণের হিন্দুরা, তখন মসজিদ থেকে নিয়ে পবিত্র কা'বা শরিফ পর্যন্ত নারীদের বিচরণ ছিল।[১১০] কৃফার মুসলিম নারীরা কুরআনের কপি লিখে যাচ্ছিল আপন-মনে। এথেকে উপার্জিত অর্থ দিয়ে মুক্ত করা হচ্ছিল মুসলিম বন্দিদের।[১১১] ইউরোপের কোর্টে সাক্ষী দেওয়া যখন পুরোপুরি নিষিদ্ধ নারীদের জন্যে, তখন ইসলামের মেয়েরা সাক্ষী দিচ্ছিল বিচারকের সামনে।[১১২] ২০ শতাব্দী পর্যন্ত যখন পাদরিরা বলছিল, নারীদের কোনো অন্তর নেই। সেখানে ইসলাম হাজার বছর আগেই বলে দিয়েছিল, নারী ও পুরুষ উভয়ের আত্মা আছে। এবং দুজনেই তাদের কৃতকর্মের জন্যে সমানভাবে দায়ী।[১১৩]

বুক ঢাকার জন্যে যখন কর দিতে হচ্ছে উত্তর ভারতের শূদ্র নারীদের, তখন মুসলিম রমণীরা আপাদমস্তক ঢেকে রাখছে স্বাধীনভাবে। ঈমানদার তো দূরের কথা, কোনো লম্পট পর্যন্ত তাদের দিকে তাকানোর আগে শ বার ভাবছে। স্মরণ করো বনু কায়নুকার সেই বিখ্যাত ইতিহাস। একজন মুসলিম নারীর ইজ্জতের ওপর হামলা চালিয়েছিল এক লম্পট ইহুদী। ওই বোনের সম্মান রক্ষা করবার জন্যে, সাথে সাথেই অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছিল এক মুসলিম তরুণ।[১১৪]

বোন আমার, তুমি মধ্যযুগীয় বর্বরতা কাকে বলছ? না জেনে, না পড়ে, না বুঝে, ইসলামের ওপর আঙুল তুলছ? তুমি না শিক্ষিত, অনেক থিসিস না পড়া হয়েছে তোমার, প্রতিদিনই তো মেসেঞ্জারে একটিভ দেখা যায় তোমাকে। অনলাইনে একটু পড়াশোনা করে দেখো না, বর্বরতা কোথায় আছে! পাশ্চাত্যের শেখানো মেয়াদোত্তীর্ণ বুলি কতবার শোনাবে? আর কতদিন ওদের সুরে সুর মিলিয়ে কথা বলবে?

---

[১০৯] বিস্তারিত জানার জন্যে শাইখ আকরাম নদভি-র Al-Muhadditha‌t বইটা পড়া যেতে পারে।

[১১০] সূরা আলি ইমরান, ০৩ : ৯৭ আয়াত।

[১১১] মুজাহিদুল ইসলাম, ইসলামি সভ্যতায় নকলনবিশির কথকতা; ফাতেহ২৪ সাপ্তাহিকী, ১৮ জানুয়ারি ২০২০।

[১১২] সূরা বাকারাহ, ০২ : ২৮২ আয়াত।

[১১৩] সূরা নিসা, ০৪ : ১২৪; সূরা আ ল ইমরান, ০৩ : ১৯৫।

[১১৪] মুবারকপুরি, আর রাহীকুল মাখতুম, পৃষ্ঠা : ২৬২।

তোমার কটূদৃষ্টি কেবল ইসলামের দিকেই তাক করা থাকে। পাশ্চাত্যের নষ্টামোতে বুঁদ হয়ে থাকো তুমি। অথচ পাশ্চাত্যের প্রতিটি দেয়াল থেকে ভেসে আসে অসহায় নারীর আর্তচিৎকার। ওদের বুককাটা কান্নার আওয়াজ শুনে প্রতিটি ইট থরথর করে কাঁপতে থাকে। ওদের গগনবিদারী হাহাকারে ভারী হতে থাকে পশ্চিমের আকাশ বাতাস। কিন্তু সেদিকে তাকানোর কেউ নেই। তাদের নিয়ে বলার কেউ নেই। না কোনো নারীবাদী সংগঠন তাদের দিকে ফিরে তাকাবে, না হিউম্যান রাইটস ওয়াচ। বাহ, কী চমৎকার আচরণ!

পাশ্চাত্যের দেশে দেশে চলছে নারী কেনাবেচা। দরিদ্র দেশ থেকে পাচার হওয়া অসংখ্য নারীকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে অন্ধকার জগতের দিকে। এসব অসহায় নারীদের বেঁচে দেওয়া হচ্ছে পর্ন-ইন্ডাস্ট্রিতে, অভিজাত হোটেলগুলোতে। পুরুষের মনোরঞ্জনের জন্যে এমন কোনো কাজ নেই, যা তাদের করতে বাধ্য করা হচ্ছে না। ওরাল কিংবা এনাল সেক্সের পাশাপাশি নারীদেহে বসিয়ে দেওয়া হচ্ছে খদ্দেরদের বিষাক্ত দাঁতের ছাপ। গনোরিয়া, সিফিলিস থেকে নিয়ে এইডসের কবলে পড়ছে এসব নারী। বুকচাপা বেদনা আর একরাশ হাহাকার নিয়ে নীল জগতের অন্ধ কুঠুরিতে ডুকরে ডুকরে মরছে লক্ষ লক্ষ কিশোরী। খাবলে ছিঁড়ে খাওয়া হচ্ছে ওদের কোমল দেহ। কই, কেউ তো এসব নিয়ে কথা বলে না? বিজ্ঞাপন থেকে শুরু করে রাস্তার বিলবোর্ড অবধি—সবখানেই নারীকে উপস্থাপন করা হচ্ছে ভোগের মাল হিসেবে, এইটা নিয়ে কেউ তো মাথা ঘামায় না। কেন? কেন এই দ্বিমুখী আচরণ?

১৪৫০ বছর আগেই ইসলাম নারীকে যা দিয়েছিল, প্রচলিত কোনো ধর্মগ্রন্থ কি তার ধারেকাছেও ঘেঁষতে পারবে? কিং জেমস ভার্সন, রিভাইসড স্ট্যান্ডার্ড ভার্সন, ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড ভার্সন-সহ বাইবেলের প্রায় শ খানিক সংস্করণ আছে। সবগুলো সামনে নিয়ে বসো। দরকার হলে আরেকটা নতুন সংস্করণ বানিয়ে নাও। রিভাইসড মনুসংহিতা লিখতে বলো পণ্ডিতদের। তন্ন তন্ন করে খুঁজো বেদের প্রতিটি লাইন। ত্রিপিটকের বিধানগুলো ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে পড়ো। দেখো, কিছু পাও কি না। কিয়ামত পর্যন্ত সময় দেওয়া হলো।

বোন আমার, পাশ্চাত্যের দেওয়া চশমাটাকে খুলে ফেলে একবার নিরপেক্ষ মন নিয়ে ভাবো। দুনিয়াজুড়ে নারীরা যখন লাঞ্ছিত-বঞ্চিত-অপমানিত অবস্থায় দিন যাপন করছিল, তখন কিভাবে এই অধিকারের বাণী শোনানো হলো? বিশ্বের

বড় বড় সভ্যতাগুলো যখন উল্টো পথে হাঁটছিল, সেই সময়টাতে কিভাবে ইসলাম নারী-অধিকারের ইশতেহার বাস্তবায়ন করল? যখন সব ধর্মগ্রন্থ নারীদের জীবনকে সংকীর্ণ করে তুলেছিল, তখন কুরআন কিভাবে মসৃণ করে দিল নারীদের চলার পথ?

সমকালীন কোনো সভ্যতা যা কল্পনাতেও আনেনি, ইসলাম সেটাই ধূ-ধূ মরুতে বাস্তবায়ন করে দেখিয়েছে। এটা প্রমাণ করে যে, ইসলাম কোনো কল্পিত আদর্শ নয়। মানবরচিত কোনো জীবনবিধান নয়। এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিল হওয়া সার্বজনীন দ্বীন।

বোন আমার, তোমার ওই কথাগুলো শুনে বেশ কষ্ট পেয়েছিলাম। আমি ঘুণাক্ষরেও ভাবিনি, কোনো মুসলিম মেয়ের মুখ দিয়ে এমন কথা বেরোতে পারে। ইসলাম নারীকে যা দিয়েছেন তা যথেষ্ট নয় যদি এমনটাই ভাবো, তবে মনে রেখো—কোনো বিশ্বাসবারি অবশিষ্ট নেই তোমার হৃদয়নদীতে। যা ছিল, সব শুকিয়ে গেছে। এখন কেবল জাহিলিয়াতের ধুলোবালি ওড়ে বেড়াচ্ছে ওখানে।

কাছে আসার সাহসী গল্প

কোনো এক রাজপুত্রের কাহিনি তোমায় শোনাতে চাচ্ছি। তবে সে রাজপুত্তুরের নাম কী ছিল, তা বলব না। শুধুই তাঁর জীবনী নিয়ে কিছু কথা বলব। তিনি ছিলেন পারস্যের অধিবাসী। পারস্যের ইস্পাহান নগরের জাই গ্রামে বাস করতেন। তাঁর বাবা ছিলেন ওই এলাকার প্রধান জমিদার। বাবার অনেক আদুরে সন্তান ছিলেন তিনি। বাবা তাঁকে এতটাই ভালোবাসতেন যে, এক পলকের জন্যেও চোখের আড়াল হতে দিতেন না। আটকে রাখতেন বাড়িতে। পারিবারিকভাবে তাঁরা ছিলেন অগ্নিপূজারি। তাঁদের গ্রামে বিশাল যে অগ্নিকুণ্ডটি ছিল, সেটির প্রধান রক্ষক ছিলেন তাঁর বাবা। বাবার অবর্তমানে প্রধান রক্ষকের দায়িত্ব দেওয়া হয় তাঁকে। তিনি সে দায়িত্ব পালন করতে থাকেন আপন-মনে।

একবার তাঁর বাবার প্রাসাদের বাইরে কিছু কাজ পড়ে যায়। নিজে যেতে না পেরে তাঁকেই খামারের কাজে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেন বাবা। বাবার আদেশ পেয়ে তিনি বের হলেন খামারের উদ্দেশে।

পথিমধ্যে তিনি এক গির্জার সন্ধান পান। বেশ আগ্রহ নিয়ে উঁকি দেন গির্জার ভেতরে। শুনতে পান প্রার্থনার আওয়াজ। সে আওয়াজ আকৃষ্ট করে তাঁকে। তিনি জিজ্ঞেস করেন, 'এখানে কী হচ্ছে?' তারা বলে, 'এরা খ্রিস্টান। প্রার্থনা করছে।'

ওদের কথা শুনে তিনি গির্জার ভেতরে প্রবেশ করেন। বসে যান সেখানে। উপাসনাকারীদের কাজ-কারবার দেখতে থাকেন। খ্রিস্টানদের প্রার্থনা তাকে এতটাই মুগ্ধ করে যে, কোনদিক দিয়ে সূর্য ডুবে যায়, তা তিনি খেয়ালই করেননি। সেদিন আর খামারে যাওয়া হলো না তাঁর। সন্ধে পর্যন্ত আটকে গেলেন সেখানেই। ততক্ষণে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত বাবা তাঁকে খোঁজার জন্যে লোক পাঠিয়েছেন চতুর্দিকে। সন্ধের কিছুক্ষণ পর তিনি বাসায় ফেরেন। সন্তানকে কাছে পেয়ে তাঁর বাবা জিজ্ঞেস করেন, 'কোথায় ছিলে তুমি? আমি তো তোমার চিন্তায় পাগল হয়ে যাচ্ছিলাম!'

জবাবে তিনি বলেন, 'বাবা, আমি কিছু লোকের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। যাদেরকে খ্রিস্টান বলা হয়। তাদের উপাসনা আমাকে মুগ্ধ করেছে। তারা কিভাবে কী করছে—সেটা দেখার জন্যে ওখানে বসে গিয়েছিলাম।'

ছেলের মুখে এমন কথা শুনে পিতা কিছুটা হকচকিয়ে গেলেন। এরপর বললেন, 'ছেলে আমার, তোমার দ্বীন ওদের দ্বীনের চেয়ে উত্তম।'

তিনি বললেন, 'না। আল্লাহর শপথ! আমাদের দ্বীন তাদের দ্বীনের চেয়ে উত্তম নয়। তারা এমন এক সম্প্রদায়, যারা আল্লাহর গোলামি করে। তাঁকে ডাকে এবং তাঁরই উপাসনা করে। আর আমরা! আমরা তো আগুনের উপাসনা করি। যা আমরা নিজের হাতে জ্বালাই, আর আমরা দেখভাল ছেড়ে দিলে তা নিভে যায়।'

পুত্রের মুখে এ কথা শুনে পিতা যারপরনাই বিস্মিত হলেন। পুত্রকে হারানোর ভয়ে কঠোর পদক্ষেপ নিলেন তিনি। শেকল লাগিয়ে দিলেন ছেলের দু-পায়ে। বন্দি করে রাখলেন বাসায়। বাবার ভয়ে বন্দি জীবনই বেছে নিতে হলো তাঁকে।

কিছুদিন পর বাবার চোখ ফাঁকি দিয়ে খ্রিস্টানদের কাছে একটি লোক পাঠালেন তিনি। উদ্দেশ্য—খ্রিস্টানদের দ্বীনের উৎস সম্পর্কে জানা। তাঁর পাঠানো লোকটি এসে জবাব দিল, 'তাদের দ্বীনের উৎস শামে।' তিনি বললেন, 'শাম থেকে লোক এলে আমাকে জানাবে।'

সিরিয়া, ইরান, ফিলিস্তিন-সহ বিস্তৃত ভূমিকে শাম বলা হয়। এই শামেই রয়েছে আমাদের প্রথম কিবলা বায়তুল মুকাদ্দাস। নবি ﷺ এই শামের জন্যে কল্যাণের দুআ করেছেন বহুবার।

কিছুদিন পর শাম থেকে লোকজন এলে তাঁর কাছে খবরটা পৌঁছোনো হলো। তিনি সুযোগ খুঁজতে থাকলেন শেকল ভেঙে পালিয়ে যাওয়ার। যখন শামের লোকজন তাদের কাজ শেষে ফিরে যাচ্ছিল, তখন তিনি বাবার চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে গেলেন। সফর করতে করতে পৌঁছোলেন শামে।

শামে পৌঁছে তিনি খ্রিস্টধর্ম সম্পর্কে জানার জন্যে ব্যাকুল হয়ে পড়লেন। তাই সফরসঙ্গীদের মধ্য থেকে একজনকে জিজ্ঞেস করলেন, 'খ্রিস্টধর্মের সর্বোত্তম ব্যক্তি কে?' তারা একটি গির্জার দিকে ইঙ্গিত করে বলল, 'এই গির্জাবাসী পাদরি।' তিনি তার কাছে গিয়ে বলেন, 'আমার একান্ত ইচ্ছে—আপনার সাথে এ গির্জায় থেকে আল্লাহর উপাসনা করব। আর আপনার কাছ থেকে উপকারী জ্ঞান শিখব।'

পাদরি রাজি হলেন তাঁর প্রস্তাবে। মানুষ পাদরিকে ভালো লোক হিসেবে জানত। কিন্তু বাস্তবে সে ছিল অত্যন্ত লোভী। তিনি এ অবস্থা থেকে অত্যন্ত মর্মাহত হলেন। ওর প্রতি ঘৃণা জন্মাতে লাগল তাঁর মনে। কিছুদিন পর পাদরি মারা গেলেন। লোকজন ওকে দাফন করতে এল। তিনি বললেন, 'এ তো একটি খারাপ লোক। সে লোকদেরকে দান-খয়রাতের নির্দেশ দিত ঠিক, কিন্তু নিজে তা করত না। সে লোকজনকে ভালো কাজের নির্দেশ দিত, কিন্তু তলে-তলে আবার নিজেই খারাপ কাজ করে বেড়াত। তোমাদের দান-সদাকার টাকাগুলো অভাবীদের না দিয়ে নিজের কাছেই রেখে দিত।'

লোকজন খেপে গেল তাঁর কথায়। তাদের দৃষ্টিতে যিনি মহৎ, তাকে তিনি মন্দ বলবেন—তা কী করে হয়। তাই তো তারা প্রমাণ চাইল। তিনি বললেন, 'আমি তোমাদেরকে তার জমা করা সম্পদ বের করে দেখাচ্ছি।' তিনি পাদরির লুকোনো সাতটি পাত্র বের করে দেখালেন, যেখানে অনেক সোনা-রূপা জমা করা ছিল। লোকজন এ দৃশ্য দেখে তাদের ভুল বুঝতে পারল। দাফন না করে তারা শূলিতে চড়াল পাদরির লাশ। রাগে-ক্ষোভে পাথর নিক্ষেপ শুরু করল লাশের ওপর।

ওই পাদরি মারা যাওয়ার পর আরেকজন পাদরি নিয়োগ দেওয়া হলো। তিনি নতুন পাদরির ভক্ত হয়ে গেলেন। একটা সময় নতুন পাদরির জীবন আয়ু ঘনিয়ে এল। নতুন পাদরি যখন মারা যাচ্ছিল, তখন তিনি তার শিয়রে বসে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি দেখতে পাচ্ছেন, মৃত্যু আপনার সামনে হাজির। আল্লাহর শপথ! আমি আপনাকে সবকিছুর চেয়ে বেশি ভালোবেসেছি। এখন আমাকে কী

কী কাজ করার আদেশ দিচ্ছেন? কার কাছে যাওয়ার নির্দেশ দিচ্ছেন?'

নতুন পাদরি বললেন, 'বৎস, আল্লাহর শপথ! আমি কেবল একজনকেই চিনি, যিনি মসুলে থাকেন। তার কাছে যাও। সেখানে গেলে দেখবে—তার অবস্থাও আমার মতোই।'

নতুন পাদরি মারা যাওয়ার পর মসুলে এসে উপস্থিত হলেন তিনি। একসময় মসুলের পাদরি জীবন সায়াহ্নে চলে এল। তিনি তাকে সে কথাই জিজ্ঞেস করলেন, যা শামের পাদরিকে করেছিলেন। তার প্রশ্নের জবাবে মসুলের পাদরি বলেন, 'আমি কেবল একজনকেই চিনি, তিনি নাসীবাইন এলাকায় থাকেন। তার অবস্থাও আমার মতোই। তার কাছে যাও।'

মসুলের পাদরি মারা গেলে তিনি নাসীবাইন পৌঁছোলেন। সেখানকার পাদরির সান্নিধ্য গ্রহণ করলেন। নাসীবাইনের পাদরি যখন মারা যাচ্ছিলেন, তখন তিনি তাকেও একই কথা বলেন যা অনান্য পাদরিদের বলেছিলেন। তার কথা শুনে নাসীবাইনের পাদরি তাঁকে বাইজান্টাইন রাজ্যের আম্মূরিয়্যা এলাকায় যাওয়ার নির্দেশ দেন। নাসীবাইনের পাদরিকে দাফন করে তিনি আম্মূরিয়্যায় পৌঁছান। আম্মূরিয়্যার পাদরির শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। সেখানে তিনি কিছু অর্থ-সম্পদ অর্জন করেন। ভেড়ার একটি ছোট্ট পাল ও কয়েকটি গাভীর মালিক বনে যান। যখন আম্মূরিয়্যার পাদরির মৃত্যু ঘনিয়ে আসে, তখন তিনি তার কাছেও নসীহাহ চান। আম্মূরিয়্যার পাদরি বলেন, 'আল্লাহর শপথ! আমার মতো আর কোনো ব্যক্তি জীবিত আছে বলে আমার জানা নেই। তবে সময় খুব কাছাকাছি চলে এসেছে। আল-হারাম থেকে একজন নবি প্রেরণ করা হবে। অগ্নেয়শিলা গঠিত দুই অঞ্চলের মাঝামাঝি এলাকায় তিনি হিজরত করবেন। যে অঞ্চলের মাটি হবে কিছুটা লবণাক্ত ও খেজুর গাছবহুল। তাঁর মধ্যে কিছু স্পষ্ট নিদর্শন থাকবে। তাঁর দু-কাঁধের মধ্যে থাকবে নবুওয়াতের সীলমোহর। তিনি উপহার গ্রহণ করবেন, কিন্তু সদাকা গ্রহণ করবেন না। সেই অঞ্চলে যাবার সামর্থ্য থাকলে চলে যাও। কারণ তাঁর আগমনের সময় খুব কাছাকাছি।'

কিছুদিন পর আরব ব্যবসায়ীদের একটি কাফেলার সাথে তাঁর দেখা হয়। নিজের ভেড়া ও গাভীর পালের বিনিময়ে তাঁকে আরব ভূমিতে পৌঁছিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব দেন ব্যবসায়ীদের। ওরা প্রস্তাবে রাজি হয়। কিন্তু আল-কুরা উপত্যকায় এসে ব্যবসায়ীরা গাদ্দারি করে তাঁর সাথে। দাস হিসেবে বিক্রি করে দেয় তাঁকে।

সেখান থেকে তাঁকে কিনে নেয় এক ইহুদী। এরপর তাঁকে মদীনায় আনা হয়। তিনি সেখানে খেজুর গাছ দেখতে পান। খেজুর গাছ থেকে তাঁর মনে খুশির ঢেউ উঠতে থাকে। তিনি বুঝতে পারেন—এটাই সে শহর, যার সম্পর্কে আম্মুরিয়্যার পাদরি তাঁকে বলেছিলেন। তিনি তাঁর মনিবের অধীনে দাসত্বের জীবন কাটাতে থাকেন। অপেক্ষা করতে থাকেন সে সময়ের, কখন তাঁর সাথে সেই মহাপুরুষের সাক্ষাৎ হবে।

একদিন তিনি খেজুর বাগানে কাজ করছিলেন। গাছের ওপর ওঠে খেজুর নামাচ্ছিলেন। হঠাৎ শুনতে পেলেন তাঁর মনিবের এক চাচাতো ভাই বলছেন, 'আল্লাহ বানূ কাইলা গোত্রকে শায়েস্তা করুন। আল্লাহর শপথ! তারা এখন মক্কা থেকে আগত এক ব্যক্তির চারপাশে জড়ো হয়েছে। তাদের ধারণা সে একজন নবি।' এ কথা শুনে তাঁর অন্তরে আনন্দের বন্যা বয়ে যায়। তিনি মনে মনে ভাবতে লাগলেন—এ ব্যক্তিটাই কি সেই মহাপুরুষ? তা হলে কি সব প্রতীক্ষার অবসান হতে চলেছে? আমি কি সত্যের কাছে পৌঁছে গেছি? চিন্তাগুলো তাঁর মনে এতটাই ঢেউ খেলতে থাকল যে, গাছ থেকে পড়ে যাবার উপক্রম হলো। তিনি দ্রুত গাছ থেকে নেমে এসে তাঁর মনিবের চাচাতো ভাইকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তিনি কে?'

তিনি দাস ছিলেন, তাই তাঁর কথা শুনে মনিবের চাচাতো ভাই রেগে গেলেন। কষে থাপ্পড় বসিয়ে দিলেন তাঁর গালে। ভুরু কুঁচকে জবাব দিলেন, 'এ দিয়ে তোর কী? যা! নিজের কাজ কর।'

দিন গড়িয়ে সন্ধে হলো। তিনি কিছু খেজুর হাতে রওনা হলেন সেই ব্যক্তিটির সাথে দেখা করা জন্যে, যার কথা তাঁর মনিবের মনিবের চাচাতো ভাই বলছিল। তিনি সে মহাপুরুষের কাছে গিয়ে বললেন, 'শুনলাম—আপনি একজন ভালো মানুষ। আর আপনার সাথে কিছু সাথি আছে যারা এ এলাকায় অপরিচিত। আমার কাছে কিছু সদাকার খেজুর আছে। মনে হলো এ অঞ্চলে আপনারাই হলেন এর হকদার। এই হলো খেজুর। এখান থেকে কিছু খান।'

তাঁর কথা শুনে সে মহাপুরুষ হাত গুটিয়ে নিলেন। সাথিদের ডেকে বললেন, 'তোমরা খাও।' তিনি মনে মনে ভাবলেন—আম্মুরিয়্যার পাদরি তাঁকে যেসব গুণ বলেছিলেন, তার একটা পাওয়া গেল। এই ভেবে তিনি দ্রুত ফিরে গেলেন মনিবের বাড়িতে। খানিক সময় পর নিজের জমানো কিছু খাবার নিয়ে আবারও

এলেন সে মহাপুরুষের কাছে। বললেন, 'একটু আগে দেখলাম, আপনি সদাকার জিনিস খান না। এটি উপহার। সদাকা নয়। এখান থেকে কিছু খান।' মহাপুরুষটি সে খাবার থেকে খানিকটা খেলেন এবং তাঁর সাথিদেরকেও দিলেন। এ দৃশ্য দেখে তিনি ভাবলেন—পাদরির দেওয়া দুটো বৈশিষ্ট্য মিলে গেল।

সেদিনকার মতো তিনি ফিরে এলেন।

দিন কয়েক পর আবার সে মহাপুরুষের কাছে গেলেন। দেখতে পেলেন, মহাপুরুষটি একটি লাশের পেছন পেছন যাচ্ছিলেন। তিনি চক্কর দিতে লাগলেন তাঁর পাশে। এই দৃশ্য দেখে সে মহাপুরুষ বুঝে ফেললেন—তিনি কী খুঁজে বেড়াচ্ছেন। তিনি তাঁর গায়ের চাদর নামিয়ে ফেললেন। মহাপুরুষের দু-কাঁধের মধ্যিখানের সীলমোহর এবার স্পষ্ট হলো। তা দেখে কান্নায় ভেঙে পড়লেন তিনি।

এ কান্না দুঃখের কান্না নয়। এতদিন পর সত্যকে খুঁজে পেয়েছেন, এ কান্না ছিল তারই বহিঃপ্রকাশ। তিনি তা খুঁজে পেয়েছেন, যা তিনি হন্নে হয়ে খুঁজেছেন। তিনি সে মহাপুরুষকে খুঁজে পেয়েছেন, যার জন্যে অপেক্ষা করেছেন বছরের-পর-বছর। প্রিন্স হয়েও দাসত্বের জীবন মেনে নিয়েছেন যার জন্যে, আজ তাঁর সামনে তিনি। এ দৃশ্যের প্রকৃত রূপটা আমি আমার লেখায় ফুটিয়ে তুলতে পারব না। সে সাধ্যি আমার নেই। তবে এই মুহূর্তে দু-লাইন কবিতা মনে পড়ছে, সেইটে উল্লেখ করছি :

বহু দেশ ঘুরে, বহু ক্লেশ পরে,
খুঁজে পেলেম তারে
হৃদয় পটে, ভাবনার তটে
রেখেছিলেম যারে।
বাড়াও হায়াৎ, করাও দেখা,
হে প্রভু দয়াময়—
এ প্রার্থনার পরে, দিনমান ভরে,
করিয়াছি অনুনয়।
ভাসিয়াছে মনে, ক্ষণে ক্ষণে,

তাহার বদনখানি;
অশ্রু সে তো, গড়িয়েছে কত,
কেবলই আমি জানি।
সে মহামানবেরে, মদীনার পরে,
আজি করিলেম দরশন
হিয়ার মাঝারে, বহিছে সজোরে
দখিনা সমীরণ।

একবার মানচিত্রটা হাতে নাও, এরপর দেখো—কোথায় পারস্য, আর কোথায় মদীনা। কতটা দূরত্ব এই শহর দুটোর মধ্যে। আর সে সময় তো দ্রুতগামী যানবাহনও ছিল না আমাদের মতো। গন্তব্য পথে ছিল সীমাহীন প্রতিকূলতা। এত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও, মাইলের-পর-মাইল সফর করেছেন তিনি। যার জীবন কেটেছে রাজকীয় মহলে, বাদশাহি হালতে, তিনিই রাস্তায় রাস্তায় ঘুরেছেন। সত্যের আলোকিত পথ খুঁজে বেড়িয়েছেন দেশ হতে দেশান্তরে। তিনি ছিলেন এমনই বীরপুরুষ, যিনি সত্যের কাছে আসার জন্যে বাজি রেখেছেন নিজের জীবন। আসলে বীরপুরুষরা এমনই হয়। কোনো প্রতিবন্ধকতা তাঁদের গতিকে রুদ্ধ করতে পারে না।

তিনি দ্রুত সে মহাপুরুষের কাছে গেলেন। উপুড় হয়ে নবুওয়তের সীলমোহরে চুমো খেলেন। তিনি বুঝতে পারলেন—এ মহাপুরুষই তিনি, যাঁর আগমনের কথা পাদরি তাঁকে জানিয়েছিলেন। ইনিই হলেন আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ ﷺ। তাঁর হৃদয় শিহরিত হলো। চোখ-মুখ ভিজে গেল চোখের জলে। তাঁর কান্না দেখে আল্লাহর রাসূল ﷺ বললেন, 'সালমান! এদিকে এসো।'

এই যা! বলেই ফেললাম—তাঁর নামটা। কী আর করার। আমি যার কাহিনি তোমায় শুনাচ্ছি, তাঁর নাম সালমান। সালমান ফারিসি। যিনি সত্যকে আলিঙ্গন করার জন্যে রাজকীয় জীবন পরিত্যাগ করেছেন। সত্যের স্বাদ আস্বাদন করার জন্যে দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়েছে। সত্যকে খুঁজতে খুঁজতে মাইলের-পর-মাইল পথ পাড়ি দিয়েছেন। যিনি বিরতিহীন ছুটেছেন। ছুটেছেন সত্যের পথে।

নবিজির কাছে সালমান তাঁর ঘটনা খুলে বললেন। সাহাবিরা বিস্মিত হলেন তাঁর ত্যাগের কথা শুনে। বিশাল মুক্তিপণ দিয়ে তাঁকে ছাড়িয়ে আনা হলো। মুক্তি

পেয়ে তিনি রাসূল ﷺ-এর কাছে চলে এলেন। সে থেকে মৃত্যু অবধি সত্যের ওপর অটল ছিলেন। শেষমেশ সত্যের জন্যে জীবনকে উৎসর্গ করে এই দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন তিনি।[১১৫]

তুমি সেদিন কাকে যেন 'কাছে আসার সাহসী গল্প' শুনাচ্ছিলে। ওই যে, ক্লোজ আপের কাছে আসার সাহসী গল্প। মনে পড়েছে? তুমি যখন প্রেমিক-প্রেমিকার যিনার গল্পকে 'কাছে আসার গল্প' বলে চালিয়ে দিচ্ছিলে, তখন বড্ড মাথা ধরছিল আমার।

প্রেমের প্রস্তাব দিয়ে কোনো পুরুষকে ভালোবেসে যাওয়ার নেওয়ার নাম 'কাছে আসা' নয়। কারও সাথে পালিয়ে গিয়ে সংসার করার নাম 'কাছে আসা' নয়। এগুলোতে সাহসের ছিটেফোঁটাও নেই। কেবল আছে নোংরামো আর অবাধ্যতা। সত্যিকার কাছে আসা তো রবের দিকে ফিরে আসার নাম। সত্যকে আলিঙ্গন করার নাম 'কাছে আসা'।

আমি জানি, প্রকৃত কাছে আসার স্বাদ তুমি অনুভব করোনি। কারণ তুমি কখনো সত্যকে আলিঙ্গন করতে চাওনি। হ্যাঁ, সত্যিই চাওনি। আল্লাহ তোমাকে জন্ম দিয়েছিলেন মুসলিম ঘরে। সত্য সব সময় তোমায় হাতছানি দিয়ে ডেকেছে। তোমাকে আলিঙ্গন করতে চেয়েছে। কিন্তু তুমি! কখনো সেটা উপলব্ধি করতে চাওনি। কখনো বুঝতে চাওনি যে, তুমি ভুল পথে আছ। আর কেউ যখন বোঝাতে চেয়েছে, তখন এক কান দিয়ে শুনে আরেক কান দিয়ে বের করে দিয়েছ।

এত কিসের অহংকার তোমার?

তোমার বাবা কি সালমানের বাবার চেয়েও বড় জমিদার?

তবে এত দাম্ভিকতা কোথা থেকে আসে?

সালমানরা যদি কষ্টের-পর-কষ্ট করে সত্যকে খুঁজে নিতে পারে, তবে তুমি কেন সত্যকে মেনে নিতে পারবে না? তুমি তো পারিবারিকভাবেই এ সত্যকে কাছে পেয়েছ। তবুও তুমি বেখেয়াল, উদাসীন। আমি জানি না, আর কবে তুমি ফিরে আসবে। বিশ্বাস করো, আল্লাহর দিকে ফিরে আসতে তোমায় বেশি পরিশ্রম

---

[১১৫] ইবরাহীম আলি, সীরাতুন নবি ﷺ, পৃষ্ঠা : ৬০-৬৬।

করতে হবে না। এ পথ খুবই সংক্ষিপ্ত এবং সহজ। ইবনুল কাইয়িম ﷺ বলেন,

> "আল্লাহর কাছে তাঁর পাশে দারুস সালামে যেতে এগিয়ে এসো। সেখানে যেতে অত বেশি কষ্ট-ক্লেশ, দুঃখ-বেদনা, পরিশ্রম করতে হবে না। এটি তো সংক্ষিপ্ত ও সহজ পথ।... আর এ কাজ করতে তোমাকে খুব বেশি কষ্ট-ক্লেশ, দুঃখ-বেদনা সহ্য করতে হবে না। এটি কোনো কঠিন কাজও না... এটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কাজ নয় যে, কষ্টকর হবে। কাজটি শুধু দৃঢ় সংকল্প, চূড়ান্ত নিয়তের—যা তোমার শরীর, মন ও গোপনীয় কাজকে আরাম দেবে। অতএব, যা কিছু ছুটে গেছে তাওবার দ্বারা তা সংশোধন করবে এবং ভবিষ্যৎ জীবনে সে কাজ করা থেকে বিরত থাকবে—এ ব্যাপারে দৃঢ় সংকল্প ও নিয়ত করো।... পরকালের তুলনায় এ ক্ষুদ্র সময়ে যদি তুমি তোমার রবের পথে চলো, তা হলে মহাসাফল্য ও মহাবিজয় অর্জন করবে। আর যদি প্রবৃত্তি, আরাম-আয়েশ, হাসি-তামাশায় জীবন কাটিয়ে দাও—যা খুব তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাবে—তা হলে পরকালে তোমাকে যন্ত্রণাদায়ক আযাব পেতে হবে। (মনে রেখো) হারাম কাজ থেকে বিরত থাকা, আল্লাহর আনুগত্যে ধৈর্যধারণ করা ও প্রবৃত্তির বিপরীত কাজ করার তুলনায় সে আযাবের দুঃখ-কষ্ট, যন্ত্রণা ও বেদনা অত্যধিক কঠিন, শক্ত ও সর্বদা বিদ্যমান।"[১১৬]

[১১৬] ইবনুল কাইয়িম, মুখতাসার আল-ফাওয়ায়িদ, পৃষ্ঠা : ২৮।

ফারাক সবিস্তর সকল কাজে

বাসায় কিছু তক্তা আনা হয়েছে। তক্তাগুলো ভেজা। রোদের শুকোনোর পরে সেগুলো আসবাব বানানোর উপযোগী হবে। সকালের মিষ্টি রোদের হাতছানি পেয়েই ওগুলো বাইরে দিয়ে এসেছি। দুপুর গড়ালে তুলব বলে ভেবেছিলাম। কিন্তু হঠাৎ বৃষ্টির আভাস পাওয়া গেল আকাশে। আস্তে আস্তে চারিদিক অন্ধকার হতে লাগল। বৃষ্টির ফোঁটাও ঝরতে লাগল টিপটিপ করে। আম্মু তক্তাগুলো উঠিয়ে ফেলতে বললেন।

বেশ কয়েকটা তক্তা ছিল ইয়া মোটা সাইজের। একটা তুলতে গেলেই জীবন শেষ। ঘাম বেরিয়ে আসত। আমি বেছে বেছে ওগুলো তুলছিলাম, আর ছোটবোন পাতলাগুলো। কাজের ফাঁকে ওকে আমি বললাম, 'কিরে, সবখানে সমান অধিকার নিবি মাগার সমান বোঝা নিবি না, এ কেমন বিসার?'

ছোটবোন হাসি দিয়ে বলল, 'যাও, ভাগো। যারা বলে নারী-পুরুষ সমান, ওরা আসলে হিজড়া।'

আমি তো অবাক। হিজড়া কেন? সে বলল, 'জন্মগতভাবেই ছেলেমেয়ে আলাদা। দেহের গঠন থেকে নিয়ে চিন্তাচেতনা—সবকিছুই আলাদা। প্রতিটি সমাজ তাদের আলাদা নামে ডাকে। পার্থক্য আছে বলেই তো একজন মেইল অন্যজন ফিমেইল। কিন্তু লিঙ্গের পার্থক্য যাদের বোঝা যায় না, ওদের হিজড়া

বলা হয়। ওরা দুজনের বৈশিষ্ট্যই মিলিয়েঝিলিয়ে পায়।'

উত্তরটা হয়তো হেঁয়ালিমাখা, তবে চিন্তার খোরাক আছে। পরক্ষণে চিন্তা করেছি কথাগুলো। সমানাধিকার নিয়ে চিল্লাচিল্লি করে যারা মুখের ফেনা তুলে ফেলে, তারাও কি এই পার্থক্য অস্বীকার করতে পারবে?

'আমরা সবক্ষেত্রেই সমান'—এই ধরনের কথাবার্তা প্রায়ই তোমার স্ট্যাটাসে ফুটে ওঠে। বড্ড কষ্ট হয় আমার। নিজের জন্যে না, তোমার এই ছেলেমানুষির জন্যে। তুমি নিজেও জানো, দাবিটা মিথ্যে। আমরা সমান নই। আমাকে যা দেওয়া হয়েছে, তা তোমার মধ্যে নেই। আর যা তোমার মধ্যে আছে, তা আমার নেই। তুমি ভালোবাসা দিয়ে বিশ্বজয় করতে পারো, আর আমি পেশিশক্তি দিয়ে। তুমি আবেগের জালে মানুষকে বশ করতে পারো, আর আমি প্রভাব খাটিয়ে। তুমি আর আমি এক নই। তোমার আর আমার গঠন এক নয়। দেহকাঠামো থেকে নিয়ে চিন্তার জগৎ—সবটাই ভিন্ন। পদে পদে এই ভিন্নতা ফুটে ওঠে।

তুমি রাজেন্দ্রনন্দিনী গর্ভধারিণী প্রেমসঞ্চারিণী নারী
অনায়াসে যাহা তুমি পারো, আমি কভু নাহি তাহা পারি
বিশ্বপারাবারে যত অবিচল মঙ্গল
তব প্রেমে করিয়াছ অথল উজ্জ্বল
বাঁধিয়াছ পুরুষেরে প্রণয়ের ডোরে
মমতাখানি বিলায়েছ আপন করে
তুমি কামিনী ভামিনী প্রতীপদর্শিনী সাহসসঞ্চারিণী নারী
ফারাক সবিস্তর সকল কাজে, ফারাক দেহাবরণ আমাদেরি

তর্কের খাতিরে কিছু সময়ের জন্যে মেনে নিলাম—আমরা এক। এরপর সমান সমান দায়িত্ব নিয়ে দুজন যুদ্ধে গেলাম। দুটি প্ল্যাটুন এই যুদ্ধে অংশ নিচ্ছে। একটির দায়িত্ব তোমার হাতে, আরেকটি আমার।

তুমি কি রণক্ষেত্রে সমানে সমান ভূমিকা রাখতে পারবে?

যদি বাগড় ধরে বলো, পারব। তো বিজ্ঞান এসে বলবে, এই দাবি নিছক বাচ্চামো ছাড়া কিছুই নয়।

হিমোগ্লোবিন নামে রক্তের একটি উপাদান আছে, যা অক্সিজেন পরিবহনে সহায়তা করে। যার হিমোগ্লোবিন কম, তার অক্সিজেন পরিবহন ক্ষমতাও কম। তোমার দেহে হিমোগ্লোবিন আমার চেয়ে কম। তাই অল্পক্ষণ যুদ্ধ করেই তুমি হাঁপিয়ে উঠবে। আমি বেশি সময় ধরে লড়াই চালিয়ে যেতে পারব।

না ঘামলে গরমে দম বন্ধ হয়ে আসতে চায়। ঘামলে কিছুটা শান্তি লাগে। বিজ্ঞান জানিয়ে দিয়েছে—তুমি আমার চেয়ে কম ঘামো। তাই গরমের মধ্যে তোমার কষ্ট বেশি হয়।[১১৭] এরপর ধরো ঠান্ডার কথা। ঠান্ডাতেও তুমি আমার চেয়ে বেশি অস্বস্তিতে পড়ো। ফলে মাথা খাটাতে পারো কম।[১১৮] প্রচণ্ড গরম আর ঠান্ডার মধ্যে আমি যেভাবে কাজ চালিয়ে যেতে পারব, তুমি পারবে না। সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগবে। কারণ, তোমার শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়াটাই এমন।

ধরো, যুদ্ধটা শুরু হলো ভরা-শীতে। একেবারে বাঘ কাঁপা মাঘে। যুদ্ধ চলাকালীন তুমি যদি সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগো, কিংবা ঠিকঠাক মাথা খাটাতে না পারো, তবে ব্যাপারটা কত ভয়ংকর হবে চিন্তা করেছ?

ধরো, কোনো কারণে শত্রুরা আমাদের ওপর জয়ী হয়েছে। ওদের দৌড় খেয়ে পাহাড় বেয়ে ছুটতে হচ্ছে। তখন কিন্তু তুমি পেছনে পড়ে যাবে। কারণ, তোমার হিপবোন আর পায়ের গঠন দৌড়ের জন্য উপযোগী নয়। হাঁটু দুটো বারবার ধাক্কা খেয়ে গতি কমিয়ে দেবে। ফলে পুরুষ সৈনিকরা দৌড়ে আগে চলে যাবে। আর কমান্ডার হয়েও তুমি রয়ে যাবে পেছনে। শত্রুবাহিনী যদি এটা নিয়ে হাসাহাসি করে, তবে ব্যাপারটা কি ভালো দেখাবে?

তোমাকে একটু আশাহত করি। সমানাধিকার-শরীফের তালিম যারা দেয়, ওদের দেশেও কিন্তু নারী সেনাপ্রধান নেই। আমেরিকা কিংবা বৃটেনের ইতিহাসে কোনো নারীই সেনাপ্রধান হতে পারেনি। নারীবাদী সভ্যতার সূতিকাগারের অবস্থা যদি এই হয়, তো বাদবাকি দেশের কথা নাই বা বললাম।

ওরা কেন নারীকে সেনাপ্রধান বানায়নি?

উত্তরটা খুবই সোজা। রণাঙ্গনের নেতৃত্ব রমণীর হাতে থাকাটা বড্ড বেমানান।

---

[১১৭] https://bit.ly/2VGgJw1

[১১৮] https://bit.ly/3eZ1kP8
https://bit.ly/3dQ94S0

এটা নারীর ক্ষেত্র নয়, পুরুষের। নারীরা সর্বোচ্চ সহযোগী হতে পারে। সেনাপতি না। এই সত্যিটা ওরাও জানে। তাই তো সেনাপ্রধানের দায়িত্ব নারীর হাতে তুলে দেয়নি ইউরোপ। ঠিকই পুরুষদেরকে বাছাই করেছে এই কাজের জন্যে।

নারী-পুরুষ সবক্ষেত্রেই সমান—এমন ছেলেভোলানো গল্প আর কক্ষনো বোলো না। বিজ্ঞান খিলখিল করে হাসবে। লজ্জায় মুখ লুকাবে হাজারও গবেষকদের রিসার্চ পেপার। নারী-পুরুষ কখনোই সমান না। কী শারীরিক আর কী মানসিক, সব দিক থেকে তারা আলাদা। কিয়ামত হয়ে গেলেও দুজনকে এক করে ফেলা সম্ভব না। এমনকি ট্রান্স জেন্ডার প্রক্রিয়ার মাধ্যমেও না। চলো, তোমায় অল্পকিছু পার্থক্যের কথা শোনাই।

মস্তিষ্ক হচ্ছে মানবদেহের মূল চালিকাশক্তি। এর দ্বারা পুরো দেহ নিয়ন্ত্রিত হয়। গত দশ বছরে বিজ্ঞানী, চিকিৎসক, মনোবিজ্ঞানী, সমাজবিজ্ঞানীদের পরিচালিত বিভিন্ন গবেষণায় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে—পুরুষ ও মহিলাদের মস্তিষ্কে গঠনগত পার্থক্য আছে। আছে তথ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ পদ্ধতির ভিন্নতা। উপলব্ধি, কল্পনা, স্বভাব ও পারদর্শিতার ক্ষেত্রগুলোও ভিন্ন।

শারীরিক কাঠামোর দিক দিয়ে পুরুষরা অধিক শক্তিশালী। শুধু শক্তিশালীই না, তাদের পেশিশক্তিও বেশি। সাধারণভাবে পুরুষদের মস্তিষ্কের ওজন এক শ গ্রাম বেশি। মস্তিষ্কের কোষকলার সংখ্যা চার পার্সেন্ট বেশি। বিপাকীয় পদ্ধতি নারীদের তুলনায় দ্রুত। ফুসফুস আকারে বড়। তাই তারা বেশি বাতাস ধরে রাখতে পারে। পুরুষদের মধ্যকরোটিগত লোব অপেক্ষাকৃত বড়।[১১৯] এই লোব গণনাসংক্রান্ত কাজ করে থাকে। তাই ছেলেরা গণিত, জ্যামিতিতে পারদর্শী হয়। স্থান-সম্পর্কিত ধারণা বেশি থাকায় মানচিত্রের ভাষা সহজে বুঝতে পারে। অপরদিকে 'লিমবিক সিস্টেম' বা অনুভূতি নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত অংশ নারীদের গভীর ও বিস্তৃত। তাই তারা আবেগ ও অনুভূতি বিশ্লেষণে, বিস্তৃত মাত্রায় তথ্য সংগ্রহে, তথ্যগুলোর মধ্যে যোগাযোগ তৈরির ক্ষেত্রে অধিক পারদর্শী। সাধারণভাবে বলা যায়, পুরুষরা পদার্থবিদ্যা এবং গণিতে পারদর্শী। আর মহিলারা ভাষাজ্ঞান ও আবেগ-অনুভূতি বোঝার ক্ষেত্রে পারদর্শী।

---

[১১৯] Ogden et al (2004). Mean Body Weight, Height, and Body Mass Index, United States 1960-2002 Advance Data from Vital and Health Statistics, Number 347, October 27, 2004.

কী, ওমন করছ কেন? কিছু বলবে? মানসিক দৃঢ়তা নারীর বেশি—এই কথা বলার জন্যে মনটা উশখুশ করছে?

তোমার এই দাবিও মিথ্যে। আগাগোড়াই বানোয়াট। বিজ্ঞান মশায় বলেছে, নারীর আবেগ-উচ্ছ্বাস বেশি উথলে ওঠে। তারা দ্রুত অস্থির হয়ে পড়ে। পছন্দনীয় বিষয়ে ও ভয়ের ক্ষেত্রে দ্রুত আবেগ দ্বারা প্রভাবিত হয়। এক্ষেত্রে পুরুষ অধিকতর ঠান্ডা মেজাজের পরিচয় দেয়। নারী স্বাভাবিকভাবেই সৌন্দর্যচর্চা, অলংকার, সাজগোজ ও বিভিন্ন ধরনের ফ্যাশন পছন্দ করে। নারীরা অধিকতর সতর্ক থাকে। তারা বেশি কথা বলে, বেশি ভয় পায়। আনুষ্ঠানিকতা নিয়ে অধিক মাথায় ঘামায়। ভাষা জ্ঞান—বিশেষ করে ব্যাকরণ, বানান, বাক্যগঠনে তারা অত্যাদিক পারদর্শী। নারীরা মানুষের সাথে কাজ করতে আগ্রহ পায়, পুরুষরা যন্ত্রের সাথে। নারীরা দ্রুত আবেগতাড়িত হয়। ঋতুকালীন সময়ে নারীদের স্নায়ুবিক ক্ষমতা দুর্বল হয়ে পড়ে। কাজের একাগ্রতা কমে যায় অনেকখানি। কমে যায় শক্তি। আর সন্তান প্রসবকালীন সময়ে তারা মানসিক চাঞ্চল্যে ভোগে। অনুভূতি শক্তি কমে যায়।[১২০]

নারী-পুরুষের এই পার্থক্যটা শিশুকাল থেকেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ছেলে শিশু ঘূর্ণায়মান বস্তু দেখে খুশি হয়। আর মেয়ে শিশু খুশি হয় মানুষের চেহারা দেখে। মেয়ে শিশুকে কথা বা গান দিয়ে সহজেই ভুলিয়ে ফেলা যায়। ভাষা পুরোপুরি বোঝবার আগেই ভাষার আবেগ সে আয়ত্ত করতে পারে।[১২১]

এতকিছুর পরও অফিস-আদালতে ফিফটি ফিফটি সিট না রাখা হলে গোস্সা করবে?

আচ্ছা, রাগ করতে চাও করো। তবে একটু পরে। কথার মধ্যিখানে উঠে যেয়ো না। নির্ঘুম রাত কাটিয়ে কিছু তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করেছি। ওগুলো একটু শুনো। দেখো, অভিমান কমে কি না।

---

[১২০] "Does Sex Make a Difference?" FDA Consumer magazine. Archived from the original on March 26, 2009, https://bit.ly/3dRy7Ep

[১২১] Alexander, Gerianne M.; Saenz, Janet (2012-09-01). "Early androgens, activity levels and toy choices of children in the second year of life". Hormones and Behavior. 62 (4): 500-504.

নারীজীবনের একটি স্বাভাবিক ঘটনা হলো মাসিক। প্রতিটি মেয়েই এর মুখোমুখি হয়। এই সময় কিছু উপসর্গ দেখা যায়। খিটখিটে মেজাজ, উদ্‌বিগ্নতা, রাগ, মাথাব্যথা, পেট ফাঁপা, হাত-পায়ে পানি আসা ইত্যাদি লক্ষণ দেখা যায় ৫ দিন আগে থেকেই।[১২২] এতগুলো উপসর্গ নিয়ে মাসিকের সময় তুমি কি স্বাভাবিক থাকতে পারবে?

মেনোপজের পর অবস্থা আরও শোচনীয় হয়ে যায়। জীবনচাকা মোড় নেয় অন্যদিকে।[১২৩] আর গর্ভাবস্থায়? ওই সময় অবস্থা তো আরও করুণ। শেষ দিকে এসে নড়াচড়া করতেও কষ্ট হয়। তখন অন্যের ওপর নির্ভরশীল হওয়া ছাড়া আর উপায় থাকে না কোনো।

নারীবাদ তোমাদের হীন প্রতিযোগিতায় নামিয়েছে। আর হাতে তুলে দিয়েছে স্যানিটারি ন্যাপকিন। ব্যস, এখন দৌড়োও পুরুষদের সাথে। ভাগো প্রাণপণে। আরে, ন্যাপকিন দিয়ে বিশ্বজয় করা যায় না। ওটা টিস্যুর মতন, শুষার কাজ করে। খিটখিটে মেজাজ, উদ্‌বিগ্নতা, রাগ, মাথাব্যথা—এসব কি আর ন্যাপকিন দিয়ে কমে? পুরুষের সাথে পাল্লা দিয়ে দৌড়োতে এলে নির্ঘাত ব্যথায় কাতর হতে হবে।[১২৪] রেসে জয়ী হওয়ার জন্যে ময়দানে আসতে হবে দাঁতকপাটি করে। দৌড়োতে হবে যন্ত্রণার বোঝা কাঁধে নিয়ে।

সমানাধিকারের দৌড়ে যে ধকল যাচ্ছে তোমার ওপর দিয়ে, তা তো তুমিই বোঝো। শারীরিক ও মানসিক দিক থেকে অপূরণীয় ক্ষতি হচ্ছে। যে-কোনো অঙ্গকে একটু বেশি খাটানো হলে পুরো দেহেই এর প্রভাব পড়ে। তুমি তো পুরো শরীরকেই অস্বাভাবিক কাজ করতে বাধ্য করছ। তোমার দেহকাঠামো যেসব কাজের জন্যে উপযুক্ত নয়, ওগুলোও করে যাচ্ছ দাঁতে দাঁত লাগিয়ে। এর প্রভাব কতটা মারাত্মক হতে পারে, ভেবেছ কোনো দিন?

প্রতিনিয়ত তোমার দেহে স্ট্রেসের গাট্টি জমা হচ্ছে। হৃৎপিণ্ডকে অধিক কাজ করতে হচ্ছে। বাড়ছে ব্লাড প্রেসার। হু-হু করে বেড়ে যাচ্ছে রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ। বাড়ছে ডায়বেটিস, হার্ট-অ্যাটাক, কিডনি ড্যামেজ, স্ট্রোক। এসব অসুখের সাধারণ কারণ হলো 'স্ট্রেস বা ধকল', যেটা তুমি নিজেই গিলে খাচ্ছ।

---

[১২২] https://bit.ly/2D65iHx

[১২৩] https://bit.ly/2BY4RP4

[১২৪] https://ab.co/2NX6H5b

সামান্য স্ট্রেসেও নারীরা কুপোকাত হয়ে যায়। পুরুষের তুলনায় তাদের দেহে প্রভাব পড়ে বেশি।[১২৫] ফলে মাথাব্যথা, মানসিক রোগ, হার্টের সমস্যা নারীদের বেশি হয়।[১২৬] অফিস আর বাসায় দৌড়োদৌড়িই এই স্ট্রেসের মূল কারণ। নারী কর্মকর্তারা পুরুষদের চেয়ে বেশি স্ট্রেসের শিকার হয়।[১২৭] ব্রিটেনের মতো দেশে প্রায় ৮০% কর্মজীবী নারী স্ট্রেসে ভুগছে। চাকরির ধকলে ঠিকমতন ঘুমোতে পারছে না রাতে।[১২৮] গর্ভবতী নারীদের শারীরিক জটিলতা দেখা দিচ্ছে।[১২৯] দিনদিন বাড়ছে অটিস্টিক বেবির সংখ্যা।[১৩০]

এরপরও যদি গোঁ ধরে নিজেকে কষ্ট দিতে চাও, তো কার কী! বিড়াল তো ঠেলায় পড়লে গাছে ওঠে, আর তুমি প্রতিদিনই গাছে থাকতে চাও। সারাটা ক্ষণ নিজের ওপর অত্যাচার করতে চাও। বিশ্রামের চাহিদাকে দমিয়ে পাল্লা দিতে চাও পুরুষের সাথে। যে জিনিসের দায়িত্ব তোমাকে দেওয়া হয়নি, সাধ করে সেটা ঘাড়ে চাপাচ্ছ তুমি। জেদ ধরে নিজেকে পুরুষের সমকক্ষ প্রমাণ করতে চাইছ, কিন্তু তোমার শরীর এতে সায় দিচ্ছে না। শরীর চলছে প্রকৃতির নিয়মে, আর তুমি প্রকৃতির বিরুদ্ধে।

একজন সন্তানসম্ভবা নারী কী করে ধকল সামলাতে পারবে? এই সময়টাতে তার বিশ্রাম প্রয়োজন। ভালো খাবারদাবার প্রয়োজন। কিন্তু কে শোনে কার কথা। নারীবাদীরা চাবি মাইরা দিছে ছাইড়া। আর খুশিতে ঠেলায় নারীজাতি সারাক্ষণ ভনভন করে ঘুরছে। নারায়ণগঞ্জ থেকে মতিঝিল অফিস করতে যাচ্ছে লোকাল বাসে চড়ে। আর ওদিকে বিকলাঙ্গ শিশু জন্মাচ্ছে। বাড়ছে হার্ট এটাক, কিডনি ড্যামেজ, স্ট্রোক। বাহ! চরমং উন্নয়নম।

---

[১২৫] Stress and your health, https://bit.ly/2ZBJhrw

[১২৬] Vaccarino, V., Shah, A.J., Rooks, C., Ibeanu, I., Nye, J.A., Pimple, P., et al. (2014). Sex differences in mental stress-induced myocardial ischemia in young survivors of an acute myocardial infarction. Psychosomatic Medicine; 76(3): 171–180

[১২৭] https://bit.ly/31EQTMx

[১২৮] Women Are at Breaking Point Because of Workplace Stress: Wellbeing Survey from Cigna, Louise Chunn, forbes.com [shorturl.at/bMOZ5]

[১২৯] Effects of prenatal stress on pregnancy and human development: mechanisms and pathways; Mary E Coussons-Read, PhD; Obstetric Medicine. 2013 Jun; 6(2): 52–57.

[১৩০] Stress exposure during pregnancy observed in mothers of children with autism [https://bit.ly/3iqiK9u]

বোন আমার, নারীবাদীদের পাল্লায় পড়ে নিজের ধ্বংস ডেকে এনো না। নারীত্ব তোমার অলংকার। সন্তান জন্ম দিয়ে তুমিই সচল রেখেছ এই পৃথিবী। তোমার গর্ভেই এসেছে খালিদ ইবনু ওয়ালিদ আর সালাহউদ্দীন আইয়ুবিরা। বিপ্লবীরা তো তোমার আঁচলের নিচেই বেড়ে উঠেছে। একজন বিধবার নিবিড় তত্ত্বাবধানেই ইদরিস শাফিয়ি ইমাম শাফিয়ি হয়েছেন। তুমি তো মহীয়সী গরীয়সী মাতা। অথচ নারীবাদীরা এই বৈশিষ্ট্য ছিনিয়ে নিতে চায় তোমার কাছ থেকে।

জন্মগতভাবেই তুমি আর আমি আলাদা। শারীরিক ও মানসিক দক্ষতা আলাদা আলাদা। এগুলো প্রকৃতির দেওয়া বৈশিষ্ট্য। ইসলামের ভাষায়—আল্লাহ তাআলার দান। এই ভিন্নতার নকশা আঁকা আছে উভয়ের মস্তিষ্কে। কোড করা আছে ডিএনএ-র দ্বিসূত্রক গঠনে। আর এটা এমনভাবে এনকোডেড আছে যে, নারীবাদের দাঁতওয়ালা ব্রাশ দিয়ে আজীবন ঘসলেও মুছে ফেলা সম্ভব হবে না।

যেহেতু আমাদের এনাটমি-ফিজোয়োলজি-সাইকোলজি ভিন্ন—তাই কর্মক্ষেত্রও ভিন্ন হতে হবে। এটাই স্বাভাবিক। কর্মক্ষেত্র এক করে ফেলাটা প্রকৃতির নিয়মবিরোধী পদেক্ষেপ। তোমার কর্মক্ষেত্র হতে হবে তোমার দেহ-মনের সাথে সামঞ্জস্যশীল। আর আমারটা আমার সাথে। জোর করে দুজনকে এক করতে চাওয়াটা আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত। এর মাশুল দিতে হবে কিশোরী-তরুণীদের। সমানাধিকারের মুলো ঝুলিয়ে নারীদেহের শেষ রক্তবিন্দু শুষে নিচ্ছে পুঁজিপতিরা। জোঁকের মতো ফুলে ফেঁপে উঠছে দরবেশ বাবারা। আর নারী হারাচ্ছে নারীত্বের গুণ। মাতৃত্বের মতো মহান দায়িত্ব পালনের চেয়েও গার্মেন্টসের হাড়ভাঙা খাটুনি বেশি আরামদায়ক মনে হচ্ছে।

বোন আমার, পুজিবাদী দর্শনে সবকিছু মাপতে যেয়ো না। তুমি মুসলিম, পুঁজিবাদ তোমার স্ট্যান্ডার্ড নয়। পুঁজিবাদের সাথে ইসলামের পার্থক্য আকাশ-পাতাল। পুঁজিবাদ আর ইসলামের দৃষ্টিকোণ আলাদা আলাদা। পুঁজিপতিদের দেওয়া মানদণ্ডে নিজেকে ভদ্রমহিলা প্রমাণে ব্যতিব্যস্ত হোয়ো না। ওটা গোলকধাঁধার জগৎ। স্বাবলম্বিতার মুলো দেখিয়ে ভ্যামপায়ারের মতো নারীদের রক্ত চুষতে চায় ওরা।

পুঁজিবাদ সবকিছু মাপে অর্থ দিয়ে। কে কতটুকু অগ্রসর আর কে পশ্চাৎপদ, তার মানদণ্ড হলো মাসিক আয়। উন্নয়নের মানদণ্ড হলো জিডিপি। পতিতা পর্যন্ত সাধুবাদ পায় পুঁজিবাদের কাছে। কারণ সে জিডিপি-তে অবদান রাখছে।

কিন্তু যে নারী পরিবারের জন্যে শ্রম দিচ্ছে, তার কোনো মূল্য নেই। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় এগুলো মুস্তাহাব পর্যায়ের। ফরজ হলো চাকরি-বাকরি করে উপার্জন করা। পরিবারের জন্যে কাজ করার চেয়ে গার্মেন্টসে দৈনিক ৮ ঘণ্টা হাড়ভাঙা পরিশ্রম করার দাম বেশি। যে নারী ঘর সামলাচ্ছে, সন্তানকে শিক্ষাদীক্ষা দিয়ে বড় করে তুলছে, ভবিষ্যৎ-প্রজন্মকে চরিত্রবান মানুষ হিসেবে গড়ে তুলছে, পুঁজিবাদের দৃষ্টিতে সে নিষ্কর্মা! বেগম রোকেয়ারা তাকে বলবে অবরোধবাসিনী।

পরিবারের জন্যে ১৬ ঘণ্টা ব্যয় করেও একজন নারী নাকি স্বাবলম্বী হতে পারবে না। সংসারের খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে যে নারী মাথা ঘামাচ্ছে, সেও নাকি নিষ্কর্মা! এমনকি ছেলেমেদের পড়াশোনা শিখিয়ে যে মা কোনো বিনিময় নিচ্ছে না, সেও বেকার। সে নারী মহিলাদের বিনামূল্যে চিকিৎসা-সেবা দিচ্ছে, সে পর্যন্ত বেকার। কারণ, জিডিপি-তে তার কোনো অবদান নেই। স্বাবলম্বীর তালিকায় নাম ওঠাতে হলে গার্মেন্টসে এসে কমপক্ষে ৮ ঘণ্টা ডিউটি করতে হবে। গলায় স্টেথোস্কোপ ঝুলিয়ে ১২ ঘণ্টা সময় দিতে হবে ক্লিনিকে। কমসেকম সন্তান পিঠে বেঁধে রাস্তার ধারে ইট ভাঙতে হবে। তা হলেই প্রথম আলোর প্রথম পৃষ্ঠায় মহীয়সী নারী হিসেবে তার নাম প্রকাশ পাবে। পুরুষের কাঁধে কাঁধ রেখে কাজ করার কারণে সে হয়ে যাবে অতি উঁচু জাতের স্বনির্ভর নারী। হোয়াট আ গ্রেট আইডিয়া!

নারীরা ঘরে কাজ করবে, এটা কি পুরুষতান্ত্রিক মনোভাব? নাকি গৃহিণীরা বেকার, নিষ্কর্মা, অর্থনৈতিক উন্নয়নে তাদের কোনো অবদান নেই—এগুলোই পুরুষবাদী চিন্তাভাবনা?

আচ্ছা, তুলনা করার সময় আসলে কে প্রধান্য পায়? যাকে তুলনা করা হয়, সে? নাকি যার সাথে তুলনা করা হয়, সে? একজন মূর্খ লোকও জানে—যার সাথে তুলনা দেওয়া হয়, সে-ই ওপরে থাকে। গোলাপের সাথে কাউকে তুলনা করলে গোলাপের সম্মানই বাড়ে। চাঁদের সাথে যাকে তুলনা করা হয়, তার সম্মান চাঁদের নিচেই থাকে। তুমি যখন পুরুষের সাথে তুলনা করে নিজের উন্নতি-প্রগতি মাপছ, তখন আসলে কাকে প্রাধান্য দিচ্ছ? কার কাজকে মানদণ্ড হিসেবে বিবেচনা করছ?

আজ সর্বত্র উন্নতির মাপকাঠি ধরা হচ্ছে পুরুষালি কাজকে। পুরুষরা যেসব কাজে অংশ নেয়, নারীরা ওগুলোতে সুযোগ না পেলেই লঙ্কাকাণ্ড ঘটিয়ে ফেলে

নারীবাদীরা। ভারী ভারী কলামের ঠেলায় পত্রিকার যেন জান যায় যায় অবস্থা। আসলে নারীবাদীরা কথা বলে পুরুষের ভাষায়। 'Male value system' দিয়ে বিচার করে নারীকে। তাই তো আপাদমস্তক একজন রত্নগর্ভা মা-কেও 'আমড়া কাঠের ঢেঁকি' বলে নাক সিকটায় ওরা।

ইসলাম জিডিপি দিয়ে সবকিছু বিচার করে না। ইসলামের মাপকাঠি ভিন্ন। সে পুঁজিবাদের মতো কামুক দৃষ্টিভঙ্গি লালন করে না। ইসলামে মর্যাদার মাপকাঠি হলো তাকওয়া। নারী বা পুরুষ হিসেবে জন্ম নেওয়ার মধ্যে কোনো সম্মান নেই। সম্মান আছে তাকওয়ার মধ্যে রয়েছে। যার তাকওয়া বেশি, সে-ই সম্মানিত।

> "তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে সে-ই অধিক মর্যাদাসম্পন্ন, যে তোমাদের মধ্যে অধিক তাকওয়াবান।"[১৩১]

অর্থই ক্ষমতায়নের একমাত্র মাপকাঠি না। প্রত্যেককে তার স্ব-স্ব কর্মক্ষেত্রে অধিকার পৌঁছে দেওয়াটাই ক্ষমতায়ন। ইসলাম দুজনের ক্ষেত্র আলাদা করে দিয়েছে। আর দুজনার কাজকেই সম্মানিত করেছে। নারীসুলভ কাজ করে নারীরা সম্মানিত, আর পুরুষসুলভ কাজ করে পুরুষ। ইসলামের দৃষ্টিতে দুজনই স্বাবলম্বী। কেউই বেকারত্বের অভিশাপ বয়ে বেড়াচ্ছে না।

আসমা বিনতু ইয়াযিদ ﵂ একবার নবিজিকে বললেন, "আল্লাহর রাসূল, নারীদের পক্ষ থেকে আমি আপনার কাছে এসেছি। আল্লাহ তাআলা আপনাকে নারী ও পুরুষ সবার কাছেই রাসূল হিসেবে প্রেরণ করেছেন। আপনার ওপর ও আপনার প্রতিপালকের ওপর আমরা ঈমান এনেছি। আমরা ঘরের কাজকর্ম আঞ্জাম দিই। সন্তান গর্ভে ধারণ করি। (বিভিন্ন কারণে) আমাদের ওপর পুরুষদের ফজিলত রয়েছে। তারা জামাতের সাথে সালাত আদায় করে। অসুস্থদের দেখতে যায়। জানাযায় অংশগ্রহণ করে। একের-পর-এক হজ করে। সবচেয়ে বড় ফজিলতের ব্যাপার হলো, তারা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করতে পারে। তো আমরা কিভাবে তাদের মতো ফজিলত ও সওয়াব লাভ করতে পারব?"

নবি ﷺ এই মহিলা সাহাবির কথা শুনে বেশ খুশি হলেন। বললেন, "তুমি আমার কথা ভালোভাবে অনুধাবন করো এবং অন্যান্য মহিলাকে একথা জানিয়ে

---

[১৩১] সূরা হুজুরাত : ১৩।

দাও—স্বামীর সাথে সদাচরণ করা, তার সন্তুষ্টি কামনা করা ও তার পছন্দনীয় কাজ করা—(পুরুষদের) ওইসব আমলের সমান সওয়াব ও মর্যাদা রাখে।"[১০২]

সুবহানাল্লাহ! যুদ্ধের ময়দানে লড়াই করার সওয়াব, একজন নারী ঘরে বসেই পাবে। কাকভোরে তাকে ছুটতে হবে না কারখানার দিকে। উদয়াস্ত লেবারগিরি করে গলদঘর্ম হয়ে বাড়ি ফিরতে হবে না। গাধার খাটুনি খাটতে হবে না পুরুষের মতো। বরং, নারীসুলভ কাজই তাকে অফুরন্ত সওয়াব এনে দেবে। একান্ত বাধ্য হওয়া ছাড়া নারী কখনোই জীবিকার জন্যে খাটাখাটনি করবে না। কেননা, রিযিক অন্বেষণের জিম্মাদারী পুরুষের, নারীর নয়। জীবিকার খোঁজে পুরুষ জানপ্রাণ দিয়ে লড়বে, কালঘাম ছোটাবে, হাড়ভাঙা পরিশ্রম করবে। আর নারী মমতার বাঁধনে আগলে রাখবে পুরো পরিবারকে। এইটাই দুজনের জিম্মাদারী। এর জন্যে প্রত্যেককেই জবাবদিহি করতে হবে কিয়ামতের ময়দানে।[১০৩]

সন্তানকে সুসন্তান হিসেবে গড়ে তোলার জন্যে অনেক ধৈর্যের প্রয়োজন হয়। দীর্ঘ সময় ধরে ক্লান্তিকর পরীক্ষা দিতে হয় নারীকে। পাহাড়সম ধৈর্যের মাধ্যমে একজন মা এই পরীক্ষায় সফল হন। এতকিছুর পরও জীবিকার দায়-দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়ে, তার কোমর ভেঙে ফেলাটা ইসলাম পছন্দ করে না। তাই জীবন-জীবিকা, যুদ্ধ, জামাতে সালাত আদায়—এসব ক্ষেত্রে পুরুষের মতো কড়াকড়ি আরোপ করেনি তার ওপর।

ঘর ও বাইরের দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়ে পুঁজিবাদের মতো দ্বিগুণ কাজ আদায় করিয়ে নেওয়ার পক্ষপাতী ইসলাম নয়। পুঁজিবাদ তোমাদের দিয়ে নারীসুলভ কাজগুলোও করাচ্ছে, অন্যদিকে স্বনির্ভরতার সিরিজ দিয়ে শেষ রক্তবিন্দুটুকুও শুষে নিচ্ছে। কেড়ে নিচ্ছে প্রকৃতির দেওয়া স্বভাবসুলভ বৈশিষ্ট্য। ওদিকে আবার সন্তানদের ভবিষ্যৎ মিলিয়ে যাচ্ছে নিকষকালো আঁধারে। একজন মা যখন বাবার সাথে পাল্লা দিয়ে কাজ করতে চলে যাবে, তখন সন্তানের দেখাশোনা কে করবে? কাজের বুয়া আর বাজারি দুধে কি শিশুর সুষ্ঠু বিকাশ হবে? শারীরিক ও মানসিকভাবে একটি শিশু কি পূর্ণাঙ্গ মানুষ হতে পারবে?

বাচ্চারা দুধের জন্যে সম্পূর্ণভাবে মায়ের ওপর নির্ভরশীল। ৬ মাস পর্যন্ত মায়ের দুধই হলো শিশুর একমাত্র খাদ্য। এই দুধে থাকে পর্যাপ্ত পরিমাণ পুষ্টি, ভিটামিন,

---

[১০২] বায়হাকি, শুআবুল ঈমান, ৮৩৬৯।

[১০৩] বুখারি, আস-সহীহ : ৭১৩৮।

প্রোটিন এবং ফ্যাট—যা কিনা শিশুর বিকাশে সহায়তা করে। এন্টিবডি সরবারহ করার মাধ্যমে ভাইরাস ব্যাকটেরিয়ার বিরুদ্ধে শিশুকে শক্তিশালী করে তোলে। যেসব শিশুরা মায়ের দুধ খেয়ে বেড়ে ওঠে, ওদের অ্যাজমা, অ্যালার্জি, ডায়ারিয়া কম হয়।[১০৪] মায়ের দুধ আর যত্নের বিকল্প কিছু নেই। মায়ের বিকল্প কেবল মা। যেসব মা তার সন্তানকে কম সময় দেয়, তাদের সন্তান অযোগ্য ব্যক্তি হিসেবে বেড়ে ওঠে। রাগ, জেদ ও আগ্রাসী মনোভাব ওদের মধ্যে বেশি থাকে।[১০৫]

জিডিপি-তে অবদান রাখতে গিয়ে একটা অপদার্থ প্রজন্ম রেখে যাওয়া কোনোভাবেই কাম্য নয়। পুরো মানবজাতির জন্যে এটা অভিশাপ। নারীর ক্যারিয়ার হলো স্বামী-সন্তান-পরিবার। এর মাধ্যমেই সে পৌঁছে যাবে জান্নাতের উঁচু স্তরে।

> "যে নারী পাঁচ ওয়াক্ত সালাত পড়বে, রমাদানে সাওম রাখবে, লজ্জাস্থানের হেফাজত করবে এবং স্বামীর আনুগত্য করবে—তাকে বলা হবে, যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা হয়, সে দরজা দিয়েই জান্নাতে প্রবেশ করো।"[১০৬]

গর্ভধারণ থেকে নিয়ে সন্তান প্রসব—মানবজাতির ধারা টিকিয়ে রাখতে হলে এগুলোর কোনো বিকল্প নেই। এসব তো কেবল নারীরাই পারে। পুরুষরা আল্লাহর রাস্তায় পাহারা দিয়ে যা অর্জন করবে, নারীরা এগুলোর মাধ্যমেই সমান নেকি পাবে। এমনকি বাচ্চা জন্ম দিয়ে গিয়ে কোনো নারী যদি মারা যায়, সে পাবে শহীদের মর্যাদা।

> "গর্ভধারণ থেকে শুরু করে সন্তান প্রসব ও মাতৃত্বের দায়িত্ব পালন পর্যন্ত একজন নারীর মর্যাদা ও সওয়াব মুরাবিত ব্যক্তির মতো, যে কিনা আল্লাহ রাস্তায় (পাহারারত)। যদি সে (নারী) এই অবস্থায় মারা যায়, তবে তার জন্যে রয়েছে শহীদের সওয়াব।"[১০৭]

---

[১০৪] Human Milk Composition: Nutrients and Bioactive Factors, Olivia Ballard, JD, PhD (candidate) and Ardythe L. Morrow, PhD, MSc [https://bit.ly/2NSYUFy]

[১০৫] First-Year Maternal Employment and Child Development in the First Seven Years: Brooks-Gunn et. al. 2010,[https://bit.ly/3dOOvW8]

[১০৬] আহমাদ, আল-মুসনাদ : ১৬৬১; ইবনু হিব্বান, আস-সহীহ : ৪১৬৩।

[১০৭] হায়সামি, মাজমাউয যাওয়াইদ : ৪/৩০৮; তাবারানি : ১৩৭৪।

ইসলাম সুযোগ দিয়েছে তোমাকে। কম কাজ করেও বেশি সম্মান অর্জনের পথ দেখিয়ে দিয়েছে। পুরুষালি কাজকে সম্মানের মানদণ্ড বানায়নি পুঁজিবাদের মতো। রিযিক অন্বেষণের দায়িত্ব চাপিয়ে দেয়নি তোমার কাঁধে। তবে অযথা কেন দায়িত্বের বোঝা ভারী করবে?

বোন আমার, তোমার হাত ধরেই সংসারের গাঁথুনি মজবুত হয়। তুমিই বুনতে পারো মমতার নকশীকাঁথা। তোমার অনুপ্রেরণা পেয়েই পুরুষরা বিশ্বজয় করে। সন্তান-সন্ততি তোমার স্পর্শেই আলোকিত মানুষ হয়ে গড়ে ওঠে। তো, এইখানে কেন কৃতিত্ব দেখাবে না? কেন তুমি ভালো মা হবার পেছনে সময় দেবে না? কেন ভালো স্ত্রী হয়ে জান্নাতের মর্যাদা বুলন্দ করবে না? কেন সন্তানকে মমতার আদরে ব্যক্তিত্ববান মানুষ হিসেবে গড়ে তুলবে না?

কেন পুরুষের সাথে পাল্লা দিয়ে রাতবিরেতে কাজ করতে হবে তোমাকে? তোমার দক্ষতা কি বসের সামনেই প্রমাণ করতে হবে? কর্পোরেট অফিসে নিজেকে কৃতিত্ব জাহির না করলে নারীত্বের বুঝি খুব অপমান হবে?

পুরুষের সাথে পাল্লা দিয়ে গিয়ে, চরম মাশুল দিচ্ছে নারীরা। জায়গায় জায়গায় ধর্ষিত হচ্ছে। কেবল চাকুরিজীবী নারীই নয়, স্কুল-কলেজ এমনকি ভার্সিটিপড়ুয়া নারীরাও প্রতিদিন ধর্ষণের কবলে পড়ছে। শুধু যদি যুক্তরাষ্ট্রের পরিসংখ্যানটা তোমায় দেখাই, তাতেই বোধ করি মাথা ঘুরিয়ে যাবার জো হবে। প্রতি পাঁচ জনের মধ্যে একজন নারী ধর্ষিত হয় ওখানে। পরিসংখ্যান বলছে, এক-চতুর্থাংশ ধর্ষিতা নারীর বয়স ১০ বছরের নিচে। প্রায় ৪২% নারী জানিয়েছে যে, ১৮ বছর হবার আগেই তারা একবার করে ধর্ষিত হয়েছে।[১৩৮] প্রতি ৭৩ সেকেন্ডে কেউ-না-কেউ যৌন-সহিংসতার শিকার হয় অ্যামেরিকায়। যাদের বেশিরভাগের বয়স ১২-২৪ এর মধ্যে।[১৩৯]

বোন আমার, ওদের কথায় বিভ্রান্ত হয়ে নিজের ধ্বংস ডেকে এনো না। সমানাধিকার তো কেবল একটি মুখোশ। এ মুখোশ পরে দাজ্জালী এজেন্ডা বাস্তবায়নের জন্যে এগোচ্ছে ওরা। ফেমিনিজমের মাধ্যমে পুরুষবর্জিত-

[১৩৮] NISVS 2010 Summary Report - Sexual Violence by any Perpetrator, https://www. nsvrc.org/statistics

[১৩৯] Victims of Sexual Violence: Statistics, https://bit.ly/2YWc6Qq

সমাজ গঠনের পাঁয়তারা চালাচ্ছে। লেসবিয়ানিজমের দিকে ডাকছে কিশোরী-তরুণীদের। পুরুষকে নারীর প্রতিদ্বন্দ্বী বানানোটাই ওদের মূল লক্ষ্য। সেক্স ওয়ারের মাধ্যমে ওরা একজনকে অন্যের প্রতিপক্ষ হিসেবে দাঁড় করাতে চায়। অথচ নারী-পুরুষ একে অন্যের পরিপূরক।

দেখো, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া মিলেই মহাবিশ্ব গঠিত হয়েছে। ক্ষুদ্র একটি রাসায়নিক যৌগও যদি গঠন করতে চাও, তো সেখানে কাউকে দাতা হতে হবে কাউকে গ্রহীতা। কেউ ইলেকট্রন দান করে পজেটিভ আয়নে পরিচিত হবে, কেউ গ্রহণ করে নেগেটিভ। তারপর একে অন্যের ওপর ক্রিয়া করে একটি স্থিতিশীল যৌগ গঠন করবে। হাল চালাতে গেলে জমিকে অবশ্যই লাঙ্গলের চেয়ে নমনীয় হতে হবে। নয়তো ফসল ফলানো অসম্ভব হয়ে পড়বে।

মহাবিশ্ব টিকিয়ে রাখতে হলে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকে স্বাভাবিক মনে করতে হবে। কখনো নারী ক্রিয়া করবে, পুরুষ সে ক্রিয়া সহ্য করবে। আবার কখনো পুরুষ ক্রিয়া করবে, নারী সে ক্রিয়া গ্রহণ করবে।—এভাবেই টিকে থাকবে নিখিল জাহান। এটাই স্রষ্টার নিয়ম। বিজ্ঞানের ভাষায় 'প্রকৃতির নিয়ম'। এই নিয়মের বাইরে গিয়ে দুজন যদি সবক্ষেত্রে ক্রিয়া করতে চায়, তবে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হবে। ধরার বুকে আমরা একে অন্যের সহযোগী। সেই পরিচয় মুছে দিয়ে দুজনকে করে তোলা হচ্ছে প্রতিযোগী। প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলে ধরিত্রী কখনোই স্থিতিশীল হবে না। সাজানো-গোছানো এই ধরণির রূপটাই পাল্টে যাবে।

আচ্ছা, তোমার দৈহিক গঠিন কি অধিক পরিশ্রমের জন্যে উপযোগী?

কায়িকশ্রম তোমাদের জন্যে মোটেও উপযোগী না। প্রকৃতি তোমাদের সেই যোগ্যতা দেয়নি। অত্যধিক শ্রম নারীদের বন্ধ্যা করে ফেলে।[১৪০] কমিয়ে দেয় ডিম্বাণুর সংখ্যা। স্বাভাবিকের চেয়ে প্রায় দশগুণ ডিম্বাণু কমে যায়।[১৪১] অ্যামেরিকান সিভিলিয়ান নারীদের চেয়ে সেনাবাহিনীর নারী সৈন্যরা তিনগুণ বেশি বন্ধ্যাত্বে ভুগছে।[১৪২] দীর্ঘ দিন ধরে উত্তর কোরিয়ার নারী সেনাদের মাসিক বন্ধ হয়ে আছে।[১৪৩] ওদিকে আবার সাহসী নারীরা নিজের অদেখাকে দেখাতে

---

[১৪০] https://bit.ly/38mOYh6

[১৪১] https://cnn.it/3f7hgi0

[১৪২] https://wb.md/2NSFVLu , https://bit.ly/3ijy6we

[১৪৩] https://bbc.in/38pUH5D

গিয়ে জীবনের বারোটা বাজিয়ে ফেলছে। জরায়ু ক্যান্সার, এইডস, পেলভিক পেইন, ব্রেইনে আঘাত-সহ শেষমেশ খদ্দেরের হাতে জীবন বিসর্জন দিয়ে বীরাঙ্গনার তালিকায় নাম লেখাচ্ছে পতিতারা।

বাহ! চমৎকার! এগিয়ে যাও হে উন্মাদ ভগিনী। তোমায় লাল সালাম।

মনে রেখো, নারীসুলভ বৈশিষ্ট্য আগলে রাখাটাই নারীজাতির স্বার্থকতা। জোর করে অন্যের মতো হতে গেলে স্বকীয়তা নষ্ট হয়। হার্মাফ্রোডাইট হওয়া ছাড়া কোনো উপায় থাকে না। পুরুষ হতে চাওয়া নারীর জন্যে অপমানজনক। এর মাধ্যমে প্রমাণিত হয়—নারীত্ব নিয়ে নারীরা হীনম্মন্যতায় ভোগে। কিন্তু সত্যিকারের বীরাঙ্গনা কখনো হীনম্মন্যতায় ভোগে না। নিজের স্বকীয়তা বিকিয়ে দেয় না ক্যারিয়ারের পদতলে। সে মাথা উঁচু করে বলে, আমি নারী।

এখন তুমি বলতে পারো, তবে কি আমি কিছুই করব না? ঘরে বসে বসে চিরকাল কাটিয়ে দেব? অজ্ঞতার অন্ধকারে সাঁতরে বেড়ানোর জন্যে আপনি আমায় অনুপ্রেরণা দিচ্ছেন?

এই তো দিলে আমার সব কথা শেষ করে। আমি কি তাই বলেছি নাকি?

ইসলাম কখনোই তোমাকে মূর্খ দেখতে চায় না। কী নারী, কী পুরুষ—সবার আবশ্যিক দায়িত্ব হলো দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করা। ঈমানের মৌলিক বিষয় ও অত্যাবশ্যকীয় মাসআলা মাসায়েল জানা সবার ওপরেই ফরজ।

> "দ্বীনি জ্ঞান শিক্ষা করা প্রত্যেক নর-নারীর ওপর ফরজ।"[১৪৪]

ইসলাম জ্ঞান শিক্ষাকে যতটা গুরুত্ব দিয়েছে, আর কোনো মতাদর্শই তা দেয়নি। নারী-পুরুষ সবার জন্যেই তা আবশ্যিক দায়িত্ব। নবি ﷺ মহিলাদের জন্যে একটি বিশেষ দিন ধার্য করে দিয়েছিলেন। ওই দিনে মহিলারা নানান বিষয়ের সমাধান জেনে নিত নবিজির কাছ থেকে।[১৪৫]

এরপর এসো দুনিয়াবি জ্ঞানের কথা বলি। সেটাও তুমি অর্জন করতে পারবে। আল্লাহ তাআলার সৃষ্টি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা, সৃষ্টির নানা বৈচিত্র্যতার মধ্যে আল্লাহ তাআলার কুদরত খুঁজে বের করা—এগুলো প্রশংসনীয় কাজ। আসমান

---

[১৪৪] মিশকাত, অধ্যায় : জ্ঞান, হাদীস : ২১৮; আলবানি, সহীহুল জামি' : ৩৯১৩; সহীহ।

[১৪৫] বুখারি, অধ্যায় : জ্ঞান, হাদীস : ১০২

জমিনের মহাবিস্ময় তালাশ করার ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা আমাদের উৎসাহ দিয়েছেন।

> "যে-সমস্ত বুদ্ধিমান লোক উঠতে, বসতে ও শয়নে—সব অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে এবং আকাশ ও পৃথিবীর গঠন নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে, তাদের জন্য রয়েছে বহুতর নিদর্শন। (তারা আপনা-আপনি বলে ওঠে,) আমাদের রব, এসব তুমি অনর্থক ও উদ্দেশ্যবিহীনভাবে সৃষ্টি করোনি। বাজে ও নিরর্থক কাজ করা থেকে তুমি পবিত্র ও মুক্ত। কাজেই হে প্রভু, জাহান্নামের আযাব থেকে আমাদের রক্ষা করো।"[১৪৬]

জ্ঞান আহরণকারীদের জন্যে রয়েছে বিশাল সওয়াব। জ্ঞান অন্বেষণকারীর পথে ফেরেশতারা রহমতের ডানা বিছিয়ে দেয়। আসমান ও জমিনের নানান সৃষ্টিজীব জ্ঞানীর জন্যে ক্ষমাপ্রার্থনা করে। এমনকি জলের মাছ পর্যন্ত দুআ করতে থাকে তাদের জন্যে।[১৪৭] পূর্ণিমারাতে নক্ষত্রের ওপর চাঁদের মর্যাদা যেমন, সাধারণ মানুষদের ওপর জ্ঞানীদের মর্যাদাও ঠিক তেমন।[১৪৮]

জ্ঞানার্জনকে কোথায় অবজ্ঞা করল ইসলাম?

কে তোমাকে অজ্ঞতার অন্ধকারে ঠেলে দিতে চাইছে?

বোন আমার, হাতের কাজ শেষ করে ফেইসবুক না গুঁতিয়ে, বই নিয়ে বসে যাও। পড়ো। জ্ঞান অর্জন করো। ইসলামকে সব সময় পাশেই পাবে। তবে পড়ার অজুহাত দেখিয়ে পুরুষের সাথে ঢলাঢলি করার রেওয়াজটা বাদ দিতে হবে। জ্ঞানার্জনের জন্যে এমন প্রতিষ্ঠানে যেতে হবে, যেটা তোমার জন্যে নিরাপদ। যেখানে তুমি আল্লাহর বিধান মেনে জ্ঞান অর্জন করতে পারবে। জ্ঞানার্জন করাটা আল্লাহর নির্দেশ, আবার পর্দার বিধান মান্য করাটাও আল্লাহর নির্দেশ। তুমি যদি আম্মাজান আয়িশা ﵂-এর মতো পর্দা-সহকারে শিক্ষা দিতে চাও, তবে তাতে কারও আপত্তি নেই। তবে পর্দার বিধান অক্ষরে অক্ষরে মেনে নিতে হবে। এটা মৌলিক ফরজ। এই বিধান অবজ্ঞা করে জ্ঞান শিক্ষা কিংবা বিতরণ—কোনোটাই করতে পারবে না।

---

[১৪৬] সূরা আ ল ইমরান, ০৩ : ১৯১

[১৪৭] তিরমিযি, অধ্যায় : জ্ঞান, হাদীস :

[১৪৮] আবু দাউদ : ৩৬৪১; মিশকাত, অধ্যায় : জ্ঞান, হাদীস : ২১২; সহীহ।

এ তো গেল জ্ঞানের বিষয়। এবার অন্য বিষয়ে বলি। ধরো, তোমার কাছে অনেক টাকা জমে আছে। ওগুলো তুমি কাজে লাগাতে চাও। তো, ঘরে বসেই সেই টাকা বিনিয়োগ করে উদ্যোক্তা হতে পারবে। স্বামীর ব্যবসায় অংশীদার হতে পারবে সেই টাকা দিয়ে। সমস্যা নেই কোনো।

এখানেই শেষ না। আরও বলি শুনো। এমন কিছু ক্ষেত্র আছে, যেখানে নারীর উপস্থিতি আবশ্যক। যেমন ধরো, প্রসবকালীন সময়ে অস্ত্রোপাচারের কথা। কোনো নারীর যদি সিজারিয়ান অপারেশন হয়, তবে সেটা কে করবে? অবশ্যই কোনো মহিলা ডাক্তার। সাহায্যকারী কে থাকবে? অবশ্যই কোনো মহিলা নার্স। এই উদ্দেশ্যে কেউ যদি অস্ত্রোপাচার-বিদ্যার জ্ঞান অর্জন করে, সে অবশ্যই সওয়াব পাবে। মেয়েলি নানান সমস্যার সমাধান দিতে পারার কলাকৌশল শেখাটা অবশ্যই জরুরি। আম্মাজান আয়িশা ؓ নারীদের বিভিন্ন ধরনের সমস্যার সমাধান দিতেন। ফাতিমা ؓ-ও প্রাথমিক চিকিৎসা-সেবার জ্ঞান রাখতেন। রাফীদা ؓ যুদ্ধাহত সাহাবিদের সেবায় নিয়োজিত ছিলেন। বেশ দক্ষ নার্স ছিলেন তিনি।[১৪১]

তা হলে বলো তো, ইসলাম কিভাবে তোমার পায়ে শেকল দিয়ে দিল?

এই মিথ্যা-কথা শিখেছ কার কাছ থেকে?

নারীবাদী পেইজের লেখাগুলো বোধ হয় মাথাটা বিগড়ে দিয়েছে তোমার। ওদের ফাঁকা বুলি শুনেই তুমি ইসলামের ওপর বিরূপ ধারণা করে বসবে? এটা কি কোনো বুদ্ধিমতী নারীর কাজ?

রোকেয়া-রচনাবলী কিংবা ওইম্যান চ্যাপ্টারের কলাম পড়ে ইসলাম শিখতে যেয়ো না। কুরআন হাদীস পড়ো। ওহির জ্ঞান অর্জন করো। আলিমদের লেকচার শুনো। তা হলে নিজেই সত্যিটা বুঝতে পারবে।

আল্লাহর বিধানের মধ্যে থেকে তুমি অনেককিছু করতে পারবে। হালালের সীমানা তোমার জন্যে চিরকাল উন্মুক্ত। এ সীমার ভেতরে তুমি যতদূর চাও, হাঁটতে পারবে। সমস্যা নেই। কেউ বাধা দেবে না। তবে পুরুষের কাঁধে কাঁধ রেখে জিডিপিতে অবদান রাখার ভূত মাথা থেকে নামাতে হবে। ওটার অনুমোদন কোনো সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষ দিতে পারে না। তুমি নারীর কাঁধে কাঁধ রাখো।

[১৪১] ইবরাহীম আলি, সীরাতুন নবি, ৩/৫৯

নারীসুলভ কাজগুলো মনপ্রাণ দিয়ে করো। ব্যস, এটাই তোমার সীমা। ভুলেও পুঁজিপতিদের পাতানো ফাঁদে পা দিয়ে, নিজের সর্বনাশ ডেকে এনো না।

লজ্জা ঈমানের অঙ্গ

আমি জানি তুমি সৌন্দর্যপিয়াসী। সুন্দর জিনিস ভালো লাগে তোমার কাছে। তাই তো নিজেকে সাজিয়ে রাখতে পছন্দ করো। সময় পেলেই মেহেদি মাখো হাতে। কাজলকালো চোখে নিজের চেহারা আয়নায় দেখো বারবার। সুন্দর জামা পরলে তোমায় কেমন লাগে, সেটা জানার জন্যে ব্যকুল হয়ে যাও। আচ্ছা, ফিটফাট জামা পরলেই কি মানুষ সুন্দর হয়? মানুষের সৌন্দর্য কি কেবল মেইক আপের মাধ্যমেই ফুটে ওঠে?

> "নির্লজ্জতা ও অশ্লীলতা বস্তুকে কুশ্রী করে তোলে। আর লজ্জা বস্তুর সৌন্দর্য বাড়িয়ে দেয়।"[১৫০]

আসলে লজ্জাই হলো সৌন্দর্যের মূলমন্ত্র। এর বাইরে গিয়ে তুমি যতই অপরূপ রূপে সাজো না কেন, লাভ নেই। সবার আগে দরকার লজ্জা। লজ্জা সচ্চরিত্রের মৌলিক বৈশিষ্ট্য ঈমানের নিদর্শন। লজ্জার মধ্য দিয়েই আত্মসম্মান ফুটে ওঠে। এটি সেই সূক্ষ্ম অনুভূতি, যা মানুষের চরিত্রের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। যাকে এই গুণ থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে, সে সকল কল্যাণ থেকে বঞ্চিত। আর যাকে এর দ্বারা সম্মানিত করা হয়েছে, সে-ই পরিপূর্ণ কল্যাণ দ্বারা অলঙ্কৃত।

---

[১৫০] তিরমিযি, আস-সুনান, ১৯৭৪; হাসান গরীব।

> "লজ্জা ঈমানের অঙ্গ, আর ঈমানের জায়গা হলো জান্নাত। নির্লজ্জতা ও অসভ্যতা হচ্ছে নিকৃষ্ট আচরণের অঙ্গ, আর নিকৃষ্ট আচরণের স্থান হলো জাহান্নাম।"[১৫১]

লজ্জা এখন তোমার কাছে গুরুত্বহীন। জীবন থেকে প্রায় নির্বাসিত। উশৃঙ্খল জীবন-যাপন তোমাকে আরও বেপরোয়া করে তুলেছে। দিনকে-দিন তুমি ইসলামবিমুখ হয়ে যাচ্ছ। আগে তো কিছুটা লাজ-সরমের ধার ধারতে, কিন্তু ইদানীং সব যেন কই হারিয়ে গেছে। আগে দেখতাম রাস্তায় বেরোলে মাথা ঢেকে নিতে, পুরুষমানুষ দেখলে মাথা নিচু করে পথ চলতে। আর এখন? এখন তো ভার্সিটির মোড়ে তোমাকে ছেলেবন্ধুর সাথে আড্ডারত অবস্থায় পাওয়া যায়। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের দিন নানান অশ্লীলতায় জড়াতেও তোমার বুক কাঁপে না। বোটানিক্যাল গার্ডেনে ছেলেদের সাথে গা ঘেঁসে বসতে মজা পাও তুমি। পহেলা ফাল্গুনে বাসন্তী শাড়ী পরে রিক্সায় ঘুরে বেড়াও বয়ফ্রেন্ডকে পাশে বসিয়ে। কক্সবাজার ট্যুরে গিয়ে ছেলেমেয়েরা একই রুমে রাত্রিযাপন করো। কেন এতটা অধঃপতন হয়ে গেল তোমার?

> "নিশ্চয় তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তী (ইহুদী ও নাসারা)দের আচার-আচরণ বিঘতে বিঘতে এবং গজে গজে অনুসরণ করবে। এমনকি তারা যদি গুইসাপের গর্তে ঢুকে, তবে তোমরাও তাতে ঢুকবে।"[১৫২]

তোমার বিচ্যুতির আসল কারণ পাশ্চাত্যের প্রতি ঝোঁক। তাদেরকে তুমি পদে পদে অনুসরণ করে চলো। ওরা যদি ফ্রি-মিক্সিংকে আধুনিকতা বলে, তবে তুমি তাতে পুরোপুরি সায় দাও। ওরা যদি খোলামেলা পোশাককে ভদ্রতা আখ্যা দেয়, তুমিও সেটা মেনে নাও চোখবুজে। ওদের আচার-আচরণকে এতটাই অন্ধভাবে অনুকরণ করো যে, পশ্চিমারা গুইসাপের গর্তে ঢুকে পড়লে তুমিও তাতে ঢোকার আপ্রাণ চেষ্টা চালাবে।

তোমার এই শোচনীয় অবস্থা দেখে প্রচণ্ড দুঃখ হয় আমার। তুমি এমন আঁটসাট পোশাক পরো, যার মাধ্যমে দেহের সবকিছু প্রকাশিত হয়ে যায়। নিজের সৌন্দর্যের দুষ্ট মায়াজালে আকর্ষিত করো শত যুবককে। অন্যরকম আকর্ষণ খুঁজে পাওয়া যায় তোমার কথাবার্তায় এবং চালচলনে, সাজগোজে এবং চোখের

---

[১৫১] তিরমিযি, আস-সুনান, ২০০০; হাসান সহীহ।
[১৫২] বুখারি, ৬৮২১।

পলকে। কিন্তু তোমার একটুও লজ্জা করে না। নিজের সবটা অন্যের সামনে প্রকাশিত হয়ে পড়ার পরও লজ্জায় লাল হয় না তোমার মুখ।

প্রিয় বোন, রাগ কোরো না। কথাগুলো ব্যথিত হৃদয়ের নীরব কান্নার বহিঃপ্রকাশ। আমি এইটুকুই আশা করতে পারি যে, কথাগুলো তোমার কান অব্দি পৌঁছোবে। তোমার হৃদয়ের দরজায় কড়া নাড়বে। স্থান করে নেবে অন্তরের গহীন কুঠুরিতে। কথাগুলো নিঃসৃত হয়েছে এমন হৃদয় থেকে, যেখানে রয়েছে তোমার জন্যে কল্যাণকামিতা। কথাগুলো বলছে এমন একজন ভাই, যে তোমার অধঃপতন দেখে কেঁদেছে। যে দেখতে পাচ্ছে ধীরে ধীরে তোমার অন্ধকারে হারিয়ে যাওয়ার লোমহর্ষক দৃশ্য। দেখতে পাচ্ছে তোমার নৈতিকতার চরম অবক্ষয়। যে দূর থেকে কাফিরদের চক্রান্তের জালে তোমাকে ধীরে ধীরে হারিয়ে যেতে দেখছে। এতকিছুর পরেও সে কি তোমাকে সতর্ক করবে না? চারপাশে চলমান চক্রান্ত সম্পর্কে তোমায় অবগত করবে না?

বোন আমার, আমার কথাগুলো মোটেও নতুন নয়। এগুলো তোমার জন্যে রিমাইন্ডার। হতে পারে আল্লাহ তাআলা এর ওসিলায় তোমাকে উপকৃত করবেন। হয়তো এর দ্বারা তোমার হৃদয়টা প্রশান্ত হবে। হতে পারে এই কথাগুলো তোমার ওপর ভালো প্রভাব ফেলবে। আমি মিনতি করছি তোমার কাছে। মিনতি করছি তোমার চেতনার কাছে, তোমার দ্বীনি মূল্যবোধের কাছে। মিনতি করছি তোমার নির্মল ফিতরাতের কাছে, যা আল্লাহ তাআলা তোমাকে দিয়েছেন। আমি কড়া নাড়ছি তোমার লজ্জার অনুভূতির দোরগোড়ায়। তুমি কি এই ভাইয়ের ডাকে সাড়া দেবে না?

তুমি তো জানো, পরকালে মুক্তি পাওয়ার জন্যে ইসলামি বিধিবিধানের কোনো বিকল্প নেই। জান্নাত পেতে চাইলে অবশ্যই আল্লাহর হুকুম অনুসরণ করতে হবে। দ্বীনের ওপর দৃঢ় থাকা ছাড়া আখিরাতে নাজাত পাওয়া যাবে না। এ কারণেই ইসলামের শত্রুরা যখন মুসলিমদের অবিচলতা দেখতে পায়, তখন ফন্দি আঁটে। ইসলাম থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়ার জন্যে পাঁয়তারা করে। তারা আমাদের মূল্যবোধকে ধ্বংস করতে এবং লজ্জাকে ছিনিয়ে নিতে চায়। তারা ওই সকল নৈতিকতাকে নষ্ট করে দিতে চায়, যা উম্মাহকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করবে। অথচ এগুলো ধরে রাখা আমাদের জন্যে ফরজ।

ওরা এমন সব ইন্দ্রজালে তোমায় ফাঁসিয়ে দেবে যে, টেরও পাবে না। এমন এমন উপকরণ ওরা নিয়ে আসবে, যেগুলো আপাতঃদৃষ্টিতে আকর্ষণীয়, লোভনীয়। কিন্তু ভেতরে ভেতরে লুকিয়ে আছে ধ্বংসাত্মক সব উপাদান। বিভিন্ন বিজ্ঞাপন, ম্যাগাজিন, বিলবোর্ড এবং মনোহর স্লোগানের মাধ্যমে ওরা ঈমানবিধ্বংসী চিন্তা-চেতনা ছড়িয়ে দেবে তোমার মাঝে। তারা কখনোই সরাসরি ইসলাম ছেড়ে দিতে বলবে না। 'দেখিয়ে দাও অদেখা তোমায়', 'কাছে আসার সাহসী গল্প', 'জাগো নারী জাগো বহ্নিশিখা', 'ওইম্যান চ্যাপ্টার'—এসব মুখরোচক উপাদান নিয়ে আসবে তোমার সামনে।

তোমার কাছে তোমার শত্রুরা যা চাচ্ছে, তা অত্যন্ত মূল্যবান। তারা ধ্বংস করে দিতে চায় তোমার দ্বীন, তোমার আত্মমর্যাদাবোধ। লজ্জার গুণকে মাটিতে মিশিয়ে দিতে চায় ওরা। অথচ এর মাধ্যমেই আভিজাত্য প্রকাশ পায়। তারা চায়, তুমি তাদের সমাজের মেয়েদের মতো নির্লজ্জ এবং মূল্যহীন হয়ে যাও। তারা তোমাকে নগ্নতার দিকে আহ্বান করে। অশ্লীলতার দাওয়াত দিয়ে যায় প্রতিনিয়ত। ওদের মূল ইন্ধনদাতা হলো শয়তান। আর শয়তানি মিশনের অন্যতম হাতিয়ার হলো নির্লজ্জতা।

> "নারী হলো পর্দাবৃত থাকার মানুষ। সে যখন পর্দা থেকে বের হয়ে আসে, তখন শয়তান তার দিকে খারাপ নজরে উঁকি দেয়।"[১৫৩]

বোন আমার, তুমি কি জাহিলিয়াতের এসব ধ্যানধারণাকে ছুড়ে ফেলবে না? তুমি কি আত্মসম্মান এবং দৃঢ়তা নিয়ে বলবে না—'আমি আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের আদেশ ছাড়া অন্য কোনো কিছুই গ্রহণ করব না?"

তারা আমাদের চারপাশে ষড়যন্ত্রের-পর-ষড়যন্ত্র করছে। নীলনকশা বানাচ্ছে। চোরাগুপ্তা হামলার জন্যে প্রস্তুতি নিচ্ছে। তাদেরকে যদি তুমি সুযোগ করে দাও, তবে অনায়াশেই ওরা প্রবেশ করবে তোমার ঈমানি দুর্গে। এরপর সবকিছু তছনছ করে দেবে। তাদের মোকাবিলায় তুমি সুউচ্চ পাহাড়ের মতো দাঁড়াও। ঈমান-বিধ্বংসী পশ্চিমা ঘূর্ণিঝড়ের বিপরীতে নৈতিকতা এবং লজ্জা দিয়ে সিসাঢালা প্রাচীর তৈরি করে নাও।

---

[১৫৩] ইবনু খুযাইমা, আস-সহীহ, ১৬৮৫।

আচ্ছা, হারাম জিনিসকে অন্তর দিয়ে ঘৃণা করা কি ঈমানের সর্বশেষ পর্যায় না? হারাম জিনিস দেখে পুলকিত হওয়া, খোলামেলা জামাকাপড় পরা, যিনার সম্পর্কে জড়িত থাকা, বিজাতীয়দের অন্ধ অনুকরণ করা—এসব জিনিস কি হারাম নয়? তুমি কি এগুলোকে ঘৃণা করো? মোটেও না। বরং অন্তর থেকে এসবকে ভালোবেসে ফেলছ! পাপকাজে দিনদিন অভ্যস্ত হয়ে যাচ্ছ! তোমার ঈমান কি সত্যিই অবশিষ্ট আছে? নাকি ওটাও মেসেঞ্জারে কাউকে ফরওয়ার্ড করে দিয়েছ?

তুমি টেরও পাওনি, তোমার কত উত্তম বৈশিষ্ট্যের কবর রচিত হয়েছে। বারবার অভিনেতা-অভিনেত্রীদের খোলামেলা দৃশ্য দেখতে দেখতে তোমার হৃদয়ে যে কত প্রবৃত্তি গজিয়ে উঠেছে, তা কি তুমি জানো? হিন্দি সিরিয়াল, হলিউডের মুভি, রিয়ালিটি শো—এসব দেখে দেখে তোমার নৈতিকতার যে কতটা অধঃপতন হয়েছে, তা একটিবারও ভেবে দেখোনি। আজকালকার শিশুরাও তোমাদের দেখে দেখে প্রভাবিত হচ্ছে। নায়ক নায়িকার যৌনদৃশ্যে অভিনয়কে তারা খুব স্বাভাবিক ব্যাপার ধরে নিয়েছ। টিভি থেকে ওরা যৌনশিক্ষা নিচ্ছে আর বাস্তবে প্রয়োগ করছে সেগুলো। এই তো, গেল বছর দুজন শিশু ছাদে উঠে... নাহ, বলতেই ঘেন্না লাগছে।

বিশ্বাস করো, আমার অন্তর ব্যথিত হয়ে ওঠে যখন তোমাকে খোলামেলা পোশাকে বাইরে যেতে দেখি। তুমি তো আল্লাহকে রব হিসেবে, ইসলামকে দ্বীন হিসেবে এবং মুহাম্মাদ ﷺ-কে নবি হিসেবে স্বীকৃতি দাও। এরপরেও কেন এসব করো? তুমি কি দেখোনি, কত নষ্ট ছেলে তার খাহেশাত পূরণ করার জন্যে তোমার পেছনে ঘুরঘুর করছে? তোমার পোশাক-আশাক তিরের মতো পুরুষের অন্তরকে আঘাত করে! আর সে প্রলোভিত হয়ে অন্যরকম আকর্ষণ বোধ করতে থাকে। আমি তোমাকে অনুনয় করে জিজ্ঞেস করছি, তোমার রব কি তোমার এই নির্লজ্জ চালচলনে সন্তুষ্ট হবেন?

"জাহিলি যুগের মতো নিজেদের প্রদর্শন করবে না।"[১৫৪]

কক্ষনো না। আল্লাহ কখনোই এমন বান্দার প্রতি সন্তুষ্ট হন না, যে তাঁর বিধান লঙ্ঘন করে। পর্দা না করে তুমি আল্লাহর বিধান অবজ্ঞা করেছ। জাহিলি যুগের নারীদের মতো পরপুরুষকে আকৃষ্ট করেছ নিজের দিকে। হাজারও যুবকের

[১৫৪] সূরা আহযাব : ৩৩ আয়াত।

অন্তরে জাগিয়েছ যৌনতার নেশা।

প্রিয় বোন, লজ্জা হলো চরিত্রের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। একজন মুসলিম নারী সব সময়ই লজ্জার ভূষণ আঁকড়ে ধরে থাকে। কারণ, ঈমানের বিশেষ একটি শাখা হলো লজ্জা। লজ্জা ছাড়া ঈমান কখনো পূর্ণতা পায় না। আল্লাহর কসম, লজ্জা যখন হারিয়ে যায় তখন আর কোনো কল্যাণ বাকি থাকে না।

> "ঈমানের সত্তরটিরও বেশি শাখা রয়েছে।... আর লজ্জা ঈমানের একটি বিশেষ শাখা।"[১২৫]

এসো, তোমায় লজ্জাশীলতার গুণ দেখাই। একজন নারীকে কিভাবে লজ্জার ভূষণ আঁকড়ে ধরতে হয়, তার একটা বাস্তব উদাহরণ দিই। উম্মুল মুমিনীন আয়িশা ﵂-এর লজ্জাশীলতার অনুপম দৃষ্টান্ত দেখো।

আল্লাহর রাসূল ﷺ যখন মারা যান, তখন তাঁকে আয়িশা ﵂-এর ঘরেই দাফন করা হয়। এরপর মুসলিমদের খলিফা হন আয়িশার পিতা আবু বকর ﵁। একসময় আবু বকরও দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে চলে যান মহান রবের কাছে। আবু বকরকে রাসূল ﷺ-এর পাশেই দাফন করা হয়। এরপর মুসলিমদের খলিফা হন উমর ইবনুল খাত্তাব ﵁। হায়াত শেষ হলে উমরকেও আল্লাহ তাআলা নিয়ে যান দুনিয়া থেকে। উমরের মৃত্যুর পর তাঁকেও আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর পাশে দাফন করা হয়। যেদিন থেকে উমরকে আয়িশার ঘরে দাফন করা হয়, সেদিন থেকেই উম্মুল মুমিনীন আয়িশা ﵂ সতর্ক হয়ে যান। তিনি বলেন, 'ইতিপূর্বে আমি আমার কক্ষে কাপড় খুলতে লজ্জাবোধ করতাম না। কেননা এখানে আমার স্বামী আর বাবার কবর ছিল। কিন্তু উমরকে আমার কক্ষে দাফন করার পর থেকে আমি কখনোই এই ঘরে কাপড় খুলিনি। এই ঘরে উমরের কবর আছে—এই লজ্জায় সব সময় শরীরের সাথে কাপড়কে শক্ত করে বেঁধে রাখতাম!'[১২৬]

সুবহানাল্লাহ! দেখো, মুমিনদের মা আয়িশার লজ্জাশীলতার গুণ দেখো। আয়িশা ﵂ মৃতব্যক্তির সামনে নিজেকে উন্মুক্ত করতে লজ্জাবোধ করতেন! আর আয়িশার সন্তানরা আজ জীবিতদের সামনে খোলামেলা পোশাকে চলাফেরা করছে! উমরের মতো দ্বীনদার, তাকওয়াবান ও মহাপবিত্র ব্যক্তির কবর দেখে

---

[১২৫] মুসলিম, আবুল হোসাইন ইবনুল হাজ্জাজ, আস-সহীহ, অধ্যায় : ঈমান, হাদীস : ৬০।
[১২৬] আহমাদ, আল-মুসনাদ, হাদীস : ২৫৬৬০; সহীহ।

আয়িশা ﷺ পর্দা করতেন। আর তুমি বেদ্বীন, বেহায়া ছেলেদের সামনে নিজের সবটা খুলে দিতেও লজ্জা পাও না! ছিঃ, কতটা নিচে নেমে গেছ তুমি। কতটা অধঃপতন হয়েছে তোমার। কিয়ামতের দিন কোন মুখ নিয়ে আয়িশাদের কাতারে দাঁড়াবে?

একবার উম্মু খাল্লাদ ﷺ নামের এক মহিলা সাহাবি দৌড়ে এলেন আল্লাহর রাসূলের কাছে। তাঁর সন্তানকে শহীদ করে দেওয়া হয়েছিল। সন্তানের মৃত্যুর ব্যাপারে জানার জন্যে তিনি এসেছিলেন। তাঁর মুখমণ্ডল-সহ পুরো দেহ ঢাকা ছিল। তাই দেখে কেউ কেউ বলে উঠল, 'তুমি চেহারা ঢেকে নিজের ছেলের কথা জিজ্ঞেস করতে এসেছ?'

উম্মু খাল্লাদ ﷺ তখন জবাব দিলেন, 'ছেলে হারিয়েছি, কিন্তু লজ্জা হারাইনি।'[১৫৭]

সুবহানাল্লাহ! দেখো, লজ্জাশীলতা কাকে বলে? সন্তান হারানো একজন মা তীব্র কষ্টের সময়েও লজ্জার কথা ভুলে যাননি। বেপর্দা অবস্থায় বাইরে বেরোননি। সন্তান হারানোর যন্ত্রণা এই মায়ের অন্তরে ঠিকই জ্বলছে দাউদাউ করে। তবুও নির্লজ্জের মতো খোলামেলা পোশাকে দৌড়ে চলে আসেননি। এই মহিলা যদি তীব্র কষ্টের সময়েও লজ্জার গুণ আঁকড়ে ধরতে পারে, তবে তুমি স্বাভাবিক অবস্থাতেও সেটা পারবে না কেন? কবে থেকে তোমার চিন্তা-চেতনা এতটা নীচু হয়ে গেছে?

তুমি কি সারাহ'র ঘটনা শোনোনি? এসো, আমি তোমাকে সেই লজ্জাশীলা নারীর ঘটনা শোনাই।

ইবরাহীম ﷺ-এর স্ত্রী ছিলেন সারাহ। তাঁরা দুজনে মিলে হিজরত করেন। সফর করতে করতে পৌঁছে যান এক অচেনা রাজ্যে। ওই রাজ্যের রাজা ছিল খুবই অত্যাচারী। সে যখন তাঁদের আগমনের কথা জানতে পারে, তখন সারাহকে নিয়ে ফন্দি আঁটে।

সারাহ'র সাথে কথা বলার জন্যে তাঁকে প্রাসাদে ডেকে পাঠায়। নির্জন কক্ষে রাজা তাঁর সাথে কথা বলতে শুরু করে। এক পর্যায়ে সে সারাহ'র কাছাকাছি চলে আসে। সারাহ তখন ওজু করার অনুমতি চান। অনুমতি দেওয়া হয়। তিনি

[১৫৭] আবু দাউদ, আস-সুনান, ২৪৮৮।

ওজু করে সালাতে দাঁড়িয়ে যান এবং দুআ করেন। বলেন, 'আল্লাহ গো, আমি তোমার ওপর ও তোমার রাসূলের ওপর ঈমান এনেছি। আর আমার লজ্জাস্থান স্বামী ব্যতীত অন্য কাউকে ব্যবহার করতে দিইনি। তুমি এই কাফিরকে আমার ওপর ক্ষমতাবান কোরো না।'

সারাহ কেঁদে কেঁদে এই দুআ করছিলেন। এমন সময় বাদশাহ অজ্ঞান হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। তখন সারাহ বলে ওঠেন, 'আল্লাহ গো, লোকটি যদি মারা যায় তবে মানুষজন বলবে আমি একে হত্যা করেছি। (তুমি এর জ্ঞান ফিরিয়ে দাও)।'

এরপর রাজা জ্ঞান ফিরে পায়। সে আবারও সারাহ'র দিকে অগ্রসর হয়ে চায়। কিন্তু যখনই আগ বাড়ায়, তখনই অজ্ঞান হয়ে যায়। দু-তিনবার এমনটা হয়। এরপর রাজা যখন জ্ঞান ফিরে পায়, তখন সে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে যায়। তারপর সে সারাহকে ফেরত পাঠিয়ে দেয় ইবরাহীম ﷺ-এর কাছে। এভাবেই অত্যাচারী রাজার হাত থেকে মুক্তি পান সারাহ।[১২৮]

সারাহ ﷺ এমন এক মহীয়সী নারী ছিলেন, যিনি তার লজ্জাস্থানকে হেফাজত করেছেন। নিজের স্বামী ছাড়া অন্যকারও জন্য সেটিকে উন্মুক্ত করে দেননি। তাই তো আল্লাহর পক্ষ থেকে গায়েবি মদদ চলে এসেছিল তাঁকে রক্ষা করার জন্যে।

দেখেছ, একজন পরহেজগার নারীর কী ফজিলত? অত্যাচারী রাজাও কুপোকাত হয়ে যায় পুণ্যবতী রমণীর সামনে। তুমি কি এমন মহীয়সী নারী হতে চাও না? উম্মু খাল্লাদ, আয়িশা কিংবা সারাহ'র মতো হওয়ার ইচ্ছে জাগে না?

তোমার আর তাঁদের মধ্যে কতই না পার্থক্য। তাঁরা আল্লাহর আদেশ অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলতেন, নিজের পর্দা এবং লজ্জার হেফাজত করতেন। আর তুমি আল্লাহর শত্রুদের অনুসরণ করো অক্ষরে অক্ষরে! তাঁরা লজ্জাশীলতা আর পর্দাকে দ্বীনদারিতার অংশ মনে করতেন, আর তুমি এসবকে সেকেলে ভাবো। পর্দা হলো তোমার কাছে পশ্চাৎপদতা! একজন মুসলিম নারী হিসেবে এরচেয়ে লজ্জাজনক বিষয় আর কী হতে পারে!

বোন আমার, তোমার অন্তর কি পাশ্চাত্যের দিকে ঝুঁকে আছে? নাকি বলিউডের নর্তকীরাই তোমার আদর্শ? কেন লেডি গাগা কিংবা কারিনার মতো

---

[১২৮] বুখারি, ২২১৭।

পোশাক পরার ইচ্ছে জাগবে? এরা কে? এরা কি কেউ তোমার আদর্শ? এরা কি মুসলিম? কাফিরদের চালচলন কবে থেকে তোমার এত প্রিয় হয়ে গেল! ইদানীং তুমি যেসব জামাকাপড় পরো, সেগুলোর বেশিরভাগই পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণে বানানো। নয়তো হিন্দুস্থানের মুশরিকদের থেকে ধার করা। আল্লাহর ওয়াস্তে সতর্ক হও। ওরা তোমার দ্বীনের শত্রু। তোমার পরকাল বরবাদ করে দেবার জন্যেই ওদের এত এত মিশন।

আজকাল নির্লজ্জ ম্যাগাজিনে, ঘৃণ্য ফ্যাশনে, অশ্লীল টেলিভিশন সিরিয়ালে মুসলিম নারীদের চেহারা দেখা যায়। অথচ এগুলোর মূল লক্ষ্যই হলো অশ্লীলতার দিকে মানুষকে আহ্বান করা। তুমি এগুলোর দিকেই বেশি ঝুঁকে পড়ছ। প্রণয়-কবিতা, রোমান্স, হাস্যকর কথাবার্তা মুখস্থে ব্যস্ত দিন পার করো। অথচ কুরআন মাজীদের একটি আয়াত মুখস্থ করতে মন টানে না তোমার। নবিজির একটি হাদীস উল্টিয়ে দেখতে চাও না। অথচ নারীবাদী ম্যাগাজিন পুরোটাই এক বৈঠকেই পড়ে শেষ করো।

ঠিক এটাই ইসলামের শত্রুরা চায়। তারা চায় আমাদের তরুণ প্রজন্মকে আল্লাহবিমুখ করে দিতে। রবের কালাম এবং প্রিয় রাসূলের সুন্নাহ থেকে আমাদের গাফিল করে দিতে। কারণ, আমরা যদি দ্বীনকে পরিপূর্ণরূপে আঁকড়ে ধরি, তবে ওরা নির্ঘাত পরাজিত হবে। ওদের অহমিকা ধুলোয় মিশে যাবে। পৃথিবীতে আমরাই হব বিজয়ী শক্তি। তাই ওরা আমাদেরকে দ্বীন থেকে দূরে রাখতে চায়। আমাদের কাছ থেকে দ্বীন ইসলামের স্বভাব-চরিত্র কেড়ে নিতে চায়।

> "প্রতিটি দ্বীনের একই স্বভাব আছে, আর ইসলামের স্বভাব হলো লজ্জা।"[১২৯]

ওদের নষ্ট চিন্তা-চেতনা আমাদের ধ্যানধারণাকে প্রভাবিত করেছে দারুণভাবে। পাল্টে যাচ্ছে আমাদের নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি। পর্দার মতো ফরজ বিধানকে বলা হচ্ছে 'পিতৃতন্ত্রের খড়গ'। বোরখাকে মনে করা হচ্ছে পাহাড়সম ভারী বোঝা। জিলবাব-খিমার হয়ে গেছে মধ্যযুগীয় পোশাক। আজকাল তো গুরুত্বহীন জিনিসই অধিক গুরুত্বের সাথে দেখা হচ্ছে। বেশিরভাগ মুসলিম নারীই তুচ্ছ জিনিস নিয়ে ব্যস্ত। কেউ কেউ আয়নার সামনে ঘণ্টার-পর-ঘণ্টা সময় ব্যয়

---

[১২৯] মালিক ইবনু আনাস, আল-মুওয়াত্তা, : ৯।

করে। অথচ খুশুখুজু নিয়ে সালাত পড়ার ইচ্ছে জাগে না। কাঁকের মতো ঠোকর দিয়ে দিয়ে বিদ্যুৎ গতিতে সালাত শেষ করে। কেউ কেউ তো আবার গীবত, পরনিন্দায় মেতে থাকে সারাক্ষণ। অন্যের ছোট ছোট ভুলগুলো সামনে এনে মানুষকে হেয় করে তারা। খোশগল্পের আড়ালে অন্যের সম্মান নষ্ট করা হয়। দোষচর্চা করা হয়।

> "খবরদার! তোমরা অবশ্যই অনুমান করা থেকে বিরত থাকবে। কারণ অনুমানই সবচেয়ে বড় মিথ্যা। আর তোমরা একে অপরের গোপনীয় বিষয় জানার চেষ্টা করবে না, গোপন দোষ অনুসন্ধান করবে না, পরস্পরে হিংসা করবে না, পরস্পরের সাথে বিদ্বেষে লিপ্ত হবে না এবং একে অন্যের সাথে শত্রুতা ও সম্পর্কচ্ছেদ করবে না।"[১৬০]

বোন আমার, জায়োনিস্টদের ধ্যানধারণার অন্ধ অনুসরণ করে চরিত্রহীনা নারীতে পরিণত হোয়ো না। যারা দ্বীনদারিতা এবং লজ্জাশীলতাকে তুচ্ছজ্ঞান করে, তাদেরকে ত্যাগ করো। তাদের অনুসরণ কোরো না, যারা ধ্বংসের দিকে আহ্বান করে। তোমার নিজস্ব সম্মান এবং স্বাধীন ব্যক্তিত্ব আছে। আর এ কারণেই তুমি মুসলিম। যদি কাউকে অনুসরণ করতেই চাও, তবে খাদিজা, আয়িশা, উম্মু সালামাকে বেছে নাও। কেনো মহিলা সাহাবিকে উদাহরণ হিসেবে গ্রহণ করো, যাঁরা ছিলেন পবিত্রা এবং সম্মানিতা। তাঁদের পদাঙ্কই তো তোমার জন্যে অনুসরণীয়। তাঁদের জীবনীই তোমার চলার পথের পাথেয়।

আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি, তোমার বেপর্দা চলাফেরা দেখে অন্তরাত্মা কেঁদে ওঠে। আমি যারপরানাই বিস্মিত হই, যখন তুমি পরপুরুষের সাথে খিলখিল করে হাসো। তুমি যখন খোলামেলা পোশাকে বাইরে বেরোও, তখন ফেরেশতারা পর্যন্ত লজ্জায় চেহারা লুকিয়ে ফেলে। কিন্তু তোমার কাছে এটা কিছুই মনে হয় না। বোন আমার, অন্তত এই পবিত্র ফেরেশতাদেরকে একটু সম্মান করো।

> 'তোমাদের সাথে এমন কিছু সত্তা আছেন যাঁরা প্রস্রাব পায়খানা এবং স্ত্রীর সাথে মেলামেশার সময় ছাড়া কখনোই তোমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয় না। সুতরাং তাদের লজ্জা করবে এবং সম্মান করবে।"[১৬১]

---

[১৬০] বুখারি, ২২৫৩; মুসলিম, ২০০১।

[১৬১] তিরমিযি, আস-সুনান, ২৮০০।

এখনি সময় পদক্ষেপ নেওয়ার এবং সঠিক কাজটা করার। পশ্চিমাদের কানপড়া থেকে নিজেকে হেফাজত করো। হৃদয় দিয়ে দ্বীন ইসলামকে অনুভব করার চেষ্টা চালিয়ে যাও। তোমার রবের প্রেরিত কিতাবকে আপন করে নাও। কুরআন-সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরে শত্রুর সকল চক্রান্ত তাদের মুখের ওপর ছুড়ে মারো। যেন রাগে ক্ষোভে তাদের দম বন্ধ হয়ে যায়।

চাঁদের হাসির বাঁধ ভেঙেছে

উপন্যাস-গল্প-কাব্যে অন্যতম অনুষঙ্গ হলো চাঁদ। চাঁদকে নিয়ে লেখা হয়েছে অগণিত কবিতা, গান। প্রায়শই চাঁদের সাথে তুলনা দেওয়া হয় প্রিয় মানুষটিকে। নবি ﷺ-কে চাঁদের সাথে তুলনা করে নজরুল লিখেছেন,

(ওরে) ও চাঁদ! উদয় হলি কোন জোছনা দিতে!

(দেয়) অনেক বেশি আলো আমার নবির পেশানীতে

(ওরে) রবি! আলোক দিস যতো তুই দগ্ধ করিস ততো,

আমার নবি স্নিগ্ধ শীতল কোটি চাঁদের মতো।[১৬২]

আবার চাঁদের প্রেমে মুগ্ধ হয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন,

চাঁদের হাসির বাঁধ ভেঙেছে, উছলে পড়ে আলো।

ও রজনীগন্ধা, তোমার গন্ধসুধা ঢালো।

পাগল হাওয়া বুঝতে নারে, ডাক পড়েছে কোথায় তারে—

ফুলের বনে যার পাশে যায় তারেই লাগে ভালো।[১৬৩]

---

[১৬২] নজরুল-রচনাবলী, বাংলা একাডেমি সম্পাদিত, ৭/৯১।

[১৬৩] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গীতবিতান, পৃষ্ঠা : ৩০৮।

মজার কথা হলো, সৌরজগতে আরও ডজনখানিক চাঁদ আছে। কিন্তু রুপোলি জোছনা ছড়িয়ে দেওয়া চাঁদ একটিই। পৃথিবীর যে চাঁদ, সেটিই কেবল মায়াবী জোছনায় আকৃষ্ট করতে পারে। কিন্তু শুধু জ্যোৎস্না ছড়িয়ে দেওয়াই চাঁদের মুখ্য কাজ নয়। প্রাণের বিকাশের ক্ষেত্রে এটি অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পৃথিবীকে নিজ অক্ষের ওপর ২৩° কোণে হেলে থাকতে সাহায্য করে চাঁদ। পাশাপাশি পৃথিবীর ঘূর্ণনের হার কমিয়ে দেয় এবং জোয়ার-ভাটার সৃষ্টি করে। এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো, পৃথিবীকে ২৩° ডিগ্রি কোণে হেলে থাকতে সাহায্য করা। এটা না হলে পৃথিবীর তাপমাত্রা এমন সংকটময় হয়ে পড়ত যে, প্রাণের বিকাশ সম্ভব হতো না। জ্যোতির্বিদ জ্যাকুয়েস লাস্কার-এর মাধ্যমে জানা যায়—আমাদের জলবায়ুর স্থিতিশীলতার জন্য আমরা এক ব্যতিক্রমী ঘটনার কাছে ঋণী। আর তা হলো চাঁদের উপস্থিতি। তা ছাড়া প্রফেসর পিটার ওয়ার্ড-এর মতে, চাঁদ পৃথিবী থেকে যে দূরত্বে অবস্থিত তার থেকে আরেকটু নিকটে চলে এলে ভূপৃষ্ঠে ঘর্ষণের কারণে এমন তাপ উৎপন্ন হতো যে, ভূপৃষ্ঠই গলে যেত।[১৬৪]

এবার আমাদের পৃথিবীর কথা বলি। পৃথিবী প্রতিনিয়ত তার নিজ অক্ষের ওপর ঘুরে। ফলে চব্বিশ ঘণ্টাই পৃথিবীর কোথাও-না-কোথাও রাত থাকে। একে বলে আহ্নিক গতি। এই আহ্নিক গতি যদি না থাকত, তা হলে পৃথিবীর একপাশে ছয় মাস সূর্যের আলো থাকত, অন্যপাশে থাকত অন্ধকার। আহ্নিক গতির কারণে সূর্যতাপের পর অন্ধকারের আগমন ঘটে। যদি পুরো পৃথিবীতে ছমাস রাত আর ছমাস দিন থাকত, তা হলে সালোক সংশ্লেষণ আর শ্বসনের ভারসাম্য থাকত না। বেঁচে থাকা কঠিন হয়ে পড়ত মানুষের জন্যে।[১৬৫]

এই পৃথিবীটাই শুধু মানুষ বসবাসের জন্যে উপযোগী। আর কোনো গ্রহেই মানুষ বেঁচে থাকার মতো পরিবেশ নেই। না মঙ্গলে, না শুক্রে। কোথাও নেই। এই বসুধায় আল্লাহ তাআলা এমন বায়ুমণ্ডল দিয়েছেন, যাতে রয়েছে পর্যাপ্ত অক্সিজেন। এর পরিমাণ এত বেশি নয় যে, অন্যান্য গ্যাসের কার্যক্রমে বাধা দান করবে। এটা আছে একটা পরিমিত পর্যায়ে। আবার কার্বন ডাই-অক্সাইড-এর মাত্রা এমন রাখা হয়েছে, যাতে কোনো প্রাণের শ্বাস-প্রশ্বাস হুমকির মুখে না পড়ে। অন্যদিকে এই পৃথিবী-নামক গ্রহটাকে বহিরাগত ক্ষয়ক্ষতি থেকে মুক্ত

---

[১৬৪] ডা. রাফান আহমেদ, অবিশ্বাসী কাঠগড়ায়, পৃষ্ঠা : ৭৫-৭৬।

[১৬৫] জাকারিয়া মাসুদ, সংবিৎ পৃষ্ঠা : ২০৫-২০৬।

রাখার জন্যে দেওয়া হয়েছে ওজোন স্তর। এটা অনেকটা ছাঁকনির মতো কাজ করে।

পৃথিবী যদি সূর্যের আরেকটু কাছে থাকত, তা হলে তার অবস্থা হতো শুক্রের মতো। ধরণিকে মনে হতো যেন আগুনে সেঁকা বস্তু। আবার যদি এরে চেয়ে সামান্য কিছুটা দূরেও থাকত, তা হলে বরফে ঢেকে যেত গোটা দুনিয়া। অবস্থা হতো ঠিক মঙ্গল গ্রহের মতো। কোনো প্রাণীই আর বেঁচে থাকতে পারত না। পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্বটাও একেবারে নিখুঁত। সূর্য আর পৃথিবীর দূরত্ব একেবারে খাপে-খাপ হওয়ার কারণে পৃথিবীর তাপমাত্রা খুব গরমও না, খুব ঠান্ডাও না। যার কারণে পানি তরল অবস্থায় থাকতে পারে। পানি যদি তরল অবস্থায় না থাকতে পারত, তবে কোনো প্রাণের অস্তিত্ব বজায় রাখা সম্ভব হতো না। আবার গ্যালাক্সির দিক থেকে বিবেচনা করলেও পৃথিবীটা একেবারে যথাযথ অবস্থানে রয়েছে। কারণ এটা অবস্থান করছে সর্পিলাকার গ্যালাক্সিতে। এটা যদি উপবৃত্তাকার গ্যালাক্সিতে অবস্থান করত, তবে পৃথিবী আদৌ পূর্ণতা পেত কি না, সন্দেহ আছে।[১৬৬]

> "আসলে তোমাদের প্রতি যদি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না থাকত, তবে অবশ্যই তোমরা ধ্বংস হয়ে যেতে।"[১৬৭]

পৃথিবী, চাঁদ, সূর্য-সহ সবকিছুর অবস্থান এতটাই নিখুঁত রাখা রয়েছে যে, এর চেয়ে সামান্য উনিশবিশ হলেই সমস্যায় পড়তে হতো মানুষকে। জীবনধারণ অসম্ভব হয়ে পড়ত। সৌরজগতের সবকিছুকে আল্লাহ এমন অবস্থানে রেখে সৃষ্টি করেছেন, যাতে পৃথিবীতে মানুষ টিকে থাকতে পারে। প্রাণখুলে নিশ্বাস নিতে পারে। আমরা হয়তো দামও দিই না, অথচ এমন জিনিসও নিযুক্ত করে রেখেছেন আমাদের কল্যাণের জন্যে। এভাবেই আল্লাহর অসংখ্য অনুগ্রহ ও দয়া নিয়ে এই পৃথিবী তার ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থান টিকিয়ে রেখেছে। আর এই পৃথিবীর ওপর ভিত্তি করেই টিকে আছে মানবসভ্যতা। টিকে আছি আমরা।

যে আল্লাহ এতটা অনুগ্রহ দিয়ে, এতটা দয়া দিয়ে, এতটা নিয়ামত দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছেন, সে আল্লাহর জন্যে কী করেছ?

আল্লাহর বিধানের ওপর বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখানো ছাড়া উল্লেখযোগ্য কিছু করেছ কি তুমি?

---

[১৬৬] ডা. রাফান আহমেদ, অবিশ্বাসী কাঠগড়ায়, পৃষ্ঠা : ৭৫।

[১৬৭] সূরা বাকারাহ, ০২ : ১৬৪।

দিওয়ালির দিন হিন্দু ছেলেটার সাথে আবির-রাঙা চেহারার সেলফিটা আপলোড করে Feeling crazy... স্ট্যাটাসটা যখন দিয়েছিলে, আমার অন্তরাত্মা তখন কেঁপে উঠেছিল। আল্লাহর জমিনে থেকে, আল্লাহর দেওয়া নিয়ামত ভোগ করে, আল্লাহর হুকুমবিরোধী কাজটা এভাবে বুক ফুলিয়ে জানান দিচ্ছ মানুষকে! এটা তোমার কেমন উন্মাদতা! পাপ করার পর সেটা আবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়াটা যে কত বড় ধৃষ্টতা, তা তোমায় বলে বোঝাতে পারব না আমি।

> "আমার সকল উম্মত ক্ষমা পাবে, (তবে নিজের পাপের কথা) প্রকাশকারী ব্যতীত। আর নিশ্চয়ই এটা অনেক বড় ধৃষ্টতা যে, কোনো ব্যক্তি রাতের আঁধারে অপরাধ করল—যা আল্লাহ (মানুষের কাছ থেকে) গোপন করে রাখলেন—কিন্তু ভোর হলে সে বলে বেড়াতে লাগল—হে অমুক, আমি আজ রাতে এমন এমন কাজ করেছি... আল্লাহ তার কর্মের (ওপর পর্দা দিয়ে তা) গোপন রেখেছিলেন, আর ভোরে ওঠে সে তার ওপর থেকে আল্লাহর দেওয়া পর্দা খুলে ফেলল।"

সেদিন বান্ধবীদের সাথে 'জাস্ট ফ্রেন্ড' নামের একটা ছেলেকে নিয়ে কিসব আজেবাজে মন্তব্য করছিলে আর হাসাহাসি করছিলে, মনে আছে? গত পরশু Rag Day-তে একটা ছেলের টি-শার্টে 'LOVE YOU' কমেন্টস লিখেছিলে। ওটা দেখার পর লজ্জায় মরে যাচ্ছিলাম আমি। আমি বুঝতে পারছিলাম না, একটা মেয়ে কিভাবে এমন নির্লজ্জ কাজ করতে পারে!

আসলে অনবরত পাপ করতে থাকলে মানুষ লজ্জাহীন হয়ে পড়ে। ইমাম ইবনুল কাইয়িম ﵀ বলেছেন,

> "গুনাহ বান্দার লজ্জাকে দুর্বল করে ফেলে এমনকি তার অন্তর থেকে (লজ্জাকে) প্রায় সম্পূর্ণরূপে দূর করে দেয়। মানুষ তার খারাপ অবস্থা জেনে ফেলবে—সে এটার পরোয়াই করে না। তারা তার ব্যাপারে (কে কী ভাবছে, সে বিষয়ে) সচেতনও হয় না... যখন বান্দা এরকম অবস্থায় পৌঁছে যায় তার মধ্যে আর সংশোধনের আকাঙ্ক্ষা জাগে না।"[১৬৮]

[১৬৮] ইবনুল কাইয়িম, আল জাওয়াবুল কাফী, পৃষ্ঠা : ৬৯।

গোনাহ মানুষের অন্তরে কালো দাগ সৃষ্টি করে।[১৬১] একের-পর-এক গোনাহ করতে থাকলে অন্তর এমন কলুষিত হয়ে যায় যে, বড় বড় পাপকেও খুব হালকা মনে হয়। পাপাচারটাই যখন নিত্যদিনের অভ্যাসে পরিণত হয়, তখন কবীরা গোনাহ হয়ে যায় পান্তাভাতের মতো। ক্রমাগত গোনাহ করতে থাকলে পাপাচারী থেকে আস্তে আস্তে আল্লাহদ্রোহী হয়ে যায় মানুষ। একটা সময় সে আর কোনো গুনাহকেই খারাপ মনে করে না। বরং সবচেয়ে নিকৃষ্ট অপরাধ করার পরেও লাইভে এসে বুক ফুলিয়ে বলে—'মুসলিম হয়েও এটা করা যায়। নো প্রবলেম!'

কিছুদিন আগে ফেইসবুকে দেখলাম, এক মুসলিম নারী বিয়ে করেছে আরেক নারীকে। বউভাতের ভিডিয়ো দিয়েছে অনলাইনে। মেয়েটা সাক্ষাৎকার দিতে এসে বলছে, 'মুসলিম হয়েও সমকামী হওয়া যায়। নো প্রবলেম।'

আরেকবার তুর্কির দুটো মেয়েকে দেখলাম সমকামীদের রঙধনু পতাকা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে। সমকামিতাকে সমতা হিসেবে দেখে ওরা। ওদের হাতে একটা প্ল্যাকার্ড ছিল। ওখানে লেখা ছিল : "Allah loves equality". চিন্তা করো, কত বড় জঘন্য কাজ এইটি। চিন্তা করলেও মাথা ধরে আসে। সমকামিতার মতো নিকৃষ্ট কাজের সাথে সে আল্লাহকে জড়িয়ে নিচ্ছে।

অনবরত পাপকাজ এভাবেই শেষ করে দেয় লজ্জাকে। অন্তরকে করে দেয় কলুষিত। সে অন্তর দিয়ে মন্দকে আর মন্দ বলে উপলব্ধি করা যায় না। ফলে লজ্জার কাজটাও নির্জলজ্জের মতো করে ফেলে মানুষ।

একদিন হয়তো দেখব তুমিও কক্সবাজার সৈকতে ন্যাংটো হয়ে সমুদ্রস্নান করার জন্যে আন্দোলন শুরু করবে শাহবাগে। সমকামিতা বৈধ করার জন্যে রঙধনু পতাকা নিয়ে বৈশাখী শোভাযাত্রায় শরিক হবে কোনো বান্ধবীর হাত ধরে। পাঠচক্র চলাকালীন সিগারেটে সুখটান দিয়ে মজা পাবে অনেক বেশি গুণে। কে কী বলল না বলল, সেটা নিয়ে থোড়াই কেয়ার করবে। ক্রমাগত অবাধ্যতা, পাপাচার, অশ্লীলতা তোমার মুখ দিয়েও হয়তো একসময় বের করবে—'মুসলিম হয়েও লিভ টুগেদার করা যায়, নো প্রব্লেম।'

[১৬১] "বান্দা যখন কোনো গোনাহ করে, তখন তার হৃদয়ে একটি কালো দাগ পড়ে যায়। কিন্তু সে যদি গোনাহ থেকে বিরত থাকে, ক্ষমাপ্রার্থনা করে এবং তাওবা করে, তবে তার (সে দাগ-পড়া) হৃদয় উজ্জ্বল হয়ে যায়। কিন্তু সে যদি (গোনাহের) পুনরাবৃত্তি করে, তবে কালো দাগ বেড়ে যায়। এমনকি সেটা তার পুরো হৃদয়ের ওপর প্রবল হয়ে ওঠে।" [তিরমিযি, আস-সুনান, ৩৩৩৪]

একজন ব্যক্তির কথা কল্পনা করো। সে তার অফিসের বসকে চেনে। এও জানে, তার চাকরি থাকা না-থাকাটা ওই বসের ইচ্ছের ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু বাধ্যবাধকতা থাকার কারণে এই অফিস ছাড়া অন্য কোথাও চাকরি করার মতো সুযোগ নেই তার। এরপরও সে কারণে-অকারণে বসের অবাধ্য হয়। বস যদি ডানদিকে যেতে বলে, তো বামদিকে যায়। আবার যদি বামদিকে যেতে বলে তো ডানদিকে যায়। আচ্ছা, এই লোকটাকে তুমি কী নামে ডাকবে?

—নির্বোধ।

আরেকজন ব্যক্তি, যে জানে : আল্লাহই হচ্ছেন তার স্রষ্টা, আল্লাহর হুকুমেই সেল ডিভিশন প্রক্রিয়ায় জাইগোট থেকে তার জন্ম হয়েছে। তার যত শক্তি, ক্ষমতা, প্রাচুর্য—সব আল্লাহই তাকে দান করেছেন। সে এও জানে, আল্লাহ যদি না চান, তবে আর কেউই তাকে পরকালে মুক্তি দিতে পারবে না। কিন্তু এরপরও সে আল্লাহর অবাধ্য হয়। অন্যায়-অবিচার-অশ্লীলতায় জড়ায় প্রতিনিয়ত। আবার এসব পাপাচারকে জাস্টিফাই করে নিজের মনগড়া বহুবিধ যুক্তি দিয়ে। এই লোকটাকে তা হলে কী বলে ডাকা যায়?

—নির্বোধ।

—না, এই লোকটা শুধু নির্বোধ নয়। এই ব্যাটা একদিকে নির্বোধ, আরেকদিকে জালিম।

—জালিম কেন?

—কারণ সে জুলুম করেছে।

—জুলুম কী?

—জুলুম হলো কোনো জিনিসকে দিয়ে তার প্রকৃতিবিরুদ্ধ কাজ করিয়ে নেওয়া।

আল্লাহ তাআলা প্রত্যেকটি মানুষকে ইসলামি ফিতরাত দিয়েই দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন।[১৭০] প্রতিটি কোষকে তৈরি করেছেন মুসলিম হিসেবে। আর কোটি কোটি কোষের সমন্বয়ে তৈরি হয়েছে মানবদেহ। তাই প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আল্লাহর হুকুমের আনুগত্য করতে চায়। এটিই তাদের স্বাভাবিক প্রকৃতি। কিন্তু কোনো ব্যক্তি যখন আল্লাহর হুকুমকে লঙ্ঘন করে, সে তখন অঙ্গ-

[১৭০] নবি ﷺ বলেছেন, "প্রতিটি মানব-শিশুই ফিতরাত (ইসলাম)-এর ওপর জন্মগ্রহণ করে। তারপর তার পিতামাতা তাকে ইয়াহুদি, নাসারা অথবা অগ্নিপূজক বানায়।" [বুখারি, ১৪৪]

প্রত্যঙ্গগুলোকে তাদের প্রকৃতিবিরুদ্ধ কাজ করতে বাধ্য করে। অথচ দেহের একটি কোষও আল্লাহর হুকুমের বাইরে কাজ করতে রাজি নয়। তো, যে ব্যক্তি প্রতিটি ক্ষণে ক্ষণে নিজের অস্তিত্বের ওপর জুলুম করে যায়, তার চেয়ে বড় জালিম আর কে হবে বলো?

"আর যারা আল্লাহর বিধানসমূহ লঙ্ঘন করে, তারাই জালিম।"[১৭১]

এই লোকটা শুধু জালিম-ই নয়, নিমকহারামও বটে।

আজ যদি কেউ বৃদ্ধ বাবা-মা'র ভরণপোষণ করতে অস্বীকৃতি জানায়, তো সাথে সাথে সবাই তাকে নিমকহারাম বলে গালি দেয়। কারণ, পিতা-মাতার আদর-যত্ন-ভালোবাসা পেয়েই সে বেড়ে উঠেছে। বাবা-মা আগলে রাখার কারণেই তার সুস্থ মানসিক বিকাশ হয়েছে। কিন্তু আজ সে বাবা-মা'র দায়িত্ব নিতে অস্বীকৃতি জানাচ্ছে, নিমকহারাম সে তো বটেই।

তবে সে সত্তার হুকুমকে অগ্রাহ্য করলে তাকে কী অভিধায় অভিহিত করা হবে, যে সত্তা ওই বাবা-মা'র হৃদয়ে ভালোবাসা সঞ্চার করেছিলেন, আর সে ভালোভাসা পেয়েই সন্তানকে বুকে আগলে রেখেছিল দুজনে? সে মহান রবের বিরোধিতা করলে তাকে কী নামে ডাকা হবে, যে প্রতিপালক প্রতিটা মুহূর্তে দামিদামি সব নিয়ামত বিনামূল্যে সরবরাহ করে তাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন? যিনি কখনো রোদ্দুর, কখনো বর্ষণ, কখনো শীতের পরশ কখনো বা বসন্ত দিয়ে জীবনধারণের উপযোগী করে রেখেছেন এ ধরণিকে, তাঁর হুকুম অগ্রাহ্যকারীকে নিমকহারাম ছাড়া তাকে আর কীই বা উপাধি দেওয়া যেতে পারে?

যে লোক আল্লাহর হুকুমের বাইরে চলে যায়, সে শুধু সমাজেরই ক্ষতি করে না, নিজেরও ধ্বংস ডেকে আনে। একদিকে সমাজের মধ্যে অশ্লীলতা-অন্যায়-পাপাচার ছড়িয়ে দেওয়ার কারণে মানুষ তাকে বদদুআ দেয়, অপরদিকে দেহের ওপর জুলুম করার কারণে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোও তার প্রতি অভিযোগ করতে থাকে। এ অবস্থায় দিন কাটাতে কাটাতে যখন সে আখিরাতে উপস্থিত হবে, তখন দেহের প্রতিটা অঙ্গ আল্লাহর আদালতে তাকে বিদ্রোহী সাব্যস্ত করবে। তারা বলবে—'আল্লাহ, এই লোকটি আমাদের দিয়ে আমাদের ইচ্ছাবিরুদ্ধ কাজ করিয়ে নিয়েছে। আমাদের ফিতরাতের বাইরে গিয়ে জুলুম করেছে আমাদের

---

[১৭১] সূরা বাকারা, ০২ : ২২৯।

সাথে। সে তোমার দ্রোহী কাজে আমাদের কাছ থেকে জোরপূর্বক সাহায্য নিয়েছে। আজ তার বিচার করো।'

> "শেষ পর্যন্ত যখন তারা জাহান্নামের নিকট পৌঁছোবে, তখন তাদের কান, চোখ ও ত্বক তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে সাক্ষ্য দেবে। তারা তাদের ত্বককে বলবে, 'আমাদের বিরুদ্ধে কেন সাক্ষ্য দিচ্ছ?' উত্তরে তারা বলবে, 'যিনি সবকিছুকে কথা বলার শক্তি দিয়েছেন, তিনি আমাদেরকেও (আজ) কথা বলার শক্তি দান করেছেন।'"[১৭২]

কোনো কাজে আল্লাহর অবাধ্য হওয়ার আগে বিষয়গুলো একটু স্মরণে রেখো। যৌবনের রূপলাবণ্য আছে বলে দুনিয়া কাঁপিয়ো না আপন-মনে। ছেলেবন্ধুদের আকৃষ্ট করতে উল্কি এঁকো না দেহে। আল্লাহর দেওয়া অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে আল্লাহর হুকুমের বাইরে কাজ করিয়ে, ক্রমাগত জুলুম কোরো না ওদের ওপর। আল্লাহর শপথ! কাল এ দেহের প্রতিটা কোষ তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে। প্রকাশ করে দেবে তোমার গোনাহগুলো। আল্লাহর আদালতে দাঁড়িয়ে একে একে সব বলে দেবে ওরা।

> "(দুনিয়ায়) তোমরা এই ভেবে কিছু গোপন করতে না যে, তোমাদের কান, চোখ, ত্বক তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে না? তোমরা তো মনে করতে—তোমার যা করো, তার অনেক কিছুই আল্লাহ জানেন না। তোমাদের এই (ভুল) ধারণাই তোমাদের ধ্বংস এনে দিয়েছে।"[১৭৩]

বোন আমার, কেন সেই মহামহিম আল্লাহর হুকুমের বিরুদ্ধে চলো, যিনি তোমায় সৃষ্টি করেছেন? আল্লাহর বড়ত্ব সম্পর্কে কি এতটুকুও জ্ঞান রাখো না তুমি? তিল পরিমাণও কি আল্লাহভীতি নেই অন্তরে? শাইখ খালিদ আর-রাশীদ খুব সুন্দর করে বলেছেন,

> "এটা যদি তুমি বিশ্বাস করো যে 'আল্লাহ তোমাকে দেখছেন না', তবে তুমি কত বড় কুফরিতে লিপ্ত! আর 'আল্লাহ দেখছেন' এ বিশ্বাস নিয়ে যদি তুমি গোনাহে লিপ্ত হও, তবে কত কঠিন তোমার অবাধ্যতা, কত বড় তোমার হঠকারিতা! তুমি কত বড় অবাধ্য! কত বড় নির্লজ্জ!"

---

[১৭২] সূরা ফুসসিলাত/হা-মীম-সাজদাহ, ৪১ : ২০-২১।
[১৭৩] সূরা ফুসসিলাত, ৪১ : ২২-২৩।

এসো, আমি তোমাকে সেই আল্লাহর পরিচয় জানাই, যিনি সকল কিছু সৃষ্টি করেছেন।

এই মুহূর্তে কয়েক বিলিয়ন মানুষ বাস করছে দুনিয়ায়। আল্লাহ তাআলার দুনিয়া এত বিশাল যে, এখানে আরও কয়েক বিলিয়ন মানুষ বাস করতে পারবে। এবার এই দুনিয়াকে তুলনা করো সূর্যের সাথে। পৃথিবীকে হাতে নাও এবং সূর্যের ভেতর রাখো। সূর্যের এক কোণাও ভরবে না এই পৃথিবী দিয়ে। এরকম আরও ১.৩ মিলিয়ন পৃথিবী রাখতে পারবে সূর্যের মধ্যে।

সূর্য একটি তারকা মাত্র। সূর্যের চাইতেও মিলিয়ন মিলিয়ন গুণ বড় তারকা আছে। কয়েক মিলিয়ন তারকা মিলে হয় একটি গ্যালাক্সি। মাথা তোলো। তাকাও ওপরের দিকে। বিলিয়ন বিলিয়ন গ্যালাক্সি আছে মহাকাশে। আর এ সবকিছুই আছে প্রথম আসমানে। সুবাহানাল্লাহ! এরপর আছে দ্বিতীয় আসমান। প্রথম আসমান থেকে দ্বিতীয় আসমানের দূরত্ব হলো ৫০০ বছরের রাস্তা। কেবল আল্লাহই জানেন এটা ঘোড়ার গতিতে নাকি অন্য কোনো গতির মাপে। এরপর তৃতীয় আসমান, এরপর চতুর্থ... এভাবে যেতে যেতে সপ্তম আসমান। প্রতি আসমানের মাঝে দূরত্ব হলো ৫০০ বছর। সপ্তম আসমানের পরে রয়েছে মহান আল্লাহর কুরসি।

> "তাঁর কুরসি সমস্ত আসমান ও জমিনকে পরিবেষ্টন করে আছে।"[১৭৪]

সপ্তম আসমান আল্লাহর কুরসির তুলনায় কিছুই না। ইবনু আব্বাস ﷺ বলেছেন, "সাত আসমান ও সাত জমিনকে যদি একটা একটা করে আলাদা করা হয়, এরপর একটির সাথে আরেকটিকে মিলিয়ে পাশাপাশি রাখা হয়, তবে তা কুরসির তুলনায় খুবই ক্ষুদ্র হবে। মনে হবে যেন বিশাল মরুপ্রান্তরে থাকা একটি বিন্দুর মতো।"[১৭৫]

কুরসির পরেই রয়েছে আল্লাহ তাআলার আরশ। আরশের তুলনায় কুরসি কিছুই না। রূপক অর্থে যদি বলা হয়, তবে সাহারা মরুভূমিতে থাকা ছোট্ট একটি আংটি হলো কুরসি। আসলে এর সঠিক পরিমাণ আল্লাহ তাআলাই জানেন। কোনো মানুষ তা জানে না। এ সকল কিছুর ঊর্ধ্বে হলেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা।

---

[১৭৪] সূরা বাকারা, ০২ : ২৫৫।
[১৭৫] ইবনু কাসীর, তাফসীরুল কুরআনিল, আযীম, ২/৩৪২।

"তিনিই সর্বোচ্চ এবং মহীয়ান।"[১৭৬]

সুবহানাল্লাহ! আল্লাহর বড়ত্ব কি কারও মাথায় ধরবে?

তিনি তিনি সকল কিছুর ওপরে, সর্বোচ্চ। সার্বভৌম কর্তৃত্ব তাঁরই হাতে।

এত বড় আল্লাহর অবাধ্য হতে তোমার লজ্জা লাগে না? কিসের এত অহংকার? আল্লাহ ছাড়া আর কে আছে, যিনি তোমাকে আখিরাতে মুক্তি দিতে পারেন? আল্লাহ ছাড়া আর কে আছে, যিনি তোমাকে প্রশান্তিময় জীবন দান করতে পারেন? কেউ নেই। কারও কিচ্ছুটি করার ক্ষমা নেই। তবে কেন তাঁর হুকুমের বিরোধিতা করবে?

বোন আমার, তুমি কখনোই চাইবে না, নগ্ন অবস্থায় তোমার বাবা তোমায় দেখে ফেলুক। বাবার সামনে ন্যাংটো হওয়াটা যে সরমের কাজ, তা তুমি ঠিকই বুঝো। তবে কেন এটা বুঝো না যে, আল্লাহর সামনে বেপর্দায় চলাটা আরও সরমের কাজ? সবাইকে ফাঁকি দিয়ে হয়তো দরজার ওপাশে গোনাহ করতে পারবে; কিন্তু আল্লাহর নজরকে ফাঁকি দেবে কিভাবে? কিভাবে আল্লাহর চোখ থেকে আড়াল করবে নিজেকে? এমন কোনো জায়গা কি তুমি খুঁজে পাবে, যেটা আল্লাহর দৃষ্টিসীমার বাইরে?

> "কোনো দৃষ্টি তাঁর নাগাল পায় না বরং তিনিই সব দৃষ্টি নাগালে রাখেন। আর তিনি অত্যন্ত সূক্ষ্মদশী ও সব বিষয়ে ওয়াকিবহাল।"

আরে, কোনো জায়গা তো দূরে থাক, তোমার অন্তরের আকাঙ্ক্ষাও আল্লাহর আওতার বাইরে নয়। অন্তর দিয়ে যা কিছুই কল্পনা করো না কেন, আল্লাহ তাআলা সেটাও জানেন।

> "আমিই মানুষকে সৃষ্টি করেছি, আর তার মন তাকে যে কুমন্ত্রণা দেয়, তাও আমি জানি।"[১৭৭]

বোন আমার, প্রবৃত্তি যখন গোনাহ করতে চায়, তখন আল্লাহর দৃষ্টির কথা স্মরণ করো। তোমার দৃষ্টি যতদিকে আপতিত হয়, তার মধ্যে আল্লাহর দৃষ্টিকে তুচ্ছ মনে কোরো না। ঘুণাক্ষরেও এটা ভেবো না, আল্লাহ তোমাকে পর্যবেক্ষণ

---

[১৭৬] সূরা বাকারা, ০২ : ২৫৫।
[১৭৭] সূরা ক্বফ, ৫০ : ১৬।

করছেন না। দেখছেন না কিছু।

"অবশ্যই আল্লাহ তোমাদের পর্যবেক্ষণে রেখেছেন।"[১৭৮]

আল্লাহ সহনশীল, তাই দেখার পরও সবকিছু সহ্য করছেন। তাঁর সহনশীলতা আর মহানুভবতার কারণে ধোঁকা খেয়ো না। ক্রমাগত পাপ করতে থাকার পরও যদি উন্নতির শিখরের পৌঁছে যাও, তবুও আত্মপ্রবঞ্চিত হোয়ো না। মনে রেখো, এগুলো আল্লাহর পক্ষ থেকে দেওয়া অবকাশমাত্র।

"তোমরা কখনো মনে কোরো না যে, জালিমরা যা করে আল্লাহ সে ব্যাপের উদাসীন, আসলে তিনি তাদেরকে সে দিন পর্যন্ত অবকাশ দিচ্ছেন, যে দিন (ভয়ে-আতঙ্কে) তাদের চক্ষু স্থির হয়ে যাবে।"[১৭৯]
"আমি তাদেরকে শুধু এ জন্যেই অবকাশ দিচ্ছি—যাতে তাদের পাপের পরিমাণ আরও বেড়ে যায়, আর তাদের জন্যে রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি।"[১৮০]

এই অবকাশের সময়টা পেরিয়ে গেলে আগুনের শেকল দিয়ে পাকড়াও করা হবে। সে দিনটি এত ভীতিকর হবে যে, ভয়ে আতঙ্কে বাচ্চা শিশুটিও থুরথুরে বুড়ো হয়ে যাবে। মমতাময়ী মা ভুলে যাবে তার ছোট্ট সোনামণিকে। মানুষগুলো ক্রমাগত মাতলামো করতে থাকবে আযাবের তীব্রতা দেখে। কিন্তু কিচ্ছুটি করার থাকবে না।

"সেদিন তুমি দেখবে প্রত্যেক স্তন্যদাত্রী (মা) তার দুধের শিশুর কথা ভুলে যাবে এবং প্রত্যেক গর্ভবতী (নারী) গর্ভপাত করে ফেলবে। আর মানুষকে দেখবে মাতালের মতো, যদিও তারা নেশাগ্রস্ত নয়। বস্তুত আল্লাহর আযাব বড়ই কঠিন (যার জন্যে তাদের এমন অবস্থা হবে)।"[১৮১]

হে অভাগী, জীবনটা যদি আল্লাহর অবাধ্যতার মধ্য দিয়েই কেটে যায়, তো সেদিন তোমার কী অবস্থা হবে?
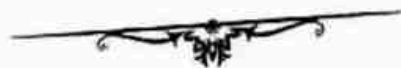
[১৭৮] সূরা নিসা, ০৪ : ০১।
[১৭৯] সূরা ইবরাহীম, ১৪ : ৪২।
[১৮০] সূরা আ ল ইমরান, ০৩ : ১৭৮।
[১৮১] সূরা হজ্জ, ২২ : ০২।

ঘরনি হও, জান্নাত পাবে

মৃদুমধুর বাতাস বইছিল চারিদিকে। ছিল না কোনো কোলাহল। চাঁদ আর তারা ছুটি নিয়েছিল সে রাতে। আকাশ যেন স্তব্ধ হয়ে ছিল। তাই তাওয়াফ করে ক্লান্ত ঘরে ফিরলেন খাদিজা। শরীর ছিল ভীষণ ক্লান্ত। বিছানায় গা এলিয়ে দিলেন। চলে গেলেন ঘুমের ঘোরে। হঠাৎ ঘুমের মধ্যে দেখতে পেলেন—আকাশ হতে চাঁদ নেমে এল তাঁর কোলে। সেই চাঁদের আলোয় আলোকিত হয়ে উঠল সারা ঘর। ছড়িয়ে গেল আলোর দ্যোতি।

স্বপ্ন দেখেই হতচকিত হয়ে পড়েন তিনি। বিচলিত হয়ে এদিক-ওদিক তাকাতে থাকেন। পুরো রাত পার হয় এপাশ-ওপাশ করে।

পরদিন ভোরবেলা তিনি চলে যান ওরাকা ইবনু নাওফালের কাছে। ওরাকা ছিল তাঁর চাচাতো ভাই। বেশ জ্ঞানী লোক ছিলেন তিনি। খাদিজা ওখানে গিয়ে স্বপ্নের কথা বর্ণনা করেন সবিস্তারে। সবকিছু শোনার পর ওরাকা বলেন, "বোন, তোমার জন্যে সুসংবাদ। বিস্ময়কর সপ্ন দেখেছ তুমি। এর ব্যাখ্যা হলো—শেষ জমানায় একজন রাসূল আসবেন। আর তাঁর সাথে তোমার বিয়ে হবে। সে তোমার ঘর আলোকিত করবে।"

চাচাতো ভাইয়ের কথা শুনে চোখ যেন কপালে উঠে গেল খাদিজার! সুবহানাল্লাহ!

কী বলছে ওরাকা। কী যেন এক অদৃশ্য অনুভূতি দোলা দিয়ে যাচ্ছে খাজিদার অন্তরে। যেন এক অন্যরকম শিহরন। আশা-আকাঙ্ক্ষার আর পরম প্রতীক্ষার ঢেউ খেলতে থাকে তাঁর মনমুকুরে। সেই মহামানবের প্রতীক্ষায় অধির আগ্রহে দিন কাটাতে থাকেন তিনি।

আকুলিত মন আজি অকারণ
কেন উঠে চমকিয়া
কেন নিরজনে কভু ক্ষণে ক্ষণে
উতলি ওঠে হিয়া।
দিবস-বিভাবরী আমি রইনু পড়ি
তাঁহার লাগিয়া
সে তো মোর নিধি নিয়তির বিধি
জনম জুড়িয়া।

খাদিজা ছিলেন সম্ভ্রান্ত বংশের নারী। অঢেল ধন-সম্পত্তির মালিক ছিলেন তিনি। তাঁর ছিল বিশাল ব্যবসা। মজুরির বিনিময়ে লোক নিয়োগ দিয়ে তিনি ব্যবসা পরিচালনা করতেন। কুরাইশদের মাঝে তাঁর ছিল বিশাল সম্মান। ধীশক্তি, সৌন্দর্য এবং কোমল আচরণের সম্মিলন ঘটেছিল তাঁর জীবনে। এইসকল গুণরাজির জন্যেই মহীয়সীদের কাতারে ঠাঁই হয়েছিল তাঁর।

খাদিজা জানতে পারেন মক্কায় মুহাম্মাদ ﷺ নামের একজন বিশ্বস্ত লোক আছেন। যিনি কখনো মিথ্যে কথা বলেন না। কারোর সাথে প্রতারণা করেন না। ওয়াদা দিলে ভঙ্গ করেন না ঘুণাক্ষরেও। মক্কার লোকেরা তাঁর নাম দিয়েছে 'আল-আমীন'। সবদিক থেকে অনন্যসাধারণ যুবক ছিলেন মুহাম্মাদ ﷺ। খাদিজা এই যুবককে তাঁর ব্যবসার দায়িত্বভার অর্পণ করতে চাচ্ছিলেন। তিনি প্রস্তাব দিয়ে লোক পাঠালেন মুহাম্মাদের কাছে। অন্যদের চেয়ে দ্বিগুণ পারিশ্রমিক দেওয়ার কথাটাও উল্লেখ করে দিলেন। তাঁর সে প্রস্তাবে রাজি হলেন মুহাম্মাদ ﷺ।

মাইসারা নামে খাদিজার একজন দাস ছিল। তাকে মুহাম্মাদের সফরসঙ্গী হিসেবে পাঠালেন তিনি। ব্যবসায়ী কাফেলা নিয়ে তারা ছুটলেন সিরিয়ার দিকে।

এই সফরে একটি বিস্ময়কর ঘটনা ঘটল। মুহাম্মাদ ﷺ নামের যে যুবকটির কাছে ব্যবসার দায়িত্ব ছিল, তাঁর মাথার ওপরে সব সময় ছায়া পড়ত। প্রচণ্ড রোদে সবার যখন গা পুড়ে যাবার জো হতো, তখনো মুহাম্মাদকে ছায়া দিত মেঘরাশি। পরম মমতায় আগলে রাখত রোদ্দুরের দাবদাহ থেকে। মাইসারা সবকিছুর খেয়াল রাখছিল বাজ পাখির মতন।

ব্যবসার কাজ সমাপ্ত করে মক্কায় ফিরলেন মুহাম্মাদ ﷺ। সেবারের ব্যবসায় বিপুল মুনাফা অর্জিত হলো। মাইসারা সফরের আদ্যোপান্ত খুলে বললেন খাদিজার কাছে। সাথে সাথে মুহাম্মাদের উত্তম আচরণ, ন্যায়-নিষ্ঠা, ধৈর্যশীলতা, মহানুভবতার ব্যাপারেও অনুপুঙ্খ রিপোর্ট দিলেন। সব শুনে খাদিজার মন আকুলিত হয়ে উঠল।

এ কি সেই মহাপুরুষ, যাঁর কথা ওরাকা বলেছিল?

তবে কি তাঁর কাঙ্ক্ষিত স্বপ্ন পূর্ণ হতে যাচ্ছে?

হৃদয়টা আকুলিবিকুলি হয়ে উঠল তাঁর। এই যুবকটাই যে সেই কাঙ্ক্ষিত পুরুষ—খাদিজার মনে এই ব্যাপারে আর কোনো সন্দেহ রইল না। তাঁর সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হতে চাইলেন তিনি। অত্যন্ত কৌশলে তাঁর বান্ধবী নাসিফার কাছে বিষয়টি তুলে ধরলেন। নাসিফা খোঁজ-খবর নিয়ে জানালেন খাদিজাকে। স্পষ্ট ভাষায় বলে দিলেন—মুহাম্মাদ ﷺ একজন অনন্য চরিত্রের ব্যক্তি। তাঁর কোনো তুলনা হয় না। পুরো মক্কায় তিনি অনন্যসাধারণ।

এরপর কথাবার্তা অনেকদূর এগোল। মুহাম্মাদের চাচা আবু তালিব, হামযা-সহ সকলেই এই বিয়েতে মত দিলেন। এরপর তারা খাদিজার চাচা আমরের কাছে সম্মতি জানিয়ে প্রস্তাব পাঠালেন। বিশিষ্ট্য ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে দুজনার বিয়ে হলো।

যত সহজে বলে ফেললাম, তত সহজেই বিয়েটা হয়নি। বিয়ের আগে লোকের নানা কথা শুনতে হয়েছে খাদিজাকে।

এতিম ছেলেকে বিয়ে করবি?

বিয়ে করে ও তোকে খাওয়াবে কী?

তোর জন্যে তো মক্কার রাজপুত্ররা অপেক্ষা করছে, ওদের কাউকে বেছে নে!

এমন হাজারও কথা শুনতে হয়েছিল খাদিজাকে। কিন্তু তিনি পাত্তা দেননি উড়োকথায়। সাফ জানিয়ে দিয়েছেন—তোমরা আমাকে উপহাস করছ? আমি তোমাদের কাছে জানতে চাই, মুহাম্মাদের মতো উত্তম চরিত্রের অধিকারী দ্বিতীয় কোনো ব্যক্তি তোমাদের নজরে আছে? মক্কা মদীনার কেউ কি তাঁর সমকক্ষ হতে পারবে? তাঁর মহান চরিত্রের কারণেই আমি তাঁকে বিয়ে করছি। আমি তাঁর সম্পর্কে এমন কিছু শুনেছি, তা অত্যন্ত মর্যাদার সাক্ষ্য বহন করে।

এখানে একটু থামি। আচ্ছা, তুমি কি পারবে—কেবল উত্তম চরিত্র আর মহানুভবতা দেখে কারও সাথে সংসার করতে? টাকাপয়সার দিকে না তাকিয়ে কেবল আখলাকের দিকে নজর দিতে?

পারবে না। বড়লোক ছেলে তোমার লাগবেই। অর্থসম্পদ থাকলে পাড়ার মাস্তানের বাহুডোরে নিজেকে সঁপে দিতেও কুণ্ঠাবোধ করবে না। একজন ভাই খুব সুন্দর করে বলেছিলেন, এখনকার নারীরা কেবল বিল গেটসকেই বিয়ের উপযোগী মনে করে। ভাইয়ের কথা পুরোপুরি সত্য কি না, জানি না। তবে তিনি যে মিথ্যা বলেননি, এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত।

আচ্ছা যাক, আমরা সামনে এগোই। খাদিজার উপাধী ছিল 'তাহিরা'। তিনি ছিলেন মক্কার অন্যতম শ্রেষ্ঠ নারী। আর ওদিকে মুহাম্মাদের উপাধী ছিল 'আল-আমীন'। তিনি ছিলেন মক্কার শ্রেষ্ঠতম পুরুষ। একদিকে 'আল-আমীন', অপরদিকে 'তাহিরা'—কী সুন্দর জুটি বানিয়েছিলেন ওপরওয়ালা।

আসলে পবিত্র নারীরা পবিত্র পুরুষকেই জীবনসঙ্গী হিসেবে পায়। আর যারা ফ্ল্যাটে ফ্ল্যাটে রাত কাটিয়ে অভ্যস্ত, তাদের স্বামী তো পরকিয়া করবেই। সমানে সমান। আরেকটু ভদ্র ভাষায় বললে—মানিকে মানিক চিনে, আর...

মুহাম্মাদের প্রতি ভালোবাসার কোনো কমতি ছিল না খাদিজার। বিয়ের পর থেকে নিয়ে আমৃত্যু আগলে রেখেছেন মুহাম্মাদকে। নিজের স্বামীকে সন্তুষ্ট করার প্রাণান্তকর চেষ্টা করেছেন তিনি। তাঁদের ঘর আলো করে অনেক সন্তান-সন্ততি জন্ম নেয়। কাসিম, আব্দুলাহ, যায়নাব, রুকাইয়া, উম্মু কুলসুম ও ফাতিমা-রা আলোকিত করে রাখে তাঁদের সংসার।[১৮২]

[১৮২] নবিজির জীবদ্দশাতেই তাঁর ছেলে সন্তানরা মারা যায়।

মুহাম্মাদ ﷺ নামের মানুষটি অন্যদের মতো ছিলেন না। তাঁর আচার-ব্যবহার, চলাফেরা, কথাবার্তা—সবকিছুই ছিল ব্যতিক্রম। তিনি সারাক্ষণ হকের পথ খুঁজে বেড়াতেন। শিরক ও কুফর থেকে মানুষকে মুক্ত করার রাস্তা খুঁজতেন। আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্যে ধ্যানমগ্ন থাকতেন সুদূর হেরা গুহায়। কয়েকদিনের খাদ্য-পানীয় একসাথে নিয়ে যেতেন সেখানে। খাদিজা পরম মমতায় খাবার তৈরি করে দিতেন। এভাবে কিছুদিন চলতে থাকে... এরপর এক বিস্ময়কর ঘটনা ঘটে।

সময়টা ছিল রমাদান মাস। মুহাম্মাদ ﷺ তখনো ধ্যানে মগ্ন। হঠাৎ আল্লাহর দূত জিবরাঈল ﷺ এলেন হেরা গুহায়। নিয়ে এলেন কুরআনের অমীয় বাণী। নাযিল হলো সূরা আলাকের প্রথম কিছু আয়াত।

মক্কার সেই নিরুপম মুহাম্মাদকে নবি হিসেবে মনোনীত করলেন আল্লাহ তাআলা। তিনি হয়ে গেলেন বিশ্ববাসীর জন্যে আল্লাহর মনোনীত রাসূল—মুহাম্মাদুর রাসূলুলাহ। সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

রাসূল ﷺ দৌড়ে এলেন ওখান থেকে। তিনি ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর হৃদয় তখনো কাঁপছিল। খাদিজার কাছে এসে বললেন, "আমাকে চাদর দিয়ে ঢেকে দাও, আমাকে চাদর দিয়ে ঢেকে দাও।" এক অজানা শঙ্কা কাজ করছি তাঁর হৃদয়ে। তিনি ঘটনার আদ্যোপান্ত শোনালেন খাদিজার কাছে। সব শুনে তিনি নবিজিকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, "আল্লাহর শপথ, আল্লাহ আপনাকে কখনোই অপমানিত করবেন না। আপনি আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদাচার করেন, অসহায়-দুস্থদের দায়িত্ব বহন করেন, নিঃস্বকে সহায়তা করেন, দুর্দশাগ্রস্তদের পাশে দাঁড়ান।"

এরপর খাদিজা তাঁকে নিয়ে যান ওরাকার কাছে। সে ছিল আসমানি কিতাবের ব্যাপারে পারদর্শী এক লোক। খাদিজা বললেন, "ওরাকা, আপনার এই ভাতিজার কথা শুনুন।"

ওরাকা তখন জিজ্ঞেস করলেন, "মুহাম্মাদ, তুমি কী কী দেখেছ?"

নবি মুহাম্মাদ ﷺ তখন সবকিছুর বর্ণনা দিলেন। সব শোনার পর ওরাকা বললেন, "এ তো সেই বার্তাবাহক, যাকে আল্লাহ মূসা ﷺ-এর কাছে পাঠিয়েছিলেন।"

ওরাকার কাছ থেকে ফিরে এলেন দুজন। এরপর নবিজি খাদিজাকে সত্যের

দাওয়াত দিলেন। একবাক্যে খাদিজা সে দাওয়াত গ্রহণ করলেন। নারীদের মধ্যে তিনিই প্রথম ইসলাম কবুল করেছিলেন। রাদিয়াল্লাহু আনহা।

এরপর থেকে শুরু হলো এক নতুন অধ্যায়। সত্যের দাওয়াত দেওয়ার কারণে নবি মুহাম্মাদ ﷺ-এর ওপর নেমে এল অকথ্য নির্যাতন। মক্কার মুশরিকরা সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল তাঁর ওপর। চতুর্মুখী অত্যাচারের কারণে অতিষ্ঠ হয়ে গেল জীবন। তবুও নবিজি সত্যের মশাল নিয়ে এগিয়ে গেলেন সমুখে।

দিনভর দাওয়াতি কাজের ব্যস্ততা শেষে যখন বাসায় ফিরতেন, তাঁর দিকে তাকানো যেত না। পরিচ্ছন্ন পোশাকে তিনি বাসা থেকে বেরোতেন। কিন্তু ফেরার সময় তাঁর পোশাক থাকত ধুলোমলিন। কাপড়ে লেগে থাকত মানুষের থুথু। খাদিজা رضي الله عنها সেগুলো মুছে দিতেন পরম যতনে। সব সময় আগলে রাখতেন আল্লাহর রাসূলকে। কাফিরদের অত্যাচারে নবিজির জীবন যখন অতিষ্ঠ, তখন হিম্মত জোগাতেন অবিচল থাকার জন্যে। নবিজি ﷺ আবার পূর্ণ উদ্যোমে কাজ শুরু করতেন।

খাদিজা رضي الله عنها আল্লাহর নবিকে এতটাই ভালোবাসতেন যে, নিজের অঢেল সম্পদ দ্বীনের জন্যে বিলিয়ে দিতে তিনি কার্পণ্য করেননি। মক্কার সম্ভ্রান্ত নারী খাদিজা رضي الله عنها সমস্ত অর্থবিত্ত কুরবানি হিসেবে পেশ করেছেন রাসূলের সামনে। কোনো দিন এ কথা বলেননি, "তোমার সংসারে এসে আমি কিছুই পাইনি।" সারাক্ষণ কেবল একটাই ফিকির ছিল, কিভাবে আল্লাহর দ্বীনকে সাহায্য করা যায়। কিভাবে সত্যকে দুনিয়ার বুকে বুলন্দ করা যায়। পুরোটা সময়জুড়ে তাঁর উদ্‌বেগ ছিল আল্লাহর রাসূলকে নিয়ে। মায়া-মমতা আর ভালোবাসা দিয়ে তিনি আগলে রাখতেন মানুষটিকে। যেন তাঁর কোনো ক্ষতি না হয়।

এ তো আসমানি ভালোবাসা, যা আল্লাহর পক্ষ থেকে দেওয়া হয়েছে। এখানে কোনো কৃত্তিমতা নেই, নেই আদিখ্যেতা। কোনো তুলনা নেই এই ভালোবাসার।

জিবরাঈল عليه السلام একদিন রাসূল ﷺ-এর কাছে এলেন। তিনি তখন হেরা গুহায় অবস্থান করছিলেন। ওদিকে আবার খাদিজা আসছিলেন নবিজিকে খাবার পৌঁছে দেওয়ার জন্যে। জিবরাঈল عليه السلام তখন বললেন, "আল্লাহর রাসূল, ...খাদিজা যখন পৌঁছোবেন এখানে, তাঁকে তাঁর প্রতিপালকের পক্ষ থেকে এবং আমার পক্ষ থেকেও সালাম জানাবেন। আর তাঁকে এমন একটি জান্নাতী

ভবনের সুসংবাদ দেবেন, যার ভেতরটা মোতি দিয়ে কারুকার্য করা।"[১৮০]

দ্বীনের জন্যে খাদিজার কুরবানি আল্লাহর কাছে এতটাই পছন্দ হয়েছিল যে, স্বয়ং আল্লাহ তাঁকে সালাম জানিয়েছেন। সুবহানাল্লাহ! এমনটা কতজনের কপালে জুটে?

বোন আমার, তুমি কি এমন জীবন চাও না?

তবে কেন এত দ্বিমুখিতা তোমার মধ্যে? আল্লাহর সাথে প্রতারণা করার সময় বুকটা কি একটুও কাঁপে না তোমার? এমন কোন গোনাহ আছে, যা তুমি করো না? যিনা-ব্যভিচারের কথা নাহয় বাদই দিলাম। কিন্তু গীবত, পরনিন্দা, চোগলখুরি, মিথ্যে বলা, ধোঁকা দেওয়া... কোনো কিছু বাকি রেখেছ কি? মুখে মুখে নিজেকে মুসলিম বলে পরিচয় দাও, কিন্তু কাজেকর্মে হার মানিয়ে ফেলো ইহুদি-নাসারাকেও। এটাই বুঝি ঈমানদারের পরিচয়? ড. ইকবাল খুব সুন্দর করে বলেছেন,

নাসারাসম চলন-বলন, হিন্দুয়ানি তমদ্দুন

ইহুদিও করিছে লাজ দেখিয়া তব অসৎগুণ।

হতে পারো সৈয়দ মির্জা, হতে পারো খয়ের খান

হও না সবি, কিন্তু শুধাই—সত্যি কি তুমি মুসলমান?

একটা সময় নবিজিকে শোক সাগরে ভাসিয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় নেন মহীয়সী খাদিজা ﷺ। তাঁর মৃত্যুতে নবিজি বেশ ভেঙে পড়েন। খাদিজা ছায়া হয়ে ছিলেন তাঁর জীবনে। যখন সবাই নবিজিকে নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করছিল, তখন একাই তিনি নবিজিকে আগলে রেখেছিলেন। যখন সবাই নবিজির দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করেছিল, তখন একবাক্যে সে দাওয়াতকে সত্যায়ন করেছিলেন তিনি।

তাই তো নবি ﷺ বলতেন, "তাঁর চেয়ে উত্তম নারী আমাকে আল্লাহ দান করেননি। (মক্কার) মানুষ যখন আমাকে মানতে অস্বীকার করেছে, তখন সে আমার প্রতি ঈমান এনেছে। মানুষ যখন আমাকে বঞ্চিত করেছে, তখন সে তাঁর সম্পদে আমাকে অংশীদার করেছে।"

---

[১৮০] বুখারি, হাদীস : ৩৮২০।

খাদিজা ﷺ কেন এত উঁচুতে চলে গিয়েছিলেন?

তাঁর অর্থ-সম্পদ বেশি ছিল, এই কারণে?

কুরাইশদের মাঝে তাঁর আভিজাত্য ছিল, এই জন্যে?

তাঁর রূপের কারণে?

না। তিনি ছিলেন একজন উত্তম ঘরনি। যিনি নবিজির ছোট্ট সংসারখানি আগলে রেখেছেন। সার্বিক দিক দিয়ে নবিজিকে সাহায্য করেছেন। বিপদে-আপদে, সুখে-দুঃখে সর্বদা স্বামীকে সমর্থন দিয়েছেন। তিনি তাঁর জীবনকে উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন আল্লাহর জন্যে।

আল্লাহর রাসূল ﷺ চারজন নারীকে শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা দিয়েছেন। তিনি বলেন, "সারা বিশ্বের নারীদের মধ্যে ইমরানের কন্যা মারইয়াম, খুয়াইলিদের সন্তান খাদিজা, ফিরআউনের স্ত্রী আসিয়া এবং মুহাম্মাদের মেয়ে ফাতিমা তোমার জন্যে (অনুকরণীয় আদর্শ) হিসেবে যথেষ্ট।"[১৮৪]

কী গুণ ছিল তাঁদের মধ্যে?

তাঁদের কেউই তোমার মতো ভার্সিটিপড়ুয়া ছিলেন না। তাঁদের ছিল না চাকরি-বাকরির নেশা। তাঁদের কারোরই পুরুষের মতো হওয়ার প্রচেষ্টা ছিল না। স্বাবলম্বী হওয়ার নেশায় তাঁরা বেচায়েন ছিলেন না সারাক্ষণ। তাঁরা সকলেই ছিলেন উত্তম ঘরনি। পুরুষের সহযাত্রী। একজন নারীকে আল্লাহ যে যে দায়িত্ব দিয়েছেন, তাঁরা সে দায়িত্ব পালন করেছেন নিষ্ঠার সাথে।

মারইয়াম ﷺ-এর গর্ভেই আল্লাহ তাআলা ঈসা ﷺ-এর জন্ম দিয়েছিলেন। যিনি লোকজনের ঠাট্টা-মশকরা সহ্য করে ছোট্ট শিশুটিকে প্রাজ্ঞবান ঈসা হওয়ার পেছনে অবদান রেখেছিলেন। ফিরআউনের স্ত্রী আসিয়াও একই কাজ করেছিলেন। তার অধীনেই বড় হয়েছিলেন আল্লাহর নবি মূসা ﷺ। যিনি ফিরআউনের কবল থেকে বানী ইসরাঈলকে উদ্ধার করেছিলেন। আর আল্লাহর নবির মেয়ে ফাতিমা ﷺ ছিলেন একজন নিষ্ঠাবান স্ত্রী। ইসলামের তৃতীয় খলিফা আলি ﷺ-এর ঘর আলোকিত করে রেখেছিলেন তিনি। ঘরের কাজ করতে

[১৮৪] তাবারানি, হাদীস : ১২১৭৯; সনদ হাসান।

করতে হাতে ফোস্কা পড়ে গিয়েছিল তাঁর।

আসলে উত্তম নারীরা উত্তম ঘরনিও হয়। পরিবারটাকে আগলে রাখে তারা। তারাই তো ভালোবাসার সুতো দিয়ে বেঁধে রাখে পরিবারের সদস্যদের। আর এই কাজের মাধ্যমেই তারা আল্লাহর প্রিয়ভাজন বান্দায় পরিণত হয়। কিন্তু আজকাল তোমরা নারীত্বের প্রতি বিদ্রোহী হয়ে উঠছ। তোমাদের চোখে কেবল পুরুষ হওয়ার স্বপ্ন। সেইদিন এক নারীবাদী পেইজে দেখলাম চটকদার স্লোগান—

কামাই থাকলে
জামাই লাগে না

আমি পড়লাম আর হাসলাম। এইসব গোবরে মস্তিষ্কের নারীরা এই যুগে কী করছে? ওদের তো থাকার দরকার ছিল অন্ধকারাচ্ছন্ন ইউরোপের কোনো যুগে। চিন্তা-চেতনার চরম উৎকর্ষতার মধ্যে থেকেও এই ধরনের প্রলাপ কেউ বকতে পারে?

পরক্ষণে মনে হলো, যারা পুরুষদেরকেই উত্তম হওয়ার মাপকাঠি হিসেবে ধরে নিয়েছে, তাদের থেকে এরচেয়ে ভালো আর কীই বা আশা করা যেতে পারে! এই সব পরাজিত মানসিকতার নারীদের লক্ষ্যই তো পুরুষালি বৈশিষ্ট্যে নিজেকে সজ্জিত করা। পুরুষদের মতো পোশাক পরা, খাটাখাটনি করা, ক্রেন চালানো কিংবা ইট ভাঙতে পারলেই তারা নিজেদের 'অপরাজিতা' মনে করে। গার্মেন্টেস-কর্মী হতে কিংবা বাসা-বাড়ির চাকরানি সাজতে তারা স্বাচ্ছন্দ বোধ করে। দিনভর হাড়ভাঙা খাটুনি করাকে মর্যাদার কাজ মনে করে, অথচ পরিবার সামলানোর মতো মহতী দায়িত্বকে মনে করে গাধার খাটনি।

মহীয়সী নারীদের কেউই চাকরি-বাকরি নিয়ে পড়ে থাকেননি। তাঁরা ঘর সামলেছেন, বাচ্চা সামলেছেন। পর্দার আড়ালে থেকেই তাঁরা গড়ে তুলেছেন আবু হানিফা, আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক কিংবা ইবনু তাইমিয়ার মতো মনীষীদের।

তুমি কি ইমাম শাফিয়ির কাহিনি পড়োনি? একজন বিধবার নিবিড় পরিচর্চায় বেড়ে উঠেছেন তিনি। স্বামী হারানোর পর দাঁতে দাঁত লাগিয়ে ছেলেকে মানুষ করেছেন তাঁর মা। তুমি কি খানসা ﵁-এর ঘটনা পড়োনি? কাদেসিয়ার যুদ্ধে চার সন্তানকে আল্লাহর রাহে উৎসর্গ করেছেন তিনি। অথচ এই সন্তানরা ছাড়া

তাঁকে দেখভাল করার মতো আর কেউ ছিল না।

আমি জানি, শয়তান তোমাকে একটা ধোঁকা দেবে এখন। সে বলবে, আরে ওর কথা শুনিস না। খাদিজা যে ব্যবসায়ী ছিল, সে কথা মনে নেই? এই তো পাওয়া গেল ব্যবসা-বাণিজ্যের দলিল। নে নে, কাজ শুরু কর। ওসব চিন্তা ঝেড়ে ফেলে ক্যারিয়ারের দিকে মনোযোগ দে।

দাঁড়াও, শয়তানের বাড়া ভাতে আমি ছাই দিয়ে দিচ্ছি।

জাহিলিয়াতের যুগেও খাদিজা কখনো নিজে নিজে ব্যবসার কাজ চালাননি। তিনি একজন পুরুষ প্রতিনিধি নিয়োগ করতেন। আর সে ব্যক্তিই খাদিজার ব্যবসা দেখাশোনা করত। তিনি বাড়িতে বসে দিক-নির্দেশনা দিতেন কেবল।

এ তো গেল জাহিলি যুগের কাহিনি। ইসলাম কবুল করার পর তিনি তাঁর সম্পদ দু-হাতে খরচ করেছেন আল্লাহর দ্বীনের জন্যে। মক্কার লোকেরা যখন আল্লাহর দ্বীনের বিরোধিতা করেছে, তখন খাদিজা একাই দ্বীনের জন্যে অকাতরে ব্যয় করেছেন। আর খাদিজা ﵂ দ্বীন ইসলাম কবুল করার পর কোনো দিনও বেপর্দা হয়ে পরপুরুষের সাথে মেলামেশা করেননি!

তবে কী করে খাদিজার জীবনী থেকে তুমি ফ্রি মিক্সিং কিংবা ক্যারিয়ারের তালিম নিচ্ছ? শয়তান এত সহজেই তোমাকে বোকা বানিয়ে দিচ্ছে? তুমি না বুদ্ধিমতী? তবে কই গেল সব বুদ্ধি?

বোন আমার, ওসব শয়তানি চিন্তা-চেতনা ঝেড়ে ফেলে একবার ভাবো। খাদিজা ﵂ যতটা নিবেদিতপ্রাণ ছিলেন দ্বীনের জন্যে, তুমি ততটুকু আছ কি না? খাদিজা ﵂ যেভাবে আল্লাহর হুকুমের সামনে নিজেকে সঁপে দিয়েছেন, সেভাবে তুমি দেবে কি না? তুমি কি পারবে, নিজের ধন-সম্পদের সবটা আল্লাহর জন্যে খরচ করতে? পারবে একজন ভালো স্ত্রী সেজে স্বামীর সুখ-দুঃখে অংশীদার হয়ে তাকে আগলে রাখতে? বড়লোকের বেটি হয়েও একজন এতিম-অসহায়কে বর হিসেবে মেনে নিতে পারবে তুমি?

আজকে সবাই মুহাম্মাদ ﷺ-এর মতো আদর্শবান স্বামীর প্রতীক্ষায় থাকে। কিন্তু কেউই খাদিজার মতো জীবন গড়তে চায় না। এটা কী করে সম্ভব? তুমি যদি নিজেকে খাদিজার আদর্শে রঙিন না করো, তবে মুহাম্মাদের দেখা পাবে

কী করে? যদি সত্যিই মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল্লাহ-র মতো কাউকে জীবনসঙ্গী হিসেবে পেতে চাও, তবে প্রস্তুতি নাও খাদিজা হওয়ার। নয়তো কপালে মুহাম্মাদ নয়, জুটবে পরকিয়াবাজ কোনো বর।

স্বাধীনতার সুখ

আমাদের বাড়ির পাশে বিশাল এক শিমুল তুলোর গাছ ছিল। অনেকগুলো টিয়ে পাখির বাসা ছিল সেখানে। বড় বড় কিছু কোটর ছিল শিমুল গাছে। টিয়েগুলো ওখানেই থাকত। চাচ্চু একবার প্ল্যান করল টিয়ে ধরার। আমি তখন খুব ছোট। ক্লাস ফাইভে পড়ি। বেশ আগ্রহ নিয়ে টিয়ে ধরার দৃশ্য দেখছি। প্রথমে একগুচ্ছ খড় লাগানো হলো লম্বা বাঁশের মাথায়। এরপর একটি কোটর সোজা করে বসানো হলো বাঁশটি। যেই টিয়ে কোটরে ঢুকল, ওমনিই খড় লাগানো বাঁশটি দিয়ে সেটা বন্ধ করে দেওয়া হলো। এরপর একজনকে তুলে দেওয়া হলো গাছে। অল্প সময় পর একটি টিয়ে সাথে করে নেমে এল লোকটি।

হাতের কাছে পাখি পেয়ে আমি তো খুশিতে আত্মহারা। খুব আগ্রহ নিয়ে আমি ওর পরিচর্যা করতে লাগলাম। টিয়ে পাখি নাকি মরিচ খেতে বেশি পছন্দ করে, তাই আব্বুকে দিয়ে লাল মরিচ কিনিয়ে আনলাম। ওগুলো খাওয়াতে লাগলাম খাঁচার ফাঁক দিয়ে দিয়ে। প্রথম প্রথম ও খুব ডাকাডাকি করত। কিন্তু আস্তে আস্তে কেন জানি ডাকাডাকি বন্ধ করে দিল। যে মরিচ ছিল তার প্রিয় খাবার, সেটি খেতেও অনীহা দেখা গেল ওর মধ্যে। চাচ্চু ওর জন্যে বড় খাঁচার ব্যবস্থা করলেন। চাচ্চু ভেবেছিলেন—হয়তো বড় খাঁচা পেলে ও সব কষ্ট ভুলে যাবে। কিন্তু বড় খাঁচা আর লাল টকটকে মরিচ টিয়েকে সুখ দিতে পারল না। ক্রমাগত সে নিস্তেজ হতে লাগল।

একদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখি খাঁচা খালি। আমি পুরোই থ খেয়ে গেলাম! কী ব্যাপার! টিয়ে কোথায়। দৌড়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম আম্মুকে। আম্মু জানালেন, ভোরবেলায় তিনি টিয়েকে মুক্ত করে দিয়েছেন। আমি কান্না শুরু করলাম। মা বোঝালেন। তিনি বললেন, পাখিরা খাঁচায় থাকতে পছন্দ করে না। খাঁচায় আটকিয়ে পাখিকে যতই আদর-যত্ন করা হোক না কেন, লাভ নেই। বন্দি খাঁচায় বসে লাল মরিচ খাওয়ার মধ্যে কোনো সুখ নেই। মুক্ত বাতাসে উড়ে বেড়ানোর মধ্যেই ওদের সুখ।

সত্যিই, মা এক বিন্দুও মিথ্যে বলেননি। ছোটবেলায় আমরা ভাব-সম্প্রসারণ পড়েছিলাম—'বন্যেরা বন্যে সুন্দর, শিশুরা মাতৃক্রোড়ে।' সোনার খাঁচায়ও যদি পাখিদের আটকে রাখা হয়, তবুও ওরা তৃপ্তি অনুভব করে না। ওদের তৃপ্তি মুক্ত বাতাসে। নীল আকাশে।

পারস্যের মহাবীর রুস্তমের নাম কে না জানে। ইতিহাসে যে-কজন সাহসী যোদ্ধার নাম পাওয়া যায়, রুস্তম তাদেরই একজন। যেমন ছিল তার শক্তি, তেমন ছিল তার বীরত্ব। সেই রুস্তমের সাথে একবার যুদ্ধ হলো সাহাবিদের। ইতিহাস সে যুদ্ধকে কাদেসিয়ার যুদ্ধ নামে চেনে। সাহাবিদের মোকাবিলা করার জন্যে রুস্তম তার বাহিনী প্রস্তুত করল। মুসলিম বাহিনীর সেনাপতি নিযুক্ত হলেন সাদ ইবনু আবী ওয়াক্কাস ﵁, আর পারস্যের সেনাপতিত্ব রুস্তম নিজেই গ্রহণ করল।

মুসলিমরা কেন পারস্যের মতো সুপার পাওয়ারের সাথে যুদ্ধ করতে এসেছে, তাদের উদ্দেশ্য কী, পারস্যের সাথে মোকাবিলা করার মতো সাহস তারা পেল কোথায়—এসব প্রশ্নের উত্তর জানার জন্যে একজন প্রতিনিধি পাঠাতে বলল রুস্তম। রিবিয়ি ইবনু আমির ﵁ মুসলিম বাহিনীর প্রতিনিধি নিযুক্ত হলেন। হালকা-পাতলা গড়নের একটি ঘোড়ায় চড়ে রুস্তমের রাজদরবারে পৌঁছোলেন তিনি। গায়ে কমদামি পোশাক দেখে রক্ষীরা তাঁকে আটকে দিল ফটকে। তারা বলল, 'তুমি কার সাথে দেখা করতে এসেছ, জানো? এই পোশাকে তোমাকে আমরা ভেতরে যাবার অনুমতি দিতে পারি না। যাও, পোশাক পাল্টে স্মার্ট হয়ে এসো।'

রিবিয়ি ﵁ কর্ণপাত করলেন না তাদের কথায়। পোশাকের মধ্যে কোনো সম্মান নেই, সম্মান হলো তাকওয়ার মধ্যে—এই শিক্ষাই নবিজি ﷺ তাঁদের দিয়েছেন। তাই তিনি বললেন, 'আমি স্বেচ্ছায় এখানে আসিনি। তোমাদের সেনাপতি

আমায় ডেকে পাঠিয়েছেন। যদি এভাবেই যেতে দাও তো যাব। নয়তো ফিরে যাব আমাদের শিবিরে।'

নতিস্বীকার করল দ্বাররক্ষীরা। তাঁকে ভেতরে প্রবেশ করার অনুমতি দেওয়া হলো। তবে শর্ত হলো তলোয়ার জমা দিতে হবে। রিবিয়ি ﷺ এবারও তাদের প্রস্তাব ফিরিয়ে দিলেন। রক্ষীরা পড়ল মহা-যন্ত্রণায়। এই লোকটা তাদের মুখের ওপর কথা বলছে! লোকটা কি জানে না, তারা সুপার পাওয়ার পারস্য-সম্রাটের লোক? লোকটা কি জানে না, যে-কোনো সময় তার গর্দান চলে যেতে পারে? তা হলে? এত সাহস কোথায় পেয়েছে এই বেদুইন?

শেষমেশ ওরা হার মেনে নিল রিবিয়ি-র দৃঢ়তার সামনে। ঘোড়ায় চড়েই রুস্তমের দরবারে প্রবেশ করলেন তিনি। রুস্তমের লাল গালিচা ছিঁড়ে গেল ঘোড়ার খুরের আঘাতে। উপস্থিত লোকেরা অবাক হলো এই দৃশ্য দেখে। এই লোকটার আগে রুস্তমের সামনে কেউই এমনটা করতে সাহস পায়নি। রিবিয়ি ﷺ যখন তলোয়ার দিয়ে কার্পেট ছিদ্র করে নিজের ঘোড়া বাঁধলেন, তখন তাদের চোখ যেন কপালে উঠে গেল। আজ যদি কেউ হোয়াইট হাউজে গিয়ে এমনটা করে, তো লোকজন তাকে দেখে অবাক হবে না? অবশ্যই হবে। সে সময়কার রুস্তমের রাজপ্রাসাদ আজকের হোয়াইট হাউজ থেকে কম কিসে।

রুস্তম বলল, 'আমাদের সাথে যুদ্ধ করার জন্যে তোমাদের কে পাঠিয়েছে?'

রিবিয়ি ﷺ নির্ভয়ে জবাব দিলেন, 'আল্লাহ! আল্লাহ আমাদেরকে এখানে আসার নির্দেশ দিয়েছেন।'

উত্তর শুনে ভুরু কুঁচকে গেল রুস্তমের। সে বলল, 'কী উদ্দেশ্য নিয়ে তোমরা এসেছ এখানে?'

তিনি বললেন, 'আল্লাহর ইচ্ছায় মানুষকে মানুষের দাসত্ব থেকে স্বাধীন করে এক আল্লাহর দাসত্বে নিয়োজিত করার জন্যে... ।'[১৮৫]

রিবিয়ি-র কাহিনিটা আপাতত এখানেই শেষ করে দিচ্ছি। এখন একটু অন্য প্রসঙ্গে কথা বলব। তার আগে একটা জিজ্ঞাসা—মাঝে মধ্যে তুমি যে নারী-স্বাধীনতার কথা বলো, সেই স্বাধীনতা জিনিসটা আসলে কী?

---

[১৮৫] ড. আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবি, উমর ইবনুল খাত্তাব, ২/২৯৭-২৯৮।

নিজের ইচ্ছেমতো চলাফেরা করা, এটাই তো বলবে তুমি?

আচ্ছা, তুমি কি সত্যিই নিজের ইচ্ছেমতো চলো সব সময়? সবখানেই কি নিজের চাওয়াকে প্রাধান্য দাও? পরিবার, সমাজ বা দেশ—কারোর কথাকেই গুরুত্ব দাও না? কারোর ধারই ধারো না? আচ্ছা সব বাদ দিলাম। নারী-স্বাধীনতার সংজ্ঞা যারা শিখিয়েছে, তাদের কথাও কি মেনে চলো না?

রাষ্ট্রীয় আইন তুমি অক্ষরে অক্ষরে মানো। সমাজের চোখে দৃষ্টিকটু কাজগুলো এড়িয়ে যাও সুকৌশলে। এমন অনেক বিষয় আছে, যেখানে তুমি পরিবারের বাইরে পা ফেলতে ভয় পাও। তোমার মুখ দিয়ে প্রগতির যেসব কথা বেরোয়, সেটাও তো অন্যের শিখিয়ে দেওয়া বুলি। তা হলে 'স্বাধীনতা'র সংজ্ঞাটা তুমি যেভাবে দাও, সেটা কি আদৌ বাস্তবসম্মত?

'আমি কোনো কিছুকে পরোয়া করি না', 'কারও কথায় চলি না', 'আই ডোন্ট কেয়ার'—এগুলো যে বলতে ভালো শোনায়, সে কথা আমি অস্বীকার করছি না। কিন্তু আদতে এসবের কোনো বাস্তব অস্তিত্ব আছে কি?

'আকাশ-পাতাল-মর্ত খুঁজিয়া' দেখলেও, তোমার ওই কল্পিত স্বাধীনতার কোনো অস্তিত্ব পাওয়া যাবে না। স্বাধীনতা বলতে যা বোঝাতে চাও, আসলে বাস্তবে তা সম্ভব না। আমরা কেউই সবক্ষেত্রে নিজের মনোমতো চলতে পারি না। পরিবার-সমাজ-রাষ্ট্রের সদস্য হিসেবে কোনো-না-কোনো নিয়ম মানতেই হয়। এমনকি ব্যক্তিজীবনেও আমরা স্বাধীন না।

তোমার লাইফস্টাইলের কথাই ধরো। নায়িকারা নিত্যনতুন যেসব পোশাক পরবে, সেটাকেই আধুনিক পোশাক মনে করো তুমি। এটাই কি স্বাধীন রুচির পরিচয়? লেগিং-প্লাজো-জিন্স—যখন যে ফ্যাশনটা আসবে পশ্চিম থেকে, ওটাই আমার লাগবে—এই ধরনের মনোভাব রাখার পর নিজেকে স্বাধীন দাবি করার কী যৌক্তিকতা আছে! এটা তো স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, তোমার মন অন্য কেউ নিয়ন্ত্রণ করছে। সারাক্ষণ আপ-টু-ডেট থাকা, আধুনিক থেকে অত্যাধুনিক হতে চাওয়া, আর্ট-কালচারের নামে যা-ই আসে, তা-ই মেনে নেওয়া—এটার নামই বুঝি স্বাধীনতা? 'পাছে লোকে কী বলে'—এই ডর তো অহরহ কাজ করে তোমার অন্তরে। রাষ্ট্র-সমাজ-মিডিয়া তোমাকে নিয়ন্ত্রণ করে চলছে। তুমি স্বেচ্ছায় সমাজের প্রচলন মেনে নিচ্ছ। মিডিয়ার ফ্যাশন অনুসরণ করছ।

আর্ট-কালচার, খ্যাতি, লৌকিকতা, ক্যারিয়ার—এদের আনুগত্য করে তোমার প্রতিটা দিন পার হচ্ছে। এরপরও ব্যক্তি-স্বাধীনতার বুলি আওড়ানোটা কি শাক দিয়ে মাছ ঢাকার চেষ্টা নয়?

বাক্-স্বাধীনতা, চিন্তার স্বাধীনতা, নারী স্বাধীনতা, নারীমুক্তি, এগুলো অনেক শুনেছি তোমাদের মুখে। কিন্তু এসবের আড়ালে কী লুকিয়ে আছে, সেগুলো কোনো দিন খোলাসা করোনি।

পশ্চিমারা যখন স্বাধীনতার তালিম দেয়, তখন তারা কেবল আভিধানিক অর্থের দিকে নির্দেশ করে না। ওদের এই শব্দের ভেতর লুকিয়ে থাকে একটা দর্শন, একটা জীবনাদর্শ। এসব বলে বলে ওরা তোমাকে ওদের জীবন-দর্শনের গোলাম বানাতে চায়। অবশ্য ইতিমধ্যেই তারা সফল। তোমার মন-মগজকে আয়ত্তে নেওয়ার বেলায় তারা কামিয়াব। এখন তো তুমি ওদের দেওয়া বাউন্ডারির বাইরে চিন্তাও করতে পারো না। তোমার মন-মগজ পুরোটাই ফিরিঙ্গিরা নিয়ন্ত্রণ করছে সুদূর দূরে বসেই। ওদের দেওয়া মাপকাঠির বাইরে সবকিছুকেই অনাধুনিক মনে হয়। সেকেলে মনে হয় দ্বীনের বিধিবিধানকে। পশ্চিমা (অ)সভ্যতার চোখ ধাঁধানো আলো রঙিন করে দিয়েছে তোমার চোখকে। সে চোখ দিয়ে ইসলামের অনেক কিছুই এখন আর জুতসই মনে হয় না।

বিশ্বাস হচ্ছে না?

চলো পরীক্ষা করি তা হলে।

ফিরিঙ্গি ফেমিনিস্টরা বলছে : নারী-পুরুষের মেলামেশার ব্যাপারে ইসলামের বিধান একেবারেই সেকেলে। ইসলাম অনেক কড়াকড়ি আরোপ করছে ফ্রি মিক্সিং বিষয়ে। ম্যাচুউর ছেলে-মেয়ে পারস্পরিক যোগাযোগ রাখতেই পারে। বিয়ের আগে নিজেদের মধ্যে ভালো একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং হতেই পারে দুজনের মধ্যে। এটা তো আহামরি কোনো অপরাধ না। এ নিয়ে বড্ড বাড়াবাড়ি করে মৌলবাদীরা।

তুমি বলছ : আরে, এভাবে তো ভেবে দেখিনি!

অথচ আল্লাহ স্পষ্ট করে বলেছেন :

"মুমিন পুরুষদের বলো—তারা যেন দৃষ্টিকে নত রাখে, এবং লজ্জাস্থান হেফাজত করে... আর মুমিন নারীদের বলো—তারা যেন দৃষ্টিকে নত রাখে, এবং লজ্জাস্থান হেফাজত করে...।"[১৮৬]

পশ্চিমারা বলছে : মেয়েদের পুরো শরীর ঢেকে রাখতে হবে, পরপুরুষের সামনে পর্দা করতে হবে—এসব তো রক্ষণশীল সমাজের রীতিনীতি। অনেক পুরোনো ধ্যান-ধারণা। ওসব অবরোধপ্রথা দূরে ঠেলে নারীদের প্রগতিশীল হতে হবে।

তুমি বলছ : পর্দা! অফ্, যেন জীবন্ত তাঁবু! এভাবে নাক-মুক ঢেকে নিজেকে আবদ্ধ রাখার কোনো মানেই হয় না। এই পর্দার দোহাই দিয়েই তো আমাদেরকে অবরোধবাসিনী করে রাখা হয়েছে যুগের-পর-যুগ ধরে।

অথচ ইসলামের রব বলছেন :

"হে নবি, তুমি তোমার স্ত্রীদেরকে ও কন্যাদেরকে এবং মুমিন নারীদেরকে বলে দাও, তারা যেন তাদের চাদরের কিছু অংশ নিজেদের ওপর টেনে নেয়। এতে তাদেরকে চেনা সহজ হবে। ফলে তাদেরকে উত্যক্ত করা হবে না। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"[১৮৭]

ফিরিঙ্গিরা বলছে : নারী-পুরুষ সবক্ষেত্রেই সমান। পুরুষ কখনো নারীর কর্তা হতে পারে না। নারী নিজেই নিজের কর্তা। সবক্ষেত্রে একক সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার একজন নারীর আছে।

তুমি বলছ : একদম ঠিক। ধর্মের কথা বলে বলে পুরুষবাদী সমাজ আমাদেরকে দমিয়ে রেখেছে। নারী-পুরুষের মধ্যে কোনো ভেদাভেদ নেই। দুজনেই সমান।

ইসলাম কী বলছে? ইসলামের রব বলছেন[১৮৮] :

"পুরুষ নারীর কর্তা। এটা এ জন্য যে, আল্লাহ তাদের একজনকে অন্যজনের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন এবং এ জন্য যে, পুরুষ নিজের ধন-সম্পদ ব্যয় করে। কাজেই সতী-সাধ্বী স্ত্রীরা আনুগত্যপরায়ণ হয়...।"[১৮৯]

[১৮৬] সূরা আন-নূর, (২৪) : ৩১-৩২ আয়াত।
[১৮৭] সূরা আহযাব, (৩৩) : ৫৯ আয়াত।
[১৮৮] পশ্চিমাদের তৈরি করা এসব বিভ্রান্তির ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে পড়ুন "ভ্রান্তিবিলাস" বইটি।
[১৮৯] সূরা নিসা, (০৪) : ৩৪।

নারীবাদীরা বলছে : একজন কন্যা পিতার সম্পত্তিতে ছেলের অর্ধেকটা পাবে, এটা মধ্যযুগীয় ধ্যান-ধারণা। সময় এসেছে এ ধারণা ছুড়ে ফেলে সামনে এগিয়ে যাওয়ার।

তুমি এ কথা শুনে 'হীরক রাজার দেশে' উপন্যাসের পুতুল কর্মচারীদের মতো 'ঠিক, ঠিক, ঠিক' বলে মাথা ঝাঁকাচ্ছ।

অথচ আল্লাহ তাআলা সাফ জানিয়ে দিয়েছেন :

> "তোমাদের সন্তানদের ব্যাপারে আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন—একজন পুরুষদের অংশ দুজন মেয়ের সমান। যদি (মৃতের ওয়ারিশ) দুয়ের বেশি মেয়ে হয়, তা হলে পরিত্যক্ত সম্পত্তির তিনভাগের দুভাগ তাদের দাও। আর যদি একটি মেয়ে ওয়ারিশ হয়, তা হলে পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধেক তার।"[১৯০]

আরও বলব?

নাহ থাক। নিজের কাছেই ভালো লাগছে না বলতে।

প্রতিটি উত্তর কি এটাই ইঙ্গিত করছে না—পশ্চিমা (অ)সভ্যতার অনুগত দাস তুমি! আর্ট-কালচারের নামে ওদের থেকে যা-ই আসে, তা-ই তুমি স্বাভাবিক বলে মেনে নাও। হোক সেটা নগ্নতা, বেডসিন, রেপসিন, সমকামিতা বা আরও ভয়ানক কিছু। ওরা বলবে, আঁটসাঁট পোশাক পরা আধুনিকতা; সাথে সাথে হিজাব ছুড়ে ফেলে গায়ে তুলে নেবে টি-শার্ট। ওরা বলবে, পরস্পরের সম্মতিতে ফিজিক্যাল রিলেশন দোষের কিছু না; সাথে সাথে লিটনের ফ্ল্যাটে চলে যাবে বয়ফ্রেন্ডকে সাথে নিয়ে। ওরা বলবে সমকামিতা স্মার্টনেস; তো দৌড়ে গিয়ে কোনো বান্ধবী জোগাড় করে ফেইসবুকে স্ট্যাটাস দিয়ে বলবে—Feeling lovely... এই তো তোমার স্বাধীনতার দৌড়!

একজন আলিম খুব সুন্দর করে বলেছেন,

> "এরা আসলে আল্লাহপূজারি নয়, প্রবৃত্তিপূজারি। দুনিয়ায় যদি মূর্তিপূজার আধিক্য দেখা দেয়, তো এরা নিশ্চিতভাবে মূর্তিপূজা শুরু করবে। দুনিয়ায় যদি নগ্নতার প্রচলন দেখা দেয়, তো এরা অবশ্যই

[১৯০] সূরা আন-নিসা, (০৪) : ১১ আয়াত।

পরিধেয় বস্ত্র খুলে ফেলবে। দুনিয়ায় যদি অপবিত্র বস্তু খাওয়া শুরু হয়, তো এরা নিঃসন্দেহে অপবিত্রতাকে বলবে পবিত্রতা, আর পবিত্রতাকে অপবিত্রতা। এদের মন-মগজ হচ্ছে (পশ্চিমাদের) গোলাম, তাই এরা গোলামির জন্যে উন্মুখ হয়ে বসে আছে। এদের জীবনে ফিরিঙ্গিপনার প্রাবল্য রয়েছে। এজন্যে—নিজেদের গোপন থেকে প্রকাশ্য—প্রতিটি ক্ষেত্রেই এরা ফিরিঙ্গি হতে ইচ্ছুক। আবার কাল যদি (আফ্রিকার) হাবশিদের প্রাধান্য দেখা যায়, তা হলে অবশ্যই এরা হাবশি হবার প্রয়াসে নিজেদের মুখমণ্ডলে কালি মেখে নেবে। ঠোঁটগুলো মোটা করে ফেলবে। মাথার চুল হাবশিদের মতো কোঁকড়ানো করবে। এবং (পশ্চিম থেকে আগত জিনিসের মতো) হাবশিদের কাছ থেকে আগত প্রতিটি জিনিসেরও পুজো শুরু করবে।"[১৯১]

তুমি যদি আল্লাহর বিধান মানতে না চাও, অসুবিধে নেই। সাড়ে সাত শ কোটি মানুষের মধ্যে ছয় শ কোটিকে যদি ইসলাম তার তালিকা থেকে বাদ দিতে পারে, তবে তোমার মতো নারী ইসলামে না থাকলে কীই বা আসে যায়! তোমার কাছে যদি মনে হয়—ইসলামের অনেক রুলস-রেগুলেশনে বাড়াবাড়ি (!) আছে, ওগুলোর সংস্কার প্রয়োজন; তবে আমি বলব : ইসলামের প্রাসাদে ঠাঁই নেওয়ার জন্যে কে জবরদস্তি করছে তোমার সাথে? ইসলামের প্রাসাদটা যদি জীর্ণশীর্ণই মনে হয়, তবে অযথা কেন আটকে থাকতে চাও এখানে? ফেমিনিজমের চোখ-ধাঁধানো প্রাসাদ তো খোলাই আছে। তোমায় বরণ করে নেওয়ার জন্যে হাজারও বুবুজান অপেক্ষা করছে ওখানে। সেখানে গিয়ে ঠাঁই নাও না। অযথা এই জরাজীর্ণ (!) প্রাসাদ ধরে টানাটানি করছ কেন?

এটা আঁকড়ে ধরে আমাদেরকে বাঁচতে দাও। এই প্রাসাদকে আমরা নতুনভাবে রাঙাতে চাই না। এমনকি প্রাসাদের একেকটি ইটের বদলায় ইটালিয়ান মার্বেল পাথরও বসাতে রাজি নই আমরা। কারণ, আমাদের সম্মান-স্বাধীনতা-সফলতা, সব এখানেই। সাড়ে চৌদ্দ শ বছর আগে নির্মিত এই জীর্ণশীর্ণ প্রাসাদের মধ্যেই আমাদের কামিয়াবি। এটা ছেড়ে আমরা হোয়াইট হাউজেও উঠতে রাজি নই। আমাদের নেতা উমর ইবনুল খাত্তাব ﵁ বলেছেন :

"একসময় আমরা অসহায়-তুচ্ছ ও লাঞ্ছিত ছিলাম। তারপর আল্লাহ আমাদেরকে ইসলামের মাধ্যমে সম্মানিত করেছেন। এরপর যদি

---

[১৯১] ইসলাম ও পাশ্চাত্য সভ্যতার দ্বন্দ্ব, মুহাম্মাদ হাবিবুর রহমান অনূদিত, পৃষ্ঠা : ১৬৪-৬৫।

আল্লাহর পথ ব্যতীত অন্য কোনো পথে ইজ্জত ও সম্মান লাভের চেষ্টা করি, তবে পুনরায় আল্লাহ আমাদেরকে লাঞ্ছিত করবেন।"[১৯২]

ঠিকই তো তুমি মানুষের বানানো রীতিনীতি মেনে চলছ। ২৪ ঘণ্টাই কোনো-না-কোনো নিয়ম অনুসরণ করছ। অথচ ইসলাম মানতে গেলে নাকি তোমার ব্যক্তি-স্বাধীনতায় আঘাত আসে।

নিকুচি করি তোমার স্বাধীনতার!

একবারও কি ভেবেছিলে, কেন আল্লাহর দেওয়া ফুরকান[১৯৩] বাদ দিয়ে ওদের তৈরিকৃত স্টান্ডার্ডের মাধ্যমে বিবেচনা করতে হবে সবকিছুকে?

কেন ইসলামি আদর্শ দূরে ঠেলে, বেহায়া-নির্লজ্জ পশ্চিমাদের আদর্শে ধুয়েমুছে সাফ করে ফেলতে হবে সবকিছু?

ওদের দেওয়া মাপকাঠিকেই কেন 'চূড়ান্ত সত্য' বলে মনে করতে হবে?

ওরা কি তোমার রব? তুমি কি ওদের দাস?

যদি ক্ষমতাধর সভ্যতাকেই লাইফস্টাইলের মাপকাঠি হিসেবে ধরতে হয়, তবে নবিদের কেন পাঠানো হয়েছিল? কেন আসমানি সমাধান দিয়ে বারবার জমিনে পাঠানো হয়েছিল জিবরাঈলকে? প্রিয় চাচার খণ্ড-বিখণ্ড দেহ কোলে নিয়ে কেন বাচ্চা শিশুর মতো কাঁদতে হয়েছিল ধরণির শ্রেষ্ঠ মানুষটিকে?

"এরপরেও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না?"[১৯৪]

তোমার ওই স্বাধীন (!) জীবন সম্পর্কে আমার খুব জানতে ইচ্ছে করে। খুব জানতে ইচ্ছে করে তোমার বাঁধনহারা লাইফস্টাইল সম্পর্কে। নারীবাদী আদর্শের অধীনে তোমার দাসত্বের জীবনটা কেমন চলছে, সেটা একটু পরখ করে দেখতে চাই আমি।

বোন আমার, যে জীবন আল্লাহর বিধানকে কোনো গুরুত্ব দেয় না, সে জীবনের কোনো মূল্য নেই। যে ব্যক্তি মহামহিম আল্লাহর হুকুমকে অবজ্ঞা করে, তার চেয়ে

[১৯২] এ কথাগুলো উমর ইবনুল খাত্তাব ﷺ আবু উবাউদা ﷺ-কে লক্ষ করে বলেছিলেন। [ইবনু কাসীর, ইসমাঈল ইবনু উমর, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৭/১১৪-১১৫]

[১৯৩] কুরআনের আরেক নাম হলো 'ফুরকান', ইংরেজিতে যাকে বলে 'দ্য স্ট্যান্ডার্ড'।

[১৯৪] সূরা হূদ, (১১) : ৩০।

বড় নিমকহারাম আর কেউ হতে পারে না। আল্লাহর দেওয়া অক্সিজেন নিয়ে, আল্লাহর দেওয়া খাবার খেয়ে, আল্লাহর জমিনে বসে, আল্লাহর হুকুমকেই বুড়ো আঙুল দেখাবে? এত স্পর্ধা তোমাকে কে দিল? কিসের নেশায় তুমি পরকালকে ভুলে গেলে? তুমি কি দুনিয়ার জীবনটাকেই বেশি ভালোবাসো?

> "এই ধরনের লোকেরা তো দুনিয়ার জীবনকে বেশি ভালোবাসে। আর তাদের সামনে (কিয়ামতের) যে কঠিন দিন আসছে, তাকে উপেক্ষা করে চলে।"[১৯৫]

মনে রেখো, 'The right to do or say what you want without anyone stopping you'—এইসব কিতাবি বয়ান দিয়ে, উপনিবেশবাদী অসভ্য লুটেরাদের তৈরি করা লাইফস্টাইলকে চোখ বুজে সত্য বলে মেনে নেওয়ার নাম স্বাধীনতা নয়। সমস্ত সৃষ্টির গোলামি থেকে মুক্ত হয়ে এক আল্লাহর বান্দা হয়ে যাওয়ার নামই স্বাধীনতা। এর দিকে আহ্বান করার জন্যেই রিবিয়ি ইবনু আমির-রা ছুটে গিয়েছিলেন রুস্তমদের দরবারে।

টিয়ে পাখিটিকে বড় খাঁচায় রেখে লাল মরিচ খাইয়েও সুখী করতে পারিনি। কারণ, ওর সুখ মুক্ত বাতাসের মধ্যে। বড় খাঁচার আবদ্ধ জীবনের মধ্যে নয়। তেমনই মানুষের সুখ নিহিত আছে স্বাধীনতার মধ্যে। মানসিকভাবে দাসত্বের জীবন পরিচালনা করে মানুষ কখনো সুখ পেতে পারে না। প্রশান্তি কেবল তখনই আসতে পারে, যখন মানুষ শত ইলাহের গোলামি থেকে মুক্ত হয়ে একমাত্র রব্বুল আলামীনের সামনে নত হবে। এটাই প্রকৃত স্বাধীনতা। এ স্বাধীনতার মধ্যেই লুকিয়ে আছে স্বর্গসুখ। আছে হৃদয়ের প্রশান্তি।

ছোটবেলায় 'স্বাধীনতার সুখ' নামে একটা কবিতা পড়েছিলে, মনে আছে? আমি একটু পড়ি?

বাবুই পাখিরে ডাকি, বলিছে চড়াই,
'কুঁড়ে ঘরে থাকি করো শিল্পের বড়াই,
আমি থাকি মহাসুখে অট্টালিকা পরে
তুমি কত কষ্ট পাও রোদ, বৃষ্টি, ঝড়ে।'
বাবুই হাসিয়া কহে, 'সন্দেহ কি তায়?

---

[১৯৫] সূরা ইনসান, (৭৬) : ২৭।

কষ্ট পাই, তবু থাকি নিজের বাসায়।
পাকা হোক, তবু ভাই, পরের ও বাসা
নিজ হাতে গড়া মোর কাঁচা ঘর, খাসা।'

চড়ুই পাখি প্যারাসাইট-এর মতো বাসা বাঁধে অন্যের ঘরে। অন্যের অট্টালিকা থেকে সুবিধে নেয়। কিন্তু বাবুই তা করে না। গোলামির জীবনের মধ্যে যে কোনো সুখ নেই, বাবুই এটা বুঝতে পারে। তাই সে বাসা বুনে নিজ হাতে। স্বাধীনচিত্তে ওই বাসায় অবস্থান করে। জীবনযাপন করে। অট্টালিকার ওপর থেকে চড়ুই হয়তো অহমিকা দেখাতে পারে, কিন্তু স্বাধীনতার সুখ উপলব্ধি করতে পারে না পুরোপুরিভাবে। বাবুই ওর চেয়ে ঢের বেশি গুণে স্বাধীনতার সুখ উপভোগ করে। আমি তোমাকে চড়ুই না হয়ে বাবুই হতে বলছি।

আসমানি আবরণ

কখনোই তোমার দিকে তাকানোর সাহস করিনি আমি। কারণ, ইসলাম আমায় সেই অনুমতি দেয়নি। তবে আমি ওদের দিকে তাকিয়েছি, যারা তোমার দিকে তাকিয়ে ছিল অপলক নয়নে। আমি ওইসব রিকশাওয়ালার দিকে তাকিয়েছি, যারা তোমার দিকে হা করে তাকিয়ে তাকিয়ে জিভের জল ফেলছিল। আমি ওইসব হেলপারের দিকে দৃষ্টি দিয়েছি, যারা তোমার শরীরের স্পর্শ নেওয়ার জন্যে ভাড়া তোলার সময় নিজেকে এলিয়ে দিচ্ছিল তোমার দিকে। আমি চেয়েছি ওইসব পথচারীদের দিকে, যারা বাজে বাজে মন্তব্য করছিল তোমার দেহসুষমা নিয়ে। কুদৃষ্টির শয়তানি তির দিয়ে ওরা সকলেই তোমায় শিকার করে যাচ্ছিল আপন-মনে।

'দৃষ্টি হলো শয়তানের তিরসমূহের একটি।'[১৯৬]

ওদের চোখে যৌনতার যে স্ফুলিঙ্গ আমি দেখতে পেয়েছিলাম, সেইটা তুমি দেখতে পাওনি। ওদের চাহনিতে কী যে বিষাক্তভাব লুকিয়ে থাকে, বোধহয় কোনো দিনই তা ধরতে পারোনি। পারবে কী করে বলো? তোমার সৌন্দর্য দেখে পরপুরুষরা পাগল হোক, এটাই তোমার পছন্দ। তুমি চাও, তোমার হাঁটার স্পন্দিত ভঙ্গি দেখে পথচারীরা হা করে তাকিয়ে থাকুক। তোমার রূপে পাগল

[১৯৬] হাকিম, আল-মুসতাদরাক : ৪/৩১৪

হয়ে শিস বাজাক বখাটে ছেলেছোকরারা। তোমার সেলফি দেখে মাস্টারবেশন করুক তোমারই কোনো ফেইসবুক ফ্রেন্ড।

তুমি বলতে পারো, আমি তো এইসব উদ্দেশ্য লালন করি না। মনে কোনো বাজে চিন্তা নেই আমার। অন্তর একদম পরিষ্কার। ফকফকা। আমি কাউকে আকৃষ্ট করার জন্যে রাস্তায় হাঁটি না। হাঁটি নিজের দরকারে। কাউকে আকর্ষণ করার জন্যে জিন্স পরি না। ভালো লাগে, তাই পরি।

বোন আমার, আমি তোমার উদ্দেশ্য নিয়ে প্রশ্ন তুলছি না। তোমার নিয়ত নিয়েও কোনো আপত্তি নেই আমার। কারণ, নিয়তের ব্যাপারে একমাত্র আল্লাহ তাআলাই অবগত আছেন। কিন্তু সমস্যা হলো তোমার হেঁয়ালিপনা নিয়ে। পোশাক-আশাকের ক্ষেত্রে একেবারেই অসচেতন তুমি। তোমার গায়ে এমন সব পোশাক শোভা পায়, যার মাধ্যমে দেহাবয়ব স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সবকিছু বোঝা যায় বাইরে থেকে। খুব সহজেই দেহাকৃতি পরিমাপ করে ফেলা যায়। সমস্যাটা এই জায়গাতেই। তুমি চাও বা না-চাও, তোমার চালচলনের কারণেই পুরুষরা তোমাতে আকৃষ্ট হয়। তোমার কাছে হয়তো সাজুগুজু করে বের হতে পারলেই আনন্দবোধ হয়। না সাজলে নিজেকে গেঁয়ো মনে হয়, সেকেলে মনে হয়। কিন্তু আমি তো এই জিনিসটাকেই সবচেয়ে ভয় করি বেশি।

"জাহিলি যুগের মতো নিজেদের প্রদর্শন করবে না।"[১১৭]

মহান আল্লাহ এই জিনসটাকে অবৈধ করেছেন তোমার জন্যে। জাহিলিয়াতের সময়কার মেয়েরা এই কাজটা করত। পুরুষের সামনে সেজেগুজে বের হতো। নিজেদের গোপন অঙ্গগুলোতে প্রসাধনী মেখে, সুন্দর সুন্দর পোশাক গায়ে দিয়ে পুরুষদের দেখানোর জন্যে বাইরে বেরোত ওরা। এমনকি নূপুরের আওয়াজ শোনানোর জন্যে পা ফেলত শব্দ করে। এই ধরনের বেহায়াপনাকে নিষেধ করা হয়েছে বারবার।

"আর তারা যেন তাদের গোপন সৌন্দর্য প্রকাশের উদ্দেশ্যে সজোরে পদচারণা না করে।"[১১৮]

তুমি তো জাহিলিয়াতের যুগে বাস করছ না? তবে কেন ওসব করে বেড়াও, বলবে একটু?

---

[১১৭] সূরা আহযাব : ৩৩ আয়াত।
[১১৮] সূরা নূর : ৩১ আয়াত।

ফেইসবুকে তোমার দেওয়া সেলফি কত যুবকের ঘুম হারাম করে দেয়, সেটা কি জানো? রাস্তার কতজন মানুষ তোমার দৈহিক সৌন্দর্য দেখে যৌন-সুড়সুড়ি অনুভব করে, সেটা উপলব্ধি করেছিলে কোনো দিন? তুমি শুধু অপরের জন্যেই ক্ষতিকর নও, নিজের জন্যেও ক্ষতিকর। তোমার এই উশৃঙ্খলতা কেবল পরপুরুষকেই যিনাকারী বানাচ্ছে না, তুমি নিজেও চলে যাচ্ছ ওদের দলে।

> "যে নারী সুগন্ধি মেখে বের হয় এবং কোনো সম্প্রদায়কে অতিক্রম করলে তারা তার সুবাস পায়, তা হলে সে হলো ব্যভিচারী।"[১৯৯]

যিনার কথা শুনে চমকে উঠলে নাকি?

আমি জানতাম, কথাটা শুনেই রেগে যাবে তুমি। বলবে—'কই, আমি তো কোনো পুরুষের সাথে রাত কাটাইনি! তবে আমায় যিনাকারী বলে ডাকলেন কেন? কেন দিলেন এই মিথ্যে অপবাদ?'

দেখো বোন, তোমায় রাগাবার জন্যে কথাটা বলিনি। আমি তো হাদীসের বাস্তবতা বুঝিয়েছি। কেবল পরপুরুষের সাথে রাত কাটানোটাই ইসলামের দৃষ্টিতে যিনা নয়। খারাপ চোখে কোনো গাইরে মাহরামের দিকে তাকানোটাও যিনা। মুখ দিয়ে যৌনতা-সম্পর্কিত খারাপ কথা বলাটাও যিনা। এমনকি অন্তর দিকে যৌনরাজ্যে বিচরণ করাটাও সমানতালে যিনা।

> "দুই হাত যিনা করে। হাতের যিনা হচ্ছে স্পর্শ করা। দুই পা যিনা করে। (পা দিয়ে) অগ্রসর হওয়াই হচ্ছে পায়ের যিনা। মুখও যিনা করে। চুমু খাওয়া হচ্ছে মুখের যিনা। কানের যিনা হচ্ছে (অশ্লীল) আলাপ শোনা।"[২০০]

এতদিন তুমি যিনা বিষয়ে যে ধারণা পোষণ করতে, তা ভুল ছিল। আর ভুল ছিল বলেই অজান্তে নিজের নামটা লিখিয়ে ফেলেছ ব্যভিচারীর কাতারে। যিনাকারীর তালিকায় কখন যে তোমার নাম উঠে গেছে, খেয়ালই করোনি হয়তো। আসলে যিনার ভয়াবহতা সম্পর্কে জানো না তুমি। জানো না, যিনা কতটা ঈমান-বিধ্বংসী জিনিস। যদি জানতে, তবে হয়তো টনক নড়ত।

---

[১৯৯] হাকিম, আল-মুসতাদরাক, ২৭০১; হাসান।
[২০০] আবু দাউদ, আস-সুনান, ২১৫৩, ২১৫৪; সহীহ।

"ব্যভিচারী ব্যক্তি ব্যভিচারে লিপ্ত থাকা অবস্থায় মুমিন থাকে না।"[২০১]

আল্লাহ কখনোই চান না, তাঁর কোনো বান্দা যিনাকারী হয়ে যাক। এই জন্যেই তিনি বারবার সতর্ক করেছেন বান্দাকে। যিনা করা তো দূরের কথা, যিনার ধারেকাছে যেতেও তিনি নিষেধ করেছেন।

"তোমরা যিনার ধারেকাছেও যেয়ো না। নিশ্চয় তা অশ্লীল কাজ ও মন্দ পথ।"[২০২]

যিনার কাছাকাছি হওয়া বলতে কী বোঝো? যেসব জিনিস যিনার পথকে সুগম করে দেয়, তার কোনোটির নিকটবর্তী হওয়া যাবে না। যেসব জিনিস অন্যের অন্তরে যিনার খাহেশাত জাগ্রত করে, সেগুলো থেকেও নিজেকে বাঁচিয়ে চলতে হবে। কিন্তু তুমি কি আর তা মানবে? আল্লাহর বিধান তো তোমার কাছে পত্রিকায় আসা কোনো খবরের মতো। ইচ্ছে হলে বিশ্বাস করবে, ইচ্ছে হলে ছুড়ে ফেলবে।

আজ তুমি নিজের সৌন্দর্য প্রকাশ করে দিচ্ছ অন্যের সামনে। নিজের পোশাক-আশাক নিয়ে গর্ব করছ। আর শরীরে দামি পারফিউমের সুগন্ধি নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছ এদিক-ওদিক। বালেগ হওয়ার পর থেকে তুমি শত শত বার সৌন্দর্য প্রকাশ করে বাইরে বেরিয়েছ। সুগন্ধি মেখে পুরুষকে আকৃষ্ট করেছ নিজের দিকে। বিশ্বাস করো, পর্দাবিহীন অবস্থায় যতক্ষণ বাইরে ছিলে, ততক্ষণ তোমার নামে গোনাহ লেখা হয়েছে। এবার তোমার গোনাহের পরিমাণ হিসেব করে দেখো। আমি নিশ্চিত, তুমি গুনে তা শেষ করতে পারবে না।

তুমি হয়তো জানোই না তোমার অবহেলার কারণে যুবকদের হৃদয়ে কী ধরনের প্রভাব পড়ছে। কোনো যুবক হয়তো সালাত আদায়ের জন্যে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু তোমার দিকে দৃষ্টি পড়ায় তার অন্তরটা দুমড়ে মুচড়ে গেছে। ফলে সে ঠিকভাবে সালাতেও মনোযোগী হতে পারেনি! কোনো কিশোর হয়তো চোখ নিচু করে পথ চলছিল। কিন্তু তোমার দেহের সুগন্ধি ওকে চোখ তুলে তাকাতে বাধ্য করেছে। নিজের অজান্তেই তোমার সাথে তার চোখাচোখি হয়েছে। হয়তো যিনার কল্পলোকে হারিয়ে গেছে ছেলেটি। এ রকম কত মানুষের ঈমানি স্বাদ তোমার দিকে তাকানোর কারণে মুছে গেছে, তা কি জানো? তোমার কারণে

[২০১] মুসলিম, আবুল হোসাইন ইবনুল হাজ্জাজ, আস-সহীহ, অধ্যায় : ঈমান, ১/১১০, ১১৬, ১১৭।
[২০২] সূরা আল-ইসরা, (১৭) : ৩২।

কতজনের দৃষ্টির খেয়ানত হয়ে গেছে, তা কি জানা আছে? নিজের অজান্তেই কত স্বামীকে তার স্ত্রী থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়ার পাপ তুমি অর্জন করেছ, তার কোনো ইয়ত্তা নেই।

বোন আমার, একটিবার নিজের আমলনামার দিকে তাকাও। ওখানে যে অনবরত যিনার গোনাহ লেখা হচ্ছে। যতবার তুমি সুগন্ধি মেখে বাইরে বেরোচ্ছ, ততবারই লেখা হচ্ছে গোনাহ। যিনাকারীর তালিকায় তোমার নাম চলে যাচ্ছে।

তুমি এমন এক কবীরা গুনাহে লিপ্ত, যা তোমার দৃষ্টিতে একেবারেই ছোট। কিন্তু আল্লাহর কাছে তা পাহাড়সম। এভাবেই তুমি অশেষ পাপের চক্রে পতিত। তোমার আমলনামায় অনেক অনেক গোনাহ জমা হয়ে গেছে। কারণ তুমি কখনোই গোনাহ থেকে তাওবা করোনি। বেপর্দায় চলাফেরা করার কারণে কখনো অনুশোচনা আসেনি হৃদয়ে।

একবার এক মহিলা পারফিউম লাগিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল রাস্তা দিয়ে। আবু হুরায়রা ﵁ তাকে ডেকে বললেন, 'প্রতাপশালী আল্লাহর বান্দী! তুমি কি মসজিদে যাচ্ছ?' মহিলা বলল, 'হ্যাঁ।' আবু হুরায়রা বললেন, 'এ জন্যেই কি সুগন্ধি মেখেছ?' মহিলা উত্তর দিল, 'জি, হ্যাঁ।' আবু হুরায়রা ﵁ বললেন, 'ফিরে যাও। গোসল করো। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, "কোনো মহিলা যদি মসজিদের উদ্দেশ্যে (বেরোবার সময়) সুগন্ধি লাগিয়ে বের হয়, তা হলে যতক্ষণ না সে ঘরে ফিরে এসে গোসল করছে, ততক্ষণ তার সালাত আল্লাহ কবুল করবেন না।"'[২০০]

মসজিদের উদ্দেশ্যে সুগন্ধি ব্যবহার করে রাস্তায় বেরোলে যদি ইবাদত কবুল না হয়, তা হলে যারা পরপুরুষকে প্রলুব্ধ করার জন্যে পারফিউম মাখে, তাদের ব্যাপারে কী ফয়সালা হবে?

সুগন্ধি ব্যবহারকারী নারীর দিকে পুরুষরা কামনার দৃষ্টিতে তাকায়। এতে চোখের ব্যভিচার হয়। কখনো কখনো তাদের ভেতরকার সুপ্ত বাসনা জেগে ওঠে। ফলে এমন ফিতনায় পতিত হয়, যা তাদেরকে মাস্টারবেশনের দিকে ঠেলে দেয়।

বোন আমার, পারফিউমের সুবাস অনবরত তোমার শরীর থেকে পাওয়া যায়। রাস্তার টুকাইগুলো তোমার সুগন্ধির সুবাসে মাতোয়ারা হয়ে থাকে। আমি কি

---

[২০০] আবু ইয়া'লা, আল-মুসনাদ; সহীহ।

তোমায় বলিনি, এই ধরনের নারীদেরকে আল্লাহর রাসূল কী উপাধি দিয়েছেন? একটু আগেই বলেছি। হাদীসের পরিভাষায় এরা হলো 'ব্যভিচারী নারী'!

পারফিউম নিয়ে অনেক্ষণ বকরবকর করলাম। এইবার আসল কথায় আসি। আচ্ছা, তোমার পোশাকের এত বেহাল দশা কেন? কেন এমন পোশাক পরো, যার দ্বারা দেহের আকৃতি সবটা বোঝা যায়? এমন আঁটসাঁট পোশাক পরতে কি একটুও রুচিতে বাধে না?

নবিজির একটা হাদীস শুনাই। নবি ﷺ বলেছেন, "দু-প্রকার জাহান্নামীকে আমি এখনো দেখিনি : ১) এমন এক সম্প্রদায়, যাদের হাতে গরুর লেজের মতো চাবুক থাকবে। যা দিয়ে তারা মানুষজনকে প্রহার করবে। ২) এমন এক শ্রেণীর মহিলা, যারা *পোশাক-পরিহিতা উলঙ্গ।* (তারা পরপুরুষকে) নিজেদের প্রতি আকর্ষণ করবে ও নিজেরাও (পরপুরুষের প্রতি) আকৃষ্ট হবে।... এ ধরনের মহিলারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না এবং তার সুগন্ধও পাবে না। অথচ জান্নাতের সুগন্ধ এত এত দূরত্বের পথ থেকে পাওয়া যাবে।"[২০৪]

হাদীসের মর্মার্থটা একটু বোঝার চেষ্টা করো। প্রথমেই খেয়াল করো এই অংশটুকুর দিকে—'পোশাক-পরিহিতা উলঙ্গ', এর অর্থ কী? পোশাক পরেও কি মানুষ উলঙ্গ হয়? পোশাক তো মানুষ নিজের লজ্জাস্থানকে আবৃত করার জন্যেই পরে। তবে এর মানে কী?

এর মানে হলো : কোনো নারী যদি এমন পোশাক পরে যা শরীরের সাথে আঁটসাঁট হয়ে থাকে এবং শরীরের আকৃতি প্রকাশ করে দেয়, তা হলে সে যেন কিছুই পরল না। সে যেন উলঙ্গ। টাইট-ফিট জামা নারীর সৌন্দর্য প্রকাশ করে দেয়। দেহসুষমা পুরোটাই বোঝা যায় বাইরে থেকে। এই জন্যে বিবস্ত্র নারীর চেয়েও সে বেশি ফিতনার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। সম্পূর্ণ উলঙ্গ নারী হলে তো মানুষ পাগল মনে করে পাশ কাটিয়ে চলে যাবে। কিন্তু আঁটসাঁট জামাপরিহিতার দিকে মানুষ বারবার নজর বুলাবে। চোখের যিনা পুরোটাই পূর্ণ করে নেবে এর মাধ্যমে। এ জন্যেই ভেতর থেকে শরীর দেখা যায় এমন জামা পরলে, সে নিশ্চিতভাবেই 'পোশাক-পরিহিতা উলঙ্গ' বলে বিবেচিত হবে। সে বিবসনা নারীর চেয়েও বেশি অপরাধী।

---

[২০৪] মুসলিম, ২১২৮।

আঁটসাঁট যে পোশাক মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, চাঁদের আলোয় ঝলমল করতে থাকা কারুকার্যখচিত যে জামা অন্তর কেড়ে নেয়, সেটা খ্যাতির পোশাক। যে উজ্জ্বল গহনা ও অলংকার শরীরকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে, যেসব কসমেটিক মানুষের বাহ্যিক অবয়বকে আকর্ষণীয় করে উপস্থাপন করে, সেগুলোর সবটাই খ্যাতির পোশাকের অংশ। আর এগুলো মানুষকে জাহান্নামে নিয়ে যাবে।

> "যে ব্যক্তি কোনো খ্যাতির পোশাক পরবে আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাকে অনুরূপ পোশাক পরিয়ে জাহান্নামে জ্বালিয়ে দেবেন।"[২০৫]

নারীদেহের অবয়ব বোঝা যায়, এ রকম যে-কোনো পোশাক পরা মানে আল্লাহর আদেশ লঙ্ঘন করা। আর পরপুরুষকে আকৃষ্ট করার জন্যে রঙ-বেরঙের পোশাক গায়ে দেওয়া তো ভয়ানক অপরাধ। অনেক বড় মাপের গুনাহ এইটি।

তুমি হয়তো এখন বলবে, 'আরে মশাই, থামুন। অনেক হয়েছে। সেই কখন থেকে আমাকে যিনাকারী, ব্যভিচারী বলে অপবাদ দিয়ে যাচ্ছেন। আপনি কি দেখেননি, আমি সব সময় হিজাব পরে বাইরে বেরোই? যেখানেই যাই, হিজাব পরে যাই। জিন্স পরলে কী হবে, মাথায় ঠিকই হিজাব থাকে। এমনকি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেও হিজাব খুলিনি কখনো। তবে আমার নামে কেন বাজেকথা বলছেন?'

বোন আমার, ইয়া লম্বা ত্যানা মাথায় পেঁচিয়ে উটের কুঁজের মতো বানানোর দ্বারা তোমার দুইটা গুনাহ হয়েছে। প্রথমত, তুমি হিজাবের বিধানকে বিকৃত করেছ। দ্বিতীয়ত, তুমি জাহান্নামীদের মতো সেজেছ। যারা নিজেদের মাথাকে উটের কুঁজের মতো করে সাজায়, তারা জাহান্নামী।

> "... যাদের মাথার খোপা বুখতি উটের পিঠে-থাকা উঁচু কুঁজের মতন, তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না এবং জান্নাতের গন্ধও পাবে না। অথচ জান্নাতের সুগন্ধি অনেক দূর থেকে পাওয়া যায়।"[২০৬]

চিন্তা করেছ, এই ধরনের সাজসজ্জা গ্রহণের পরিণাম কতটা ভয়াবহ! অথচ এটাই তোমার নিত্যদিনের পোশাক। এটাকেই হিজাব বলে চালানোর চেষ্টা করো। এটাকে বড়জোর স্কার্ফ বলা যেতে পারে, হিজাব না। হাত আমাদের দেহের একটা অংশ। কোনোভাবেই হাত মানে পুরো দেহ নয়। তেমনি স্কার্ফ হিজাবের একটি অংশ। এটা পরা মানেই হিজাবি হয়ে যাওয়া নয়।

---

[২০৫] ইবনু মাজাহ, আস-সুনান, ৬৫২৬; হাসান।
[২০৬] মুসলিম, ৭০৮৬।

একটুকুরো কাপড় মাথায় জড়িয়ে নিজেকে হিজাবি মনে করাটা আল্লাহ বিধানের সাথে উপহাস করার শামিল। একখণ্ড কাপড় মাথায় জড়ালেই হিজাবের নির্দেশ পালন হয়ে যায় না। হিজাব একটুকরো বস্ত্রের নাম নয়। বরং তা হলো নারী ও পুরুষের মধ্যিকার এক 'বিশেষ অবস্থা'র নাম। যার দ্বারা একটি অন্তরাল তৈরি হয় দুজনার মধ্যে। মিটে যায় অবাধ মেলামেশা ও পাপাচারের রাস্তা।

হিজাব বলতে কী বোঝায়, তা এখনো পরিষ্কার নয় তোমার কাছে। পর্দা বলতে অবরোধপ্রথা বোঝো তুমি। তুমি মনে করো, অন্ধকুঠুরিতে নারীকে আবদ্ধ করে রাখার পুরুষালি কৌশল হলো পর্দা। তাই তো পর্দাকে এড়িয়ে চলো। তুমি ভাবো, পর্দা নিজের কাছে। পর্দার জন্য বিশেষ কোনো বিধান বা বিশেষ কোনো পোশাকের প্রয়োজন নেই। মন ভালো, তো সব ভালো।

বোন আমার, তোমার ধারণাগুলো ভুল। হিজাব শুধু পোশাকের কোনো আবরণ নয়। বরং সামগ্রিক একটি জীবনব্যবস্থা। একটি আদর্শের প্রতিফলন। শিষ্টাচারের পরিচায়ক। ইসলামি মূল্যবোধের আইডিকার্ড। নারী-পুরুষের অবৈধ সম্পর্ক এবং নারীর প্রতি সমাজের সহিংস মনোভাব রোধের বিভিন্ন কৌশল রয়েছে এর মধ্যেই। হিজাব শব্দটা কেবল পোশাকি পর্দাকেই নির্দেশ করে না। এটি আসলে ব্যাপক অর্থ বহন করে। কলুষতামুক্ত সমাজ বিনির্মাণে ইসলামের বিভিন্ন বিধানাবলির বাস্তবায়নকেই মূলত পর্দা বা হিজাব বলা হয়।

এসকল দিকের সমন্বয়েই পর্দার বিধান পূর্ণতা পায়। মাথায় একটুখানি কাপড় জড়ানোকে হিজাব বলে চালিয়ে দেওয়া নিঃসন্দেহে আল্লাহর বিধানের সাথে প্রতারণা। মনে রেখো, হাজারটা বিড়াল মিলেও একটা সিংহের সমান হতে পারবে না। তুমি যত বড় কাপড়ই মাথায় প্যাঁচাও না কেন, ওটাও কখনো হিজাবের আওতায় আসবে না। হিজাব সেটাই, যা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল নির্ধারণ দিয়েছেন। যতই জোড়াতালি দিয়ে স্কার্ফকে হিজাব বানানোর চেষ্টা করো না কেন, কিচ্ছুটি আসে যায় না। তোমার ওই মনগড়া ব্যাখ্যার কানাকড়িও মূল্য নেই ইসলামে। মূল্য নেই উটের কুঁজ সদৃশ মস্তকপট্টির। এগুলো দিয়ে জান্নাত কামানোর স্বপ্ন দেখো না।

হিজাবের বিধানকে বিকৃত করার আগে নতুন করে আবার ভাবো। মুসলিম দাবি করার পর নিজের মুখ দিয়ে এমন সব কথা বের কোরো না, যারা দ্বারা ঈমানের শেষ বিন্দুটুকুও বিলীন হয়ে যায়। তুমি তো ঈমানদার। তোমার মুখ দিয়ে কেন

এমন কথা বেরোবে, যা আল্লাহর শত্রুদেরকে সন্তুষ্ট করবে? কেন তুমি হিজাবের ধারণাকে বিকৃত করবে সমাজে?

তুমি যতই বলো না কেন, অন্তর ভালো থাকলে পর্দা করা জরুরি না—এ সবই পাগলামো ছাড়া কিছুই নয়। আল্লাহ তাআলা নিজে বলে দিচ্ছেন, পর্দা হলো তোমাদের অন্তরের জন্যে পবিত্রতার কারণ। তোমার অন্তরটা আসলে ফ্রেশ কি না, তার বহিঃপ্রকাশ ঘটবে পর্দা বা হিজাবের মাধ্যমে।

> “তোমরা তাদের কাছে কিছু চাইলে পর্দার আড়াল থেকে চাইবে। এটা তোমাদের অন্তরের জন্যে এবং তাদের অন্তরের জন্য অধিকতর পবিত্রতার কারণ।”[২০৭]

এখন হয়তো তুমি বলতে পারো, আপনার এসব সংকীর্ণ চিন্তাভাবনা শিকেয় তুলে রাখেন। ছেলেমেয়ে একে অন্যের কাছে আসার সুযোগ পায় না বলেই সমাজে নানাবিধ সমস্যা হয়। যেসব ছেলেরা মেয়েদের সাথে মেশে না, ওরাই যিনা-ব্যভিচার বেশি ঘটায়। যারা নারীদের পাশাপাশি থাকে, নারীদেহের প্রতি ওদের এতটা আকর্ষণ থাকে না। সহাবস্থানের কারণে আস্তে আস্তে তা কমে যায়। কিন্তু যারা ফ্রি-মিক্সিং-এ অভ্যস্ত না, ওরাই ইভটিজিং আর রেইপের মতো খারাপ কাজে বেশি জড়ায়। বিপরীত লিঙ্গের সাথে মেলামেশা, কথাবার্তা বলা, আলোচনা করা, একত্রে বসা, কাজ করা ইত্যাদি অভ্যাসের মাধ্যমে মনটা ফ্রেশ রাখা যায়। এ রকম মেলামেশা বিপরীত লিঙ্গের প্রতি ভদ্রতা শেখার এবং ব্যবহারকে নম্র করে তোলে।

বকওয়াস! সব মিথ্যে কথা। যে আল্লাহ আমাদের সৃষ্টি করেছেন, তিনি মন ফ্রেশ রাখার মাপকাঠি হিসেবে পর্দাকেই নির্ধারণ করেছেন, ফ্রি-মিক্সিংকে নয়। আল্লাহর কথার বিপরীতে কোনো মানুষের কথা গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। কারণ আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। আর সৃষ্টির দুর্বলতাগুলোর ব্যাপারে স্রষ্টাই সম্যক অবগত। তিনি জানেন, কোন কোন পথ দিয়ে শয়তান আমাদেরকে আক্রমণ করে বসবে। কোন পথে গেলে নৈতিকতার চরম অবক্ষয় ঘটবে, চরিত্র কলুষিত হবে, তা তিনি ভালোভাবেই জানেন। তাই তাঁর দেওয়া মানদণ্ডের বাইরে গিয়ে যতই এককাঠি সরেস কথা বলা হোক না কেন, সেটা বাতিল। আমি তোমাকে একটি বাস্তব পরিসংখ্যান দেখাচ্ছি। আমি চাচ্ছিলাম

[২০৭] সুরা আহযাব, ৩৩ : ৫৩।

না, এই বইতে তত্ত্ব-তথ্যের ঝনঝনানি থাকুক। কিন্তু তোমার এই গোয়ার্তুমির কারণে আমাকে পরিসংখ্যান আনতেই হচ্ছে।

তোমার স্বপ্নের দেশ আমেরিকার উপাত্তটা আগে শোনাই। ওদের দেশে ফ্রি মিক্সিং কিংবা ওপেন সেক্স খুবই সাধারণ বিষয়। সামাজিকভাবে লিভ টুগেদার সেখানে বৈধ। কিন্তু এরপরও কি খুব শান্তিতে আছে ওরা? প্রায় ২৫% নারী তাদের কলেজজীবনে ধর্ষণের শিকার হচ্ছে।[২০৮] ২০১৬ সালে আমেরিকান সেনাবাহিনীতে প্রায় ১৫০০০ যৌন-সহিংসতার খবর পাওয়া গেছে। প্রায় সাড়ে চার লাখ মানুষ প্রতি বছর যৌন-নিগ্রহের শিকার হয় আমেরিকায়। যাদের বেশিরভাগের বয়স ১২-৩৪ এর মধ্যে। প্রতি ৭৩ সেকেন্ডে কোনো-না-কোনো আমেরিকান নাগরিক যৌন-সহিংসতার শিকার হয়।[২০৯]

কী, এবার কী বলবে? নারী-পুরুষকে কাছাকাছি অবস্থানের সুযোগ দিয়ে কি থামাতে পারবে এই অবক্ষয়? নেদারল্যান্ডে তো পতিতালয় ব্যাঙের ছাতার মতো। ওদের প্রতি ২৪ জনের একজন হলো যৌনকর্মী।[২১০] এত পরিমাণে অবাধ যৌনতার ছড়াছড়ি থাকা সত্ত্বেও ওরা কি ধর্ষণ বন্ধ করতে পেরেছে? ওদের দেশের ২২% নারী একবার হলেও ধর্ষকের কবলে পড়ে।[২১১] আর পতিতাদের অমানবিক অত্যাচারের কথা না হয় না-ই বললাম। এবার আসো ল্যাটিন আমেরিকার কথা বলি। নাহ্ থাক, এটা তো কোনো রিসার্চ পেপার না, তাই আর বলব না। আসলে বুদ্ধিমানের জন্যে ইশারাই যথেষ্ট। বুঝলে বুঝপাতা, না বুঝলে তেজপাতা।

চলো, একটু বিজ্ঞানের জগৎ থেকে ঘুরে আসি। কিছুক্ষণ বিজ্ঞান-শরীফের তালিম দিলে আমার কথাকে গুরুত্ব দেবে।

তোমার শরীরের একটা নম্বর আছে, যেইটা সবচেয়ে আকর্ষণীয়। এটাকে নম্বর না বলে অনুপাত বললে ভালো হবে। সেই অনুপাত হলো ০.৭। নিতম্ব আর

---

[২০৮] Robin Hattersley-Gray, The Sexual Assault Statistics Everyone Should Know; https://www.campussafetymagazine.com/safety/sexual-assault-statistics-and-myths/

https://www.campussafetymagazine.com/safety/sexual-assault-statistics-and-myths/?fbclid=IwAR2eOCAl_

[২০৯] https://www.rainn.org/statistics/victims-sexual-violence?fbclid=IwAR2eOCAl_ AwQhKYeAulW2AHxOBKT5ceZWocX6yik7bpzyG78_Sjbfm1I2zg

[২১০] http://www.aidsinfoonline.org/gam/stock/shared/dv/PivotData_2018_7_22_636678151 733621264.htm

[২১১] https://nltimes.nl/2018/01/15/fifth-dutch-women-victims-sexual -violence-report

কোমরের অনুপাত যদি হয় ০.৭, তো সেইটা সবচেয়ে বেশি আকর্ষণীয় ফিগার। এই অনুপাত সুস্থতা ও প্রজনক্ষম থাকার জন্যেও বেশ ভালো।

একবার হলো কী, গবেষকরা কিছুসংখ্যক মেয়েকে বসিয়ে দিলেন পুরুষের সামনে। এরপর ইনফ্রারেড ক্যামেরার মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন তারা। সেই ক্যামেরায় ধরা পড়ল, সব পুরুষই নারীর বুক আর কোমরের দিকে প্রথম চোখ দিচ্ছে। সবচেয়ে বেশি সময় ধরে চোখ আটকে থাকছে এই দুটি জায়গাতেই। তবে বুকের দিকে তাকানোর প্রবণতা ছিল অত্যধিক বেশি। পুরুষরা যখন নারীদেহের দিকে ড্যাবড্যাব করে তাকানোর সুযোগ পাচ্ছে, তখন ওদের মস্তিষ্কে ডোপামিনের বন্যা বয়ে যাচ্ছে। উত্তেজিত হচ্ছে সেক্সের জন্যে। নেশাখোররা নেশাদার দ্রব্য সামনে পেলে যেমনটা উত্তেজিত হয়, ঠিক তেমন করে। এই ধরনের যৌনানুভূতি তৈরি হতে এক সেকেন্ডেরও কম সময় লাগছে। চোখের পলকেই রূপের মাধুরী দেখে পুরুষরা হারিয়ে যাচ্ছে কল্পনার নীল জগতে।[২১২]

এবার বলো তো, তোমার উশৃঙ্খল চলাফেরা কি ধর্ষণের জন্যে কোনোভাবেই দায়ী নয়? তুমি যখন কিছুটা খোলামেলাভাবে চলাচল করো, তখন কত কত পুরুষের মাথায় খারাপ চিন্তা আসে, ভেবেছ কি কোনো দিন? কত যুবকের মস্তিষ্কে ডোপামিনের দোলদোলানি শুরু হয়, চিন্তা করেছ কখনো? টাইট-ফিটিং পোশাক পরে বেসামালভাবে হাঁটার দায় কি চোখবুজে এড়িয়ে যেতে পারবে? তোমার নিতম্বের গঠন দেখে যদি কেউ লালায়িত হয়ে এগিয়ে আসে, এর জন্যে কি তোমার কোনো দায় নেই?

'মন যা চায়, তা-ই পরব'—এই দাবি তো বিজ্ঞানও সমর্থন করছে না। জীবনঘনিষ্ঠ বিজ্ঞানের দাবি হলো এমন পোশাক পরা, যার মাধ্যমে তোমার কোমর আর নিতম্বের অনুপাত কোনোভাবেই প্রকাশিত না হয়। তুমি যদি পুরুষের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু না হতে চাও, তবে অবশ্যই আঁটসাঁট পোশাক বাদ দিতে হবে। এমন ঢিলেঢালা পোশাক পরতে হবে, যাতে করে শরীরের অবয়ব স্পষ্ট বোঝা না যায়।

এরপর যদি বলি তোমার পারফিউমের কথা। ঘ্রাণ যেখান থেকেই আসুক না কেন, আমরা তার উৎস খুঁজে বের করি। আর সেটা যদি সুঘ্রাণ হয়, তবে তো

[২১২] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19688590

কথাই নেই। গবেষণায় দেখা যায়, সুগন্ধি মস্তিষ্কের ওইসব জায়গাকে উত্তেজিত করে যেগুলো যৌন-আকাঙ্ক্ষার সাথে জড়িত। এর ফলে অন্তরে কামনা জেগে ওঠে। এগুলো আমার কথা না। তোমার প্রিয় বিজ্ঞান-শরীফের দেওয়া তথ্য।

একবার একদল প্রেমিকের সাক্ষাৎকার নেওয়া হলো। তারা সবাই জানিয়েছে, প্রেমিকার পারফিউমের গন্ধে তারা যৌনমিলনের জন্যে উত্তেজিত হয়েছে।[২১৩] কত কত পুরুষ যে তোমার অঙ্গসৌরভ নিয়ে ফ্যান্টাসিতে ভোগে, তার হিসেব রাখো?

শুধু পারফিউম না, তোমার চুল, চোখের পলক, হাত—সবকিছু দিয়েই ছেলেরা আকৃষ্ট হয়। করার কিছুই নেই। সৃষ্টিগত আকর্ষণ এটা। যারা Trichophile, তারা ফ্যান্টাসিতে ভোগে চুল দেখে। যারা Oculophile, তারা চোখ দেখে। Pygophile-রা নিতম্ব দেখে আকৃষ্ট হয়। আচ্ছা, এভাবে না বলে একটা বক্সে দিয়ে দিচ্ছি। তা হলে বুঝতে সুবিধে হবে।[২১৪]

প্রকার	যে জিনিসে আকর্ষিত হয়
Nasophile	নাক
Oculophile	চোখ
Olfactophile	শরীরের গন্ধ
Podophile	পা
Pygophile	নিতম্ব
Trichophile	চুল
Mazophile	স্তন
Toucherist	স্পর্শ

তুমি কিভাবে বুঝবে, তোমার পাশের লোকটি কোন ধরনের মানসিকতা লালন করে? বয়ফ্রেন্ড নাম দিয়ে যার সাথে ঘুরঘুর করো, ওর মনের মধ্যে কী চলছে তা কী দিয়ে মাপবে? ও যে ঝোপ বুঝে কোপ মেরে দেবে না, তার নিশ্চয়তা কী?

---

[২১৩] https://www.cosmopolitan.com/style-beauty/beauty/advice/a2013/scents-that-seduce/

[২১৪] বিস্তারিত জানার জন্যে পড়ুন ডা. শামসুল আরেফীনের "মানসাঙ্ক" বইটি।

প্রত্যেকটা মানুষেরই অন্তর থাকে। সেই অন্তরের হদিস বাইরে থেকে নেওয়া যায় না। ওটা কেবল ব্যক্তি নিজেই জানে। কোন জিনিসের বাসনা হৃদয়মন্দিরের সবকিছু উথাল-পাথাল করে দিচ্ছে, তা কি আর বাইরে থেকে বোঝা যায় কখনো? অন্তর কোনো আইন মানে, কোনো বিধিনিষেধ মানে না। মানে কোনো সীমারেখা। সে চলে আপন গতিতে।

অন্তরে যৌনতার ইচ্ছে সবারই আছে। কিন্তু কে কোন জিনিস দেখে আকর্ষিত হয়, তা কেবল ব্যক্তি নিজেই জানে। তোমার আশেপাশে হাজার হাজার মানুষ। কিশোর-তরুণ থেকে নিয়ে বয়োবৃদ্ধ—এদের কার মনে কী সুর বেজে যাচ্ছে, শুনতে পাও কি তুমি? কে কোন জিনিসে আকৃষ্ট হয়ে হৃদয়রাজ্যে তোমায় নিয়ে যিনার স্বপ্ন বুনছে, সেটা কী করে টের পাবে। পরপুরুষের হৃদয়রাজ্যের যৌনরানি হওয়া থেকে বেঁচে থাকতে চাইলে অবশ্যই নিজেকে হিজাবের আবরণে ঢেকে নিতে হবে।

> "হে নবি, তুমি তোমার স্ত্রীদেরকে, কন্যাদেরকে এবং মুমিন নারীদেরকে বলো—তারা যেন তাদের জিলবাবের কিছু অংশ নিজেদের ওপর টেনে নেয়। এতে করে তাদেরকে চেনা সহজ হবে। ফলে তাদেরকে উত্যক্ত করা হবে না। আর আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"[১১২]

বোন আমার, তুমি যে ঈমানদার নারী, এটা সহজেই বোঝা যায় হিজাব বা পর্দার মাধ্যমে। পর্দা হলো তোমার আইডিকার্ড। পর্দাই তোমার রক্ষাকবচ। অপ্রীতিকর অবস্থা থেকে বাঁচতে চাইলে অবশ্যই পর্দার ঢাল সাথে রাখতে হবে। এর বাইরে গিয়ে তুমি যত প্রচেষ্টাই চালাও না কেন, লাভ নেই। অন্য কোনো উপায়েই তুমি যৌন-সহিংসতা কমাতে পারবে না। থামাতে পারবে না সভ্যতার অবক্ষয়। অবাধ মেলামেশা থেকে জন্ম নেয় যৌন-লালসা। আর যৌন-লালসা যৌন-সহিংসতা সৃষ্টি করে।

নারী-পুরুষের মধ্যে গভীর আকর্ষণ বিদ্যমান। এ আকর্ষণ চিরন্তন। এটা আসমান থেকেই দেওয়া হয়েছে। এই আকর্ষণ স্তিমিত হতে পারে ক্ষণিক সময়ের জন্যে। কিন্তু শীঘ্রই তা ফিরে আসে। আর যতবারই আকর্ষণ অনুভূত হয় ততবারই যৌন-বাসনা জাগ্রত হয়। মন তখন শারীরিক সম্পর্কের দিকে আহ্বান জানায়। দেহ যদি আহ্বানে সাড়া দিতে না পারে, তা হলে শরীর ভেঙে পড়ে। অনুভূতিশক্তি দুর্বল

[১১২] সূরা আহযাব, ৩৩ : ৫৯।

হয়ে যায়।

বিপরীত লিঙ্গের সাথে কিছু সময় মেলামেশা করলে অবশ্যই একটা অদৃশ্য সম্পর্ক সৃষ্টি হবে। পরবর্তীকালে এ সম্পর্কের সাথে মিশ্রণ ঘটবে আবেগের। আবেগ রূপ নেবে ভালোবাসায়। ভালোবাসা থেকে হয়ে যাবে গভীর প্রণয়। এরপর এমন এক নিষিদ্ধ জগতে দুজন হারিয়ে যাবে, যেখানে যিনা ছাড়া আর কিছুই নেই। তারপর সারাক্ষণ ভয়ে থাকবে—কখন না-জানি প্রেমিক তোমাকে ছেড়ে চলে যায়। আর যদি আসলেই দুইজনের মধ্যে ব্রেকাপ হয়, তা হলে বড়সড়ো একটা ধাক্কা খাবে। মানসিকভাবে বিধ্বস্ত হয়ে পড়বে। পরিবারের সদস্যদের সাথে সার্বক্ষণিক সমস্যা লেগেই থাকবে। আর মহান রবের সাথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন তো আরও আগেই থেকেই হয়ে আছে।

এ কারণে ইসলামি জীবনদর্শন প্রবৃত্তি দমন করার জন্যে কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এগুলো কামনা জাগ্রত হওয়ার শেকড়কে উপড়ে ফেলে। যেসব মাধ্যম দিয়ে যৌনহাওয়া বয়ে এসে কামনাকে উদ্‌বেলিত করে, সেসব মাধ্যম বন্ধ করে দেয় চিরতরে। আসলে আল্লাহ তাআলা আমাদের অনেক ভালোবাসেন। আমাদের কোনো ক্ষতি হোক, তা তিনি চান না। আমরা যেন দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ লাভ করি, সেই জন্যেই তিনি কিছু বিধিবিধান দিয়েছেন। পর্দার বিধানটিও আল্লাহ তাআলা নাযিল করেছেন।

আসমান থেকে জিবরাঈল এই বিধান নিয়ে অবতরণ করেছেন। এটা মহান আল্লাহর হুকুম। অবশ্যপালনীয় একটি বিধান। এরপরেও কেন একে অবজ্ঞা করবে? আসমান থেকে যে আবরণ তোমার জন্যে নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে, সেটা ছুড়ে ফেলে কি নিজেকে মুনাফিক প্রমাণ করতে চাও? তোমার কি ভয় হয় না? নাকি আখিরাতকে তুমি বিশ্বাস করো না? নাকি নিজ সৌন্দর্যের ওপর এতই অগাধ বিশ্বাস যে, জাহান্নামের ভয়াবহ আযাবের কথা ভুলে গেছ? আল্লাহর কসম করে বলছি, যদি অহংকার দেখিয়ে আমার কথাগুলো এড়িয়ে যাও, তা হলে তুমি ধ্বংস হয়ে যাবে। নিজের মধ্যে লুকোনো মুনাফিকি স্বভাবের কারণে জাহান্নামের অতল তলে ঠাঁই হবে তোমার।

> “তোমাদের মাঝে সবচেয়ে নিকৃষ্ট নারী হচ্ছে বেপর্দা অহংকারী নারীরা। এরাই মুনাফিক নারী।”[২১৬]

---

[২১৬] বাইহাকি, আস-সুনানুল কুবরা, ৩৩৩০; সহীহ।

তুমি কি আল্লাহর নাযিল-করা পর্দার বিধানকে অপ্রয়োজনীয় মনে করো? যদি তাই হয়, তবে সাবধান হয়ে যাও। নয়তো কিয়ামতের দিন সব আমল বরবাদ হয়ে যাবে।

> "এটা এ জন্যে যে, আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন তা তারা অপছন্দ করে, ফলে আল্লাহ্ তাদের আমলসমূহ বিনষ্ট করে দেবেন।"[২১৭]

বোন আমার, নিজের সৌন্দর্য প্রকাশ করার সাধ প্রতিটা মেয়ের অন্তরেই আছে। কিন্তু তাই বলে পরপুরুষের সামনে সব খুলে দেখিয়ে দিতে হবে? পতিতাদের মতো নিজের সম্ভ্রম বিকিয়ে দিতে হবে অন্যের পদতলে?

এখানেই থেমে যাও। বন্ধ করো এই নাটকীয়তা। পুরুষদের দৃষ্টি আকর্ষণের উদ্দেশ্যে পোশাক পরার কোনো মানেই হয় না। একটুকরো কাপড় মাথায় দিয়েই কি তুমি বেঁচে যাবে শয়তানি চক্রান্ত থেকে? না, বোন! এটা তো শুরু মাত্র। এর মাধ্যমে তুমি শয়তানি ওয়াসওয়াসার বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করতে পারবে। তবে এটাই যথেষ্ট না। যেদিন থেকে নিজেকে আবৃত করে নেবে পর্দার আবরণে, সেদিন থেকে তোমার যুদ্ধাস্ত্র পূর্ণতা পাবে। কুদৃষ্টির বিষাক্ত তির আর শয়তানি চক্রান্তের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে পারবে বীরবিক্রমে। এই যুদ্ধে তুমি রয়ে যাবে অপরাজেয়, যদি আল্লাহর দেওয়া পর্দার বিধানকে পরিপূর্ণভাবে আঁকড়ে ধরতে পারো।

হিজাব তোমার প্রতিরক্ষা ব্যূহ। হিজাবি নারীর দেহসুষমা কেমন, তা শুধু তার স্বামীই বুঝতে পারবে। কামুক পুরুষের লুলোপ দৃষ্টি থেকে হিজাব তাকে আড়াল করে রাখবে। কামনার তির লক্ষ্যচ্যুত হয়ে ফিরে আসবে। কিন্তু যে নারী বেপর্দা চলে, সে হলো খোলা বইয়ের মতো। যেটা সবার হাতে হাতে স্থানান্তরিত হয়। প্রত্যেকের চোখ এর লাইনগুলো পড়ে ফেলে। যখন সবাই বইটা পড়ে ছেড়ে দেয়, তখন তার সৌন্দর্য বিলীন হয়ে যায়। পৃষ্ঠাগুলো হয়ে যায় মলিন। পুরাতন পুরাতন লাগে বইটি। এ বই কোনো রাজকীয় গ্রন্থাগারে শোভা পায় না।

হিজাব উত্তম চারিত্রিক গুণাবলির ব্যানার। এটা একটা আদর্শিক পরিচয়। তুমি কোন জীবনদর্শন অনুসারে চলো, তার পচিয়বাহক। তুমি যে মুসলিম নারী, তার পরিচিতিই হলো হিজাব।

---

[২১৭] সূরা মুহাম্মাদ, ৪৭ : ৯।

> "এটা অধিক নিকটবর্তী যে, তাদেরকে চেনা যাবে। ফলে তাদেরকে কষ্ট দেওয়া হবে না।"[২১৮]

"তাদেরকে চেনা যাবে"—এতটুকুই সবকিছুর সারমর্ম। প্রত্যেক মুসলিম মেয়েকে চেনা যায় তার সমুজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব দিয়ে। লজ্জাশীলতা ও উত্তম চরিত্র দিয়ে। আর এসবের বহিঃপ্রকাশ ঘটে পর্দা বা হিজাবের মাধ্যমে। সবচেয়ে সম্মানিত, মর্যাদাবান ও সর্বোত্তম মেয়ে কারা, তার বাস্তব চিত্র ফুটে ওঠে হিজাব পরিধানের মধ্য দিয়ে। হিজাবি মেয়েরা এই বার্তা দিয়ে যায় যে, তারা অন্যান্য মেয়েদের থেকে অনেক সম্ভ্রান্ত। তাদের জীবনাচার মানুষের জন্যে অনুসরণীয়, অনুকরণীয়।

বোরখা-জাতীয় পোশাক শুধু একটা জামা না। এটা একটা জীবন-পদ্ধতি। যে এটা পরবে, সে একটা জীবন-পদ্ধতির পরিচয় মানুষের সামনে তুলে ধরবে। সে তার চলন-বলনে খুবই সতর্ক হবে। হাঁটা থেকে শুরু করে কথাবার্তা—সবই সে করে যাবে যথাযভাবে। এমনকি তার গলার আওয়াজও যথাযথ হবে।

> "যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় করে থাকো, তা হলে (পরপুরুষের সাথে) কোমল ও আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে কথা বোলো না। যাতে অন্তরের ব্যাধিতে আক্রান্ত কোনো ব্যক্তি প্রলুব্ধ হয়ে পড়ে। বরং তোমরা সঙ্গত কথাবার্তা বলবে।"[২১৯]

হিজাব মূলত নারীর শারীরিক ও বস্তুবাদী অংশ গোপন রাখে। এর ফলে তার চরিত্রের মানবিক দিকটাই শুধু প্রকাশিত হয়। হিজাব পরিধানের অর্থ নিজের ব্যক্তিত্বকে প্রকাশ করা। সে যেন পুরুষকে বলতে থাকে, 'আমি তোমার চিন্তা ও বিবেকের সাথে কথা বলছি। তবে তোমার প্রবৃত্তিকে স্পর্শ করিনি একটুও।' এর মাধ্যমে পুরুষের মর্যাদাও বাড়িয়ে দেয় সে। তাকে প্রবৃত্তির শিকার হওয়ার পরিবর্তে ভাবনার জগতে প্রবেশ করায়। জমিন আবাদ করার ক্ষেত্রে সে হয়ে ওঠে পুরুষের সহযাত্রী।

প্রিয় বোন, একটু ভাবো; যৌবনের অপরূপ গোধূলি একদিন ম্লান হয়ে যাবে। উদয়াচল অস্তাচলে গিয়ে ঠেকবে। বিদায় নিবে তারুণ্যের দীপ্তমান সূর্যটা। এরপর তো অন্ধকার আসবেই। ঠেকাবে কী দিয়ে?

---

[২১৮] সূরা আহযাব, ৩৩ : ৫৯।
[২১৯] সূরা আহযাব, ৩৩ : ৩২।

যৌবনটা আল্লাহর দেওয়া নিয়ামত। এই নিয়ামতকে তুমি আল্লাহর বিধান অবজ্ঞা করার পেছনে দিয়ে দেবে? তারুণ্যের রূপলাবণ্য দিয়ে আল্লাহর হুকুমের বিরুদ্ধাচারণ করবে? তুমি তো চাইলেও যৌবনকে চিরদিন ধরে রাখতে পারবে না। চামড়া তোমার কুঁচকাবেই। টসটসে দেহ একদিন থুরথুরে হয়ে যাবে। রূপের ঝলক মিটে যাবে। এরপর ঠিকই তোমাকে হিজাবের আবরণে জড়িয়ে দেওয়া হবে। তুমি না চাইলেও তোমার পুরো দেহ ঢেকে দেওয়া হবে সফেদ কাপড় দিয়ে। কিন্তু তখন তুমি আর জীবিত থাকবে না। নিথর লাশে পরিণত হবে।

লাশ অবস্থায় হিজাব পরার আগেই কি তুমি সঠিক পদক্ষেপটি নেবে না?

সাজিয়ে নাও গো তোমায়,

পর্দার আবরণে,

সাজো নূতন সাজে ধরায়,

আসমানি আভরণে।

হোক দৈন্যবিমোচন হে নবজীবন,

লজ্জার সুপ্তধনে।

বেদনা ঘুচিয়ে দাও, পুলক ফিরিয়ে পাও,

জান্নাতী সম্মিলনে।

তবুও অনেক দেরি হয়ে যাবে

হুমায়ূন আহমেদ তার এক বইতে বলেছিলেন—'মৃতদেহ নিয়ে যে গাড়ি যায়, সেই গাড়ির দিকে সবাই খুব আগ্রহ নিয়ে তাকায়। গাড়িতে একটা লাল নিশান উড়ে। লাল নিশান মানেই শব বহনকারী গাড়ি। তবে সবাই আগ্রহ নিয়ে তাকালেও মৃতদেহের মুখ কেউ দেখতে চায় না। মৃতদেহ নিয়ে যারা যাচ্ছে, তাদেরকে দেখতে চায়। মৃত মানুষ দেখে কী হবে? মৃত মানুষের কোনো গল্প থাকে না। মানুষ গল্প চায়।'

সত্যিই, আমরা গল্প খুব পছন্দ করি। তাই জীবনের অনেকটা সময় অনর্থক গল্পগুজবের পেছনে কাটিয়ে দিই। যেসব গল্পে আমার জন্যে শিক্ষণীয় কিছুই নেই, সেগুলোও বাদ দিই না। যেসব গল্প সুড়সুড়ি দেয়, সেগুলোও এড়িয়ে যাই না। অথচ এমন অনেক গল্পই আছে, যা আমার হিদায়াতের কারণ হতে পারে, আমাকে আমার রবের নিকটবর্তী করে দিতে পারে। কিন্তু ভুলেও সেগুলোর দিকে নজর দিই না।

আজ তোমায় একটি গল্প বলি। তবে গল্পটা নিজের কল্পনা থেকে বানানো নয়, সত্যি গল্প। গল্পটা[২২০] রাসূলুল্লাহ ﷺ বর্ণনা করেছেন। গল্পটা সে সময়ের, যখন বিচারের মাঠ কায়েম হবে। একে একে বিচার হবে সব বান্দাদের। আর বিচারক হবেন আহকামুল হাকিমীন—আল্লাহ। স্থাপন করা হবে মিজান। মানুষের নেক

[২২০] বুখারি, ৭৬৯; মুসলিম, ৩৫৭-৩৭০।

ও বদ আমলকে ওজন করা হবে মিজানের পাল্লায়। যার নেকির পাল্লা ভারী হবে, সে হবে সফল। আর যার নেকির পাল্লা হালকা হবে, সে হবে ক্ষতিগ্রস্ত। এভাবে সব বান্দাদের বিচার শেষ হবে। জান্নাতীরা জান্নাতে চলে যাবে, আর জাহান্নামীরা জাহান্নামে। এরপর আর কাউকে জান্নাত থেকে বের করে দেওয়া হবে না, জাহান্নাম থেকে মুক্তিও দেওয়া হবে না।

একজন লোক জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যিখানে থেকে যাবে। তার চেহারা থাকবে জাহান্নামের দিকে, আর পিঠ থাকবে জান্নাতের দিকে। জাহান্নামের উত্তপ্ত আগুন তার চেহারাকে ঝলসে দেবে। যন্ত্রণায় সে চিৎকার দিয়ে উঠবে। তার ঝলসানো চেহারা ফিরিয়ে দেওয়া হবে। কিন্তু আগুনের উত্তাপে তা আবার ঝলসে যাবে। এভাবে চলতে থাকবে। আগুনের উত্তাপ না সইতে পেরে লোকটি আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করে বসবে। সে বলবে, 'রব আমার, জাহান্নাম হতে আমার চেহারা ফিরিয়ে দিন। এর দূষিত হাওয়া আমাকে বিষিয়ে তুলছে। এর লেলিহান শিখা আমাকে যন্ত্রণা দিচ্ছে।'

এভাবে সে বলতেই থাকবে, বলতেই থাকবে। আল্লাহ তাআলা তার ডাকে সাড়া দেবেন। তিনি বলবেন, 'তোমার নিবেদন গ্রহণ করা হলে এ ছাড়া আর কিছু চাইবে না তো?'

আল্লাহ তাআলার কথা শুনে লোকটি খুশি হয়ে যাবে। সাথে সাথে বলে উঠবে, 'না, আপনার ইজ্জতের শপথ! আমি আর কিছুই চাইব না।'

এই ওয়াদা দেওয়ার পর তার চেহারা জান্নাতের দিকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। সে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলবে। লোকটি যখন জান্নাতের দিকে তাকাবে, তখন জান্নাতের অপার সৌন্দর্য তার সামনে ভেসে উঠবে। জান্নাতের নয়নাভিরাম দৃশ্য তাকে আকৃষ্ট করবে। তার মনটা জান্নাতের দিকে ঝুঁকে যাবে। সে চাইবে মহামহিম আল্লাহকে কিছু বলতে, কিন্তু তার ওয়াদা তাকে বলতে বাধা দেবে।

এমন কিছু চাহিদা আছে, যা চাইলেও দমন করে রাখা যায় না। জান্নাতের চাহিদা কি সে ধরনের চাহিদার চাইতেও বেশি নয়?

আমাদের উদ্দেশ্যই তো জান্নাত। সে জন্যেই তো আমরা দুনিয়ায় এসেছি। সে জন্যেই এত কষ্ট করে যাচ্ছি। অন্যের টিটকারি, উপহাস চোখ বুজে সয়ে নিচ্ছি। তাই তো লোকটি আর চুপ করে থাকতে পারবে না। তার অন্তরে তোলপাড় শুরু

হয়ে যাবে। সে বলে উঠবে, 'রব আমার, আপনি আমাকে জান্নাতের দরজার কাছে পৌঁছে দিন।'

আল্লাহ তাআলা তাকে পূর্ব প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করিয়ে বলবেন, 'তুমি পূর্বে যা চেয়েছিলে তা ছাড়া আর কিছু চাইবে না—এই বলে তুমি কি অঙ্গীকার আর প্রতিশ্রুতি দাওনি?'

আল্লাহ তাআলার কথা শুনে লোকটি চুপ হয়ে যাবে। কিন্তু জান্নাত তাকে আকৃষ্ট করতেই থাকবে। তার হৃদয় দুমড়ে-মুচড়ে যাবে। লজ্জা ভুলে গিয়ে সে বলবে, 'রব আমার, আমাকে আপনার সবচেয়ে হতভাগা সৃষ্টি বানাবেন না।'

আল্লাহ তাআলা তাৎক্ষণিক জবাব দেবেন, 'তোমার এ ইচ্ছে পূর্ণ করা হলে এ ছাড়া আর কিছু চাইবে না তো?'

সে বলবে, 'না, আপনার ইজ্জতের শপথ! এ ছাড়া আমি আর কিছুই চাইব না।'

এভাবে সে বলতেই থাকবে। আল্লাহ তাআলাকে ওয়াদা ও প্রতিশ্রুতি দেবে। এরপর দয়াময় আল্লাহ তাকে জান্নাতের দরজার কাছে পৌঁছে দেবেন।

জান্নাতকে বাইরে থেকে দেখেই যে ব্যক্তি সইতে পারেনি, জান্নাতের অভ্যন্তরীণ নিয়ামত দেখে সে কিভাবে চুপ করে থাকবে! জান্নাতের অনাবিল সৌন্দর্য ও নির্মল পরিবেশ দেখে ঝড় বয়ে যাবে লোকটির অন্তরে। জান্নাতে প্রবেশের ইচ্ছে তার মধ্যে প্রবল হবে। কিন্তু সে পূর্বেকার ওয়াদার কথা মনে করে চুপ থাকবে। সে বারবার জান্নাতের দিকে তাকাবে আর ভাববে—হায়, আমিও যদি জান্নাতীদের একজন হতে পারতাম! আমিও যদি জান্নাতের নিয়ামত ভোগ করতে পারতাম! তার অন্তরে তোলপাড় শুরু হয়ে যাবে। একটা সময় সে আর নিজেকে ধরে রাখতে পারবে না। চিৎকার দিয়ে বলে উঠবে, 'রব আমার, আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দিন।'

লোকটির কথা শুনে মহামহিম আল্লাহ বলবেন, 'আদম-সন্তান, কী আশ্চর্য! তুমি কতটা ওয়াদা ভঙ্গকারী! তোমাকে যা দেওয়া হয়েছে তা ছাড়া আর কিছু চাইবে না—এই বলে কি আমার সাথে অঙ্গীকার করোনি? প্রতিশ্রুতি দাওনি?'

সে বলবে, 'রব আমার, আমাকে আপনার সবচেয়ে হতভাগা সৃষ্টি বানাবেন না।'

এভাবে সে আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করতেই থাকবে। তার কথা শুনে আল্লাহ তাআলা হেসে উঠবেন। সুবহানাল্লাহ! যে রব হাসেন, তাঁর থেকে বান্দা কল্যাণ ছাড়া আর কী আশা করতে পারে। আল্লাহ তাআলা তার প্রতি দয়া করবেন। তাকে জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দেবেন। লোকটি জান্নাতে প্রবেশ করবে। এরপর আল্লাহ তাআলা বলবেন, 'চাও।'

লোকটি একের-পর-এক চাইতে থাকবে। সে যা যা চাইবে, সবই তাকে দেওয়া হবে। এভাবে চাইতে চাইতে একসময় তার আকাঙ্ক্ষা ফুরিয়ে যাবে। আর চাওয়ার মতো কিছু খুঁজে পাবে না। তখন কী হবে, জানো? স্বয়ং আল্লাহ তাআলা তাকে বিভিন্ন জিনিসের কথা স্মরণ করিয়ে দেবেন। আর বলবেন, 'এটা চাও, ওটা চাও।'

আল্লাহু আকবার! তুমি এমন রবকে কিভাবে ভুলে যাও, যিনি তাঁর ইলম থেকে বান্দাদেরকে সাহায্য করেন? বান্দা চাইতে চাইতে ঠিকই ক্লান্ত হয়ে যায়, কিন্তু আল্লাহ দিতে দিতে ক্লান্ত হন না। এমন দয়াময় রবকে কিভাবে ফাঁকি দাও? তোমার কি একটুও লজ্জা লাগে না?

এভাবে আল্লাহ তাআলা লোকটিকে স্মরণ করাতে থাকবেন, আর লোকটি চাইতে থাকবে। আল্লাহ তাআলা স্মরণ করাতে থাকবেন, আর লোকটি চাইতে থাকবে। অবশেষে আর চাওয়ার মতো কিছু থাকবে না। তখন আল্লাহ তাআলা বলবেন, 'এসব তোমার, তার সাথে আরও দশগুণ (তোমাকে দেওয়া হলো)।'

একটু ভাবো তো—আমরা যে লোকটির কাহিনি শুনছি, সে সর্বশেষে জান্নাতে প্রবেশকারী ব্যক্তি। তার পরে আর কেউ জান্নাতে প্রবেশ করবে না। সবশেষে জান্নাতে প্রবেশ করলেই যদি তাকে এত নিয়ামত দেওয়া হয়, তা হলে যারা তারও আগে জান্নাতে প্রবেশ করবে তাদেরকে কী দেওয়া হবে? এ লোকটিই যদি তার চাওয়ার থেকে দশগুণ বেশি পায়, তা হলে তারা কতগুণ বেশি পাবে?

সুবহানাল্লাহ! জান্নাতীদের নিয়ামত কি গুনে শেষ করা যাবে?

বোন আমার, তুমি কি এমন জান্নাতে প্রবেশ করতে চাও না? তোমার কি ইচ্ছে করে না সেই সৌভাগ্যবানদের একজন হতে, যাদেরকে স্বয়ং আল্লাহ মেহমানদারি করবেন?

> "তাদের (জান্নাতীদের) গায়ে থাকবে সবুজ পাতলা রেশমি কাপড় ও নকশা-করা পুরো রেশমি কাপড়। অলংকার হিসেবে তাদের পরানো হবে রুপোর কঙ্কণ। আর তাদের প্রভু তাদেরকে বিশুদ্ধ পানীয় পান করাবেন।"[২২১]

যদি এই লোকটির মতো বিচারকার্য শেষে তোমায় জাহান্নাম থেকে বের করে জান্নাতে দেওয়া হয়, তবুও তো অনেক দেরি হয়ে যাবে। তোমার আগেই অগণিত মানুষ পৌঁছে যাবে জান্নাতে। ডুবে থাকবে জান্নাতী নিয়ামতের সাগরে। তুমি তো পিছিয়ে পড়বে তাদের থেকে। তবে কেন সে চেষ্টা করবে না, যাতে মৃত্যুর পর-পরই তোমার ঠাঁই হয় জান্নাতে?

> "তোমরা এগিয়ে যাও তোমাদের প্রতিপালকের ক্ষমা ও সেই জান্নাত লাভের তরে, যার প্রশস্ততা আসমান ও জমিনের মতো। আর তা প্রস্তুত করা হয়েছে—যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলদের প্রতি ঈমান আনে তাঁদের জন্যে। এটি আল্লাহর অনুগ্রহ। তিনি যাকে ইচ্ছে তা দান করেন। আল্লাহ বড়ই অনুগ্রহশীল।"[২২২]

[২২১] সূরা ইনসান, ৭৬ : ২১।
[২২২] সূরা হাদীদ, (৫৭) : ২১।

তুমি ফিরবে বলে

আর আট দশটা বাবা-মা'র মতো শিপম্যানের বাবা-মা-ও সন্তানকে ডাক্তার বানানোর স্বপ্ন দেখেছিল। কিন্তু সন্তানকে মেডিক্যালে ভর্তি করানোর আগেই ওর মা মারা গেল। হাল ছাড়লেন না বাবা। ছেলেকে ভর্তি করিয়ে দিলেন লিডসের এক মেডিক্যাল কলেজে। যথারীতি কমপ্লিট হলো তার গ্র্যাজুয়েশান।

শিপম্যান তার কর্মজীবনে প্রবেশ করল আবরাহাম ওমেরড মেডিক্যাল সেন্টারের মাধ্যমে। আস্তে আস্তে এই মেডিক্যাল সেন্টারের গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন হলো সে। কিন্তু কিছুদিন যেতে-না-যেতেই অদ্ভুত সব কাণ্ড ঘটতে লাগল। ওর অধীনে চিকিৎসা নিতে আসা রোগীদের মৃত্যুহার বাড়তে লাগল রহস্যজনকভাবে। রহস্য আরও জট পাঁকাল যখন তুচ্ছ কারণে অসুস্থ হয়ে যাওয়া বয়স্ক মহিলারাও লাশ হয়ে ফিরে যেতে লাগল। গঠন করা হলো মেডিক্যাল ইনকুয়েরি বোর্ড। শুরু হলো রোগীদের মৃত্যুর সঠিক কারণ অনুসন্ধানের কাজ।

তদন্তের মাধ্যমে জানা গেল, শিপম্যান রোগীদের হত্যা করেছে মরফিনের লিথাল ডোজ প্রয়োগের মাধ্যমে। পুলিশ গ্রেফতার করল ওকে। পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখার দায়িত্ব দেওয়া হলো গোয়েন্দা বিভাগকে। গোয়েন্দারা জানাল, ১৯৭৫-১৯৯৮ সাল পর্যন্ত মরফিন প্রয়োগ করে ২১৫ জন রোগীকে হত্যা করেছে শিপম্যান। খুন করার জন্যে সে বেছে নিত বয়স্ক মহিলাদের। ওর কাছে আসা বয়স্ক মহিলারা আর জীবিত অবস্থায় বাড়ি ফিরতে পারত না। তথ্য-

প্রমাণের ভিত্তিতে দোষী সাব্যস্ত হলো সে। আদালত ওকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিল।

শিপম্যানের পুরো নাম হ্যারল্ড ফ্রেডেরিক শিপম্যান। ১৯৪৬ সালের ১৪ই জানুয়ারি তার জন্ম। মৃত্যু ১৩ই জানুয়ারি, ২০০৪। জন্মদিনের আগের দিন জেলের ভেতর ফাঁসিতে ঝুলে সে আত্মহত্যা করে। তার মৃত্যুর পর আরেকটি তদন্ত থেকে জানা যায়, ২৫০+ রোগীকে হত্যা করেছিল সে। এখন পর্যন্ত সিরিয়াল কিলিং-এ পুরো বিশ্বে ওর অবস্থান প্রথম।

বানী ইসরাঈলের মাঝেও শিপম্যানের মতো একজন খুনি ছিল।[২২৩] একে একে ৯৯টি খুন করেছিল সে। ২৫০ জনকে খুন করেও শিপম্যানের মনে অনুশোচনা আসেনি, কিন্তু ৯৯ নম্বর খুন করার পর কেন জানি অনুশোচনা জন্ম নিল ওর মনে। শিপম্যানের সাথে তার তফাতটা ছিল এই জায়গাতেই। তাওবার প্রস্তুতি নিল সে। বাড়ি ছাড়ল নাজাতের পথ পাবার আশায়। পথ চলতে চলতে দেখা হলো এক পাদরির সাথে। পাদরির কাছে জানতে চাইল, 'আমার তাওবা কবুল হওয়ার সম্ভাবনা আছে কি?' পাদরি বলল, 'কক্ষনো না। তুমি মস্ত পাপী। তোমার তাওবার কোনো সুযোগ নেই।'

খুন চেপে বসল তার মাথায়। রাগে-ক্ষোভে শেষমেশ পাদরিকেও হত্যা করল। কিন্তু মনের মধ্যে অনুতাপের যে আগুন জ্বলছিল দাউদাউ করে, তা সে নেভাবে কী দিয়ে! তাই তো এমন কাউকে খুঁজতে লাগল, যে তাওবার পথ বলে দিতে পারে। লোকজন তার আগ্রহ দেখে বলল, 'তুমি অমুক জায়গায় যাও। সেখানে একজন ভালো লোক আছেন। তিনি তোমায় তাওবার পথ বলে দিতে পারবেন।'

রওনা হলো সে। কিন্তু গন্তব্যস্থলে পৌঁছোনোর মতো সৌভাগ্য হলো না। পথিমধ্যেই সে মারা গেল। ইতোমধ্যে দু-দল ফেরেশতা এল। একদল রহমতের, আরেক দল আযাবের। কোন দল ফেরেশতা তার রূহ নিয়ে যাবে, এই নিয়ে তর্ক শুরু হলো।

সে ছিল সিরিয়াল কিলার। গুনে গুনে এক শ মানুষকে হত্যা করেছে। তাই আযাবের ফেরেশতারা তার লাশ নিতে চাইল। কিন্তু রহমতের ফেরেশতারাও ছাড় দিতে নারাজ। কারণ, লোকটি তাওবার উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল। আর তাওবা করার পর ব্যক্তির তো কোনো গোনাহ থাকে না। দু-দল যখন

[২২৩] বুখারি, ৩২২৪।

নিজেদের সিদ্ধান্তে অটল, তখন আল্লাহ্ তাআলা বললেন, 'তোমরা এখান থেকে উভয় দিকের দূরত্ব পরিমাপ করো। (সে যদি তাওবার পথে বেশিদূর এগোয়, তবে তার লাশ রহমতের ফেরেশতারা নিয়ে যাবে)।'

পরিমাপ করে দেখা গেল, তাওবার দিকে এক বিঘত রাস্তা বেশি অতিক্রম করেছিল সে। আসলে রাস্তা সে নিজে অতিক্রম করেনি, আল্লাহ্ তাআলা প্রসারিত করে দিয়েছিলেন জমিনকে। এর ফলে সে তাওবাকারী হিসেবে গণ্য হয় এবং রহমতের ফেরেশতারা তার লাশ নিয়ে যায়।

আল্লাহ্ তাআলা এই লোকটার তাওবায় এতটা খুশি হয়েছিলেন যে, এতগুলো খুন করার পরেও রহমতের দরজা খুলে দিয়েছিলেন তার জন্যে। প্রশস্ত করে দিয়েছিলেন তাওবার পথ। কেন দেবেন না বলো? তিনি যে তাঁর বান্দাকে মা-বাবার চেয়েও বেশি ভালোবাসেন। একটা ছেলেহারা মা তার ছেলেকে ফিরে পেলে যতটা খুশি হয়, বান্দার তাওবায় আল্লাহ্ এর চেয়েও বেশি খুশি হন।

একবার ক'জন কয়েদি হাজির করা হলো রাসূল ﷺ-এর সামনে। এক জন মহিলা কয়েদিদের মধ্যে তার হারানো সন্তানকে খুঁজে বেড়াচ্ছিল। বন্দীদের মধ্যে কোনো শিশুকে দেখলেই তাকে তার সন্তান মনে করে বুকে জড়িয়ে দুধ পান করাতে লাগল। এ দৃশ্য দেখে রাসূল ﷺ বললেন, 'এ নারীটি কি তার সন্তানকে আগুনে নিক্ষেপ করতে রাজি হবে?' সাহাবিরা বললেন, 'আল্লাহ্র কসম! সে কক্ষনো তার সন্তানকে আগুনে নিক্ষেপ করতে পারবে না।' তখন রাসূল ﷺ বললেন, 'সন্তানের প্রতি এ নারীটির যত দয়া, আল্লাহ্ তাআলা তাঁর বান্দাদের প্রতি এর চেয়েও বেশি দয়ালু।'[২২৪]

আল্লাহ্ তাআলা মায়া-মমতাকে এক শ ভাগে ভাগ করেছেন। এর মধ্যে একভাগ সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছেন।[২২৫] মাত্র একভাগ। এই একভাগ ভালোবাসা পেয়েই তো আমরা একে অপরের জন্যে ব্যাকুল থাকি। মা সন্তানের জন্যে সীমাহীন দুঃখ-কষ্ট সয়ে নেয় মুখ বুজে, স্ত্রী নির্ঘুম রাত পার করে স্বামীর জন্যে, সন্তানের স্বাদ-আহ্লাদ পুরো করার জন্যে পিতা জুতোর তলা পর্যন্ত ক্ষয় করে ফেলে—এই একটু ভালোবাসা পেয়েই। মাত্র একভাগ রহমত সমস্ত

---

[২২৪] মুসলিম, ৬৭২৫।

[২২৫] "আল্লাহ তাআলা তাঁর রহমতকে এক শ ভাগে ভাগ করে নিরানব্বই ভাগ নিজের নিকট রেখেছেন এবং এক ভাগ পৃথিবীতে নাযিল করেছেন। রহমতের এ অংশ থেকেই সৃষ্টজীব একে অন্যের প্রতি দয়া করে। এমনকি প্রাণী পর্যন্ত।" [মুসলিম, ৬৭১৯]

সৃষ্টির মধ্যে বণ্টন করা হয়েছে, তাতেই এই অবস্থা! তো যে স্রষ্টা নিজের কাছে নিরানব্বইভাগ রেখেছেন, তার ভালোবাসার মাত্রা কেমন হবে?

তার মাত্রা হলো ইনফিনিটি টু ইনফিনিটি। এ ধারা শুরু হয় ইনফিনিটি দিয়ে, শেষও হয় ইনফিনিটি দিয়ে। এই ভালোবাসা এতটাই অসীম যে, কোনো ক্যালকুলেটরেই এর হিসেব ধরবে না। বান্দার প্রতি আল্লাহর দয়া ও ভালোবাসা অসীম। তিনি এই অসীম ভালোবাসা বরাদ্দ রেখেছেন আমাদের জন্যে। তাই তো বান্দার ভুল স্বীকার করে অনুতপ্ত হওয়াটা তাঁকে বেশি আনন্দিত করে।

"আল্লাহ তাঁর মুমিন বান্দার তাওবার কারণে অধিকতর আনন্দিত হন।"[২২৬]

বান্দা ভুল স্বীকার করলে আল্লাহ তাআলা কতটা খুশি হন, তা বোঝানোর জন্যে একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। ধরো, তুমি সাহারা মরুভূমিতে ভ্রমণ করছ। একা। একটি উট ছাড়া আর কেউই নেই সাথে। তো সফর করতে করতে যখন ক্লান্তি বোধ করছিলে, তখন দেখা মিলল বিশাল এক খেজুর গাছের। ক্লান্ত শরীর এলিয়ে দিলে সে গাছের ছায়ায়। কখন যে চোখ বুজে এসেছে, টেরই পাওনি। চোখ মেলে দেখলে তোমার উট হারিয়ে গেছে। খাবার-পানি যা ছিল, সব নিয়ে উধাও হয়েছে সে। তন্নতন্ন করে খুঁজলে চারিদিক। কোনো সন্ধান মেলাতে পারলে না। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে বসে পড়লে সেখানেই। সন্ধে নেমে এল। ক্লান্ত দেহে আবার ঘুমিয়ে গেলে। কাকভোরে ঘুম ভাঙল তোমার। উঠে দেখলে—হারানো উটটি দাঁড়িয়ে আছে তোমার পাশে। বলো তো, এ অবস্থায় কেমন আনন্দ লাগবে?

এ অবস্থায় তুমি যতটা খুশি হবে, বান্দার তাওবায় আল্লাহ তাআলা এর চেয়েও বেশি খুশি হন।

> "বান্দা যখন আল্লাহর কাছে তাওবা করে তখন তিনি ওই ব্যক্তির থেকেও অধিক খুশি হন, যে তার পাথেয় ও (পানির) মশক একটি উটের ওপর তুলে দিয়ে (সফরের উদ্দেশ্যে) চলতে থাকে এবং এক মরু প্রান্তরে উপস্থিত হয়। তখন তার দুপুরবেলার বিশ্রামের সময় হয়ে আসে, সে গাছের নিচে দিবা-নিদ্রায় চলে যায়। লোকটি ঘুমের ঘোরে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে এবং তার উটটি হারিয়ে যায়। সে জাগ্রত হয়ে (উটের খুঁজে) ওই টিলায় দৌড়ুল, কিন্তু কিছুই দেখতে পেল না।

[২২৬] মুসলিম, ৬৭০৫।

এরপর সে (অন্য টিলায়) দৌড়ুল, কিন্তু সেখানেও কিছু দেখতে পেল না। তারপর সে তৃতীয় আরেকটি টিলায় দৌড়ুল, কিন্তু ওখানেও কিছু দেখতে পেল না। অবশেষে সে যেখানে ঘুমিয়ে ছিল, ওখানে এসে বসে রইল। এমন সময় হাঁটতে হাঁটতে উটটি হঠাৎ তার নিকট ফিরে এল। অমনি সে তার লাগাম চেপে ধরল। আল্লাহ তার মুমিন বান্দার তাওবার কারণে যথাবস্থায় (ওই লোকটি) উট ফিরে পাওয়ায় সময়ের (আনন্দের) চেয়েও অধিকতর আনন্দিত হন।"[২২৭]

বোন আমার, একটিবার ভাবো, বান্দার ফিরে আসাতে আল্লাহর কোনো লাভ বা ক্ষতি নেই। কারণ, আল্লাহ তাআলা এমন সত্তা, যিনি লাভ-ক্ষতির উর্ধ্বে। তবুও তিনি বান্দার তাওবায় সবচেয়ে বেশি খুশি হন। বয়ফ্রেন্ডকে খুশি করার জন্যে পাথরে ফুল ফোটাতে চাও, ঢেউ থামাতে চাও সাগরের, পাড়ি দিতে চাও সাত সমুদ্র আর তেরো নদী... কিন্তু তোমার প্রতিটি নিশ্বাস যাঁর ইচ্ছেধীন, সেই মহামহিম আল্লাহকে খুশি করার জন্যে কি সামান্য তাওবা করতে পারবে না? তুমি কি এতটাই অকৃতজ্ঞ!

এক ব্যক্তি জীবনভর গোনাহ করেছিল। কখনো পুণ্যের ধারেকাছেও যায়নি। যখন তার মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এল, তখন সে পরিবার-পরিজনকে বলল, 'আমি মারা গেলে আমার লাশ পুড়িয়ে ফেলবে। পুড়িয়ে যে ছাই হবে, তার অর্ধেক স্থলে এবং অর্ধেক জলে ফেলে দেবে।' পরিবারের সদস্যরা তাকে জিজ্ঞেস করল, 'এমন অদ্ভুত কাজ কেন করতে বলছেন?' সে জবাব দিল, 'আল্লাহর শপথ! আল্লাহ যদি আমায় ধরতে পারেন তো এমন শাস্তি দেবেন, যা অন্য কাউকে দেবেন না।'

লোকটি জানত তার অপরাধের কথা। আবার আল্লাহর আযাবকেও ভয় করত। কিন্তু আগুনে পুড়ালে আল্লাহ তাআলা তাকে ধরতে পারবেন না, এই মিথ্যে ধারণা থেকেই হয়তো এমনটা করতে বলেছিল। লোকটি মারা যাওয়ার পর পরিবারের লোকেরা তার কথামতো লাশের ছাই মাটিতে এবং পানিতে ছিটিয়ে দিল। কিন্তু এতেও শেষ রক্ষে হলো না তার। আল্লাহ তাআলা স্থলভাগ ও জলভাগকে নির্দেশ দিলেন ছাইগুলো একত্র করার। ছাইগুলো একত্র করে পুনরায় তার আকৃতি দেওয়া হলো। তারপর আল্লাহ তাআলা তাকে বললেন,

[২২৭] মুসলিম, ৬৭০৬।

'তুমি কেন এমনটা করলে?' সে বলল, 'রব আমার, তোমার ভয়ে। আর তুমি তো সর্বজ্ঞ।' তার জবাব শুনে আল্লাহ তাআলা খুশি হলেন এবং তাকে ক্ষমা করে দিলেন।[২২৮]

সুবহানাল্লাহ! কী আশ্চর্যজনক একটি ঘটনা! কী মনোমুগ্ধকর এই ঘটনা! সারাটা জীবন অবাধ্য হওয়ার পরও এই লোকের সাথে আল্লাহ তাআলা কতটা দয়াময় আচরণ করেছেন।

> "আর আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও। নিশ্চয় তিনি অতিশয় ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"[২২৯]

ছোটবেলায় আমরা মজা করে বলতাম, 'Man is mortal—মানুষমাত্রই ভুল।' বাস্তবিকই তাই। মানুষ হিসেবে আমরা কেউই ভুলের উর্ধ্বে নই। প্রত্যেক মানুষই ভুল করে, পাপ করে। আর আমরা যদি পাপ না করতাম, তবে আল্লাহ এমন সৃষ্টি বানাতেন যারা পাপ করত।

> "যে সত্তার হাতে আমার প্রাণ, আমি তাঁর শপথ করে বলছি! যদি তোমরা গোনাহ না করতে তবে আল্লাহ অবশ্যই তোমাদের ধ্বংস করে এমন জাতি সৃষ্টি করতেন—যারা গুনাহ করে ক্ষমাপ্রার্থনা করত এবং তিনি তাদের ক্ষমা করে দিতেন।"[২৩০]

মাঝে মধ্যেই আমরা পরাজিত হই প্রবৃত্তির কাছে। চলতে-ফিরতে ভয়ানক পাপ করে ফেলি। আসলে আমাদের দুর্বলতা কাজ করে পাপের প্রতি। তাই বলে পাপ করে বসে থাকলে চলবে না। যত ভয়াবহ পাপই হয়ে যাক না কেন, তাওবা করতে হবে। যে তাওবা করবে, তাকে ক্ষমা করা হবে। এমনকি তাওবা করার পর কেউ যদি সে গোনাহ পুনরায় করে, সেও ক্ষমা পাবে।[২৩১] তবে কন্ডিশান একটাই—তাওবা করতে হবে।

---

[২২৮] মুসলিম, ৬৭৩০।

[২২৯] সূরা নিসা, ০৪ : ১০৬।

[২৩০] মুসলিম, ৬৭১২।

[২৩১] "যে ব্যক্তি গোনাহ করার পরপরই ক্ষমা চায়, সে বারবার গুনাহকারী গণ্য হবে না। যদিও সে দৈনিক সত্তর বার ওই পাপে লিপ্ত হয়।" [আবু দাউদ,আস-সুনান, ১৫১৪]

> "বান্দা যখন নিজের পাপের কথা স্বীকার করে আল্লাহর কাছে তাওবা করে, আল্লাহ সেই তাওবা কবুল করেন।"[২০২]

আমি জানি, সব সময় একটা ভুল ধারণা কাজ করে তোমার মধ্যে। তুমি ভাবো—'এমন কোনো খারাপ কাজ নেই, যা আমি করিনি। আল্লাহ আমাকে কখনোই মাফ করবেন না।' বিশ্বাস করো, এটা ভুল ধারণা ছাড়া কিছুই নয়। তুমি কি বানী ইসরাঈলের ওই লোকটির চেয়েও বেশি অপরাধ করেছ? আল্লাহ তাআলা যদি তাকে ক্ষমা করে দিতে পারেন, তবে তোমায় কেন দেবেন না?

খামোখা মিথ্যে ধারণা করছ আল্লাহর ব্যাপারে। তুমি কি শোনোনি, দয়াময় আল্লাহ তাআলা নিজের জন্যে দয়া অনুগ্রহের নীতি বাধ্যতামূলক করে নিয়েছেন?

> "তোমাদের রব নিজের প্রতি দয়া ও অনুগ্রহের নীতি বাধ্যতামূলক করে নিয়েছেন। তোমাদের মধ্যে কেউ যদি না জেনে অন্যায় করে, তারপর তাওবা করে ও নিজেকে সংশোধন করে, তা হলে আল্লাহ অতিশয় ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।"[২০৩]

বান্দাকে ক্ষমা করে দেওয়াটাই আল্লাহর নীতি। এই নীতিকে তিনি আবশ্যক করে নিয়েছেন নিজের জন্যে। তিনি শুধু বান্দার চাওয়ার অপেক্ষায় থাকেন—কখন বান্দা ক্ষমা চায়, কখন ফিরে আসে তাঁর দিকে। বান্দা ফিরে এলেই তিনি আপন করে নেন। ভুল বুঝতে পারলে শুধরে নেওয়ার সুযোগ দেন। একবার নয়, বারবার। তবুও কেন তাঁর রহমত থেকে নিরাশ হয়ে অবাধ্যতা বাড়িয়ে যাচ্ছ দিনের-পর-দিন?

কেবল কাফিররাই নিরাশ হয় তাঁর রহমত থেকে।[২০৪] তুমি তো কাফির নও! তাঁর রহমত থেকে নিরাশ হওয়াটা তোমার সাজে না। কেন অনর্থক নিরাশ হবে সে আদালত থেকে, যখন বিচারক নিজেই নির্ভয় দিচ্ছেন?

> "বলে দাও, হে আমার বান্দারা—যারা নিজেদের ওপর অবিচার করেছ—তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হোয়ো না। আল্লাহ

[২০২] মুসলিম, ৬৭৬৫; ইবনু কাসীর, তাফসীরুল কুরআনিল আযীম, ৮/৪৯-৫৫।
[২০৩] সূরা আনআম, ০৬ : ৫৪।
[২০৪] "আর আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হোয়ো না। কেননা, অবিশ্বাসী সম্প্রদায় ছাড়া কেউই আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয় না।" [সূরা ইউসুফ, ১২ : ৮৭]

> সমস্ত গোনাহ মাফ করে দেবেন। নিশ্চয় তিনি অতিশয় ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"[২০৫]

আমি বুঝি না, এরপরেও কেন দিগ্‌ভ্রান্তের মতো ছুটোছুটি করছ এদিক-ওদিক? কেন গড়িমসি করছ আল্লাহর দিকে আসতে? তিনি তো স্পষ্ট করেই বলেছেন, ফিরে এলে সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করবেন। সাথে এক্সট্রা পুরস্কার হিসেবে পুণ্যে পরিণত করে দেবেন তোমার পাপরাশিকে।

> "... যারা তাওবা করবে, ঈমান আনবে ও সৎকাজ করবে—আল্লাহ তাদের পাপগুলোকে পুণ্য দ্বারা পরিবর্তন করে দেবেন। আল্লাহ অতিশয় ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"[২০৬]

স্বপ্নতে অফার পেলে মানুষ ধেইধেই করে নাচতে নাচতে চলে যায় শপিং করতে। ব্র্যান্ডের দোকানে মূল্যছাড় দিলে তো কথাই নেই। লাইন লেগে যায় তরুণ-তরুণীদের। ওসব অফার কিন্তু সীমিত সময়ের জন্যে দেওয়া হয়। কিন্তু মহামহিম আল্লাহর 'গোনাহকে নেকিতে পরিণত করার অফার' সীমিত সময়ের জন্যে নয়। এ অফার প্রতিটি ভোরের জন্যে, যা তুমি ঘুমিয়ে মিস করো। এ অফার প্রতিটি গোধূলির জন্যে, যা হেঁয়ালিতে কাটিয়ে দাও। এ অফার প্রতিটি নিশির জন্যে, যা প্রেমালাপ করে পার করো। যত দিন কিয়ামত না আসবে, এ অফার তত দিনের জন্যে।

> "রাত্তিরে আল্লাহ তাঁর করুণার হাত প্রসারিত করেন, যেন দিনের অপরাধী তাঁর প্রতি ধাবিত হয়ে তাঁর নিকট তাওবা করে। একইভাবে তিনি দিনের বেলায় তাঁর হাত প্রসারিত করেন, যেন রাতের অপরাধী তাঁর প্রতি ধাবিত হয় ও তাঁর নিকট তাওবা করে। পশ্চিম দিগন্তে সূর্য ওঠা না পর্যন্ত (অর্থাৎ কিয়ামত না আসা পর্যন্ত), এভাবে প্রতিনিয়ত চলতে থাকবে।"[২০৭]

তুমিই বলো, এত বড় অফার না নিয়ে বসে থাকাটা কি ঠিক হবে?

কতই না হতভাগা সেসব বান্দা, যারা আসমান ও জমিনের অধিপতির দেওয়া আনলিমিটেড অফার নিতে কার্পণ্য করে। দুনিয়ায় দুটো টাকা সেইভ করার জন্যে

---

[২০৫] সূরা যুমার, ৩৯ : ৫৩।
[২০৬] সূরা ফুরকান, ২৫ : ৭০।
[২০৭] মুসলিম, ৬৭৩৪।

কত দৌড়াদৌড়ি। এ অফিস থেকে ও অফিস, এ শপিং সেন্টার থেকে ও শপিং সেন্টার... প্রতিটি জিনিসের একেবারে পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসেব। কিন্তু আখিরাতের ক্ষেত্রে? একেবারেই গা-ছাড়া ভাব!

এরই মধ্যে হয়তো শয়তান চলে এসেছে। ধোঁকা দিচ্ছে কানে কানে। বলছে— 'ওসব নীতিকথা কথা ছাড়, বুঝলি? মিছেমিছি সোনালি সময়গুলো জলাঞ্জলি দিস না। আল্লাহ মাফ করবেন, বুঝলাম; কিন্তু তোর পাপ যে সমুদ্রের মতো বিশাল, সে খেয়াল আছে? এত এত পাপ কোনো দিনও মাফ করবেন না তিনি। তাওবা-টাওবার কথা বাদ দিয়ে নিজের পথ ধর। এনজয় কর! মস্তি কর! অযথা সময় নষ্ট করিস না তো।'

শয়তান নিজে পথভ্রষ্ট, পথভ্রষ্ট করতে চায় তোমাকেও। খবরদার! কান দিয়ো না ওর কথায়। তোমার প্রতিপালক কারও পরোয়া করেন না। তুমি যদি পাপ করতে করতে আসমান-জমিন পূর্ণ করে ফেলো, তবুও তিনি ক্ষমা করবেন। লিপ কিস, যিনা, ব্যভিচার, সব মাফ করে দেবেন আল্লাহ। সব। এতে শয়তানের যত গা জ্বলে জ্বলুক।

> "আদম-সন্তান, তুমি যত দিন আমায় ডাকতে থাকবে এবং আমার কাছে আশা করতে থাকবে—তোমার পাপ যাই হোক না কেন—আমি তা ক্ষমা করে দেব। এতে আমার কোনো পরোয়া নেই। আদম-সন্তান, তোমার পাপরাশি যদি আকাশের মেঘমালায়ও উপনীত হয়, এরপর তুমি যদি আমার কাছে ক্ষমা চাও, তবুও আমি সব পাপ ক্ষমা করে দেব। এতে আমার কোনো পরোয়া নেই। আদম-সন্তান, তুমি যদি জমিন পরিমাণ পাপরাশি নিয়েও আমার কাছে এসে উপস্থিত হও—আর আমার সঙ্গে কিছু শরীক না করে থাকো—তবে আমি সে পরিমাণ ক্ষমা ও মাগফিরাত তোমায় দান করব।"[২৩৮]

বান্দার জন্যে ক্ষমার দরজা সর্বদাই খোলা রেখেছেন তিনি। বান্দা শুধু একনিষ্ঠভাবে তাওবা করবে, আর তার ওপর অনবরত ক্ষমা ও মাগফিরাত বর্ষিত হবে আল্লাহর তরফ থেকে।

ইশ! এমন সুযোগ আর কোথায় পাবে? কে দেবে? এখনো কি ঘাপটি মেরে বসে থাকবে? ফিরবে না তবুও...

[২৩৮] তিরমিযি, আস-সুনান, ৩৫৪০, আলবানি, আস-সহীহাহ, ১২৭, ১২৮।

শয়তান কি এখনো ধোঁকা দিচ্ছে?

'তোর গোনাহ্ না হয় মাফ হলো, কিন্তু এই গোনাহগুলো যখন প্রকাশ করে দেওয়া হবে, তখন কেমন লাগবে? তুই যে ভালোবাসা দিবসে ওই ছেলেটার সাথে... যখন এগুলোর ফুটেজ সবার সামনে দেখানো হবে, সেদিন বুঝবি মজা! কিয়ামতের দিন অপমানের হাত থেকে কে বাঁচাবে তোকে?'—এসব কানকথা দিচ্ছে ওই নির্লজ্জটা?

বেশ, শয়তানকে জানিয়ে দাও—তার এই ভুয়ো কৌশলও টিকবে না। কেন টিকবে না, সেটা বলছি পরে। আগে একটা কাহিনি বলে নিই। আমার বিশ্বাস, এ কাহিনি শোনার পর শয়তান আর তোমার কানভাঙাতে পারবে না। কাহিনিটা নবি মূসা ﷺ-এর সময়কার। সে সময়ে বানী ইসরাঈল একবার অনাবৃষ্টিতে পড়ল। তো লোকজন গত্যন্তর না দেখে দৌড়ে এল মূসা ﷺ-এর কাছে। বলল, 'আল্লাহর নবি, আপনি দয়াময়ের কাছে দুআ করুন, যেন তিনি আমাদের বৃষ্টি দিয়ে পরিতৃপ্ত করেন।'

লোকদের নিয়ে একটি খোলা মাঠে গেলেন মূসা ﷺ। এরপর দু-হাত তুলে বলতে থাকলেন, 'আল্লাহ্ গো, তুমি আমাদেরকে বৃষ্টি দাও। আমাদের ওপর রহম করো। দুধের শিশু, ক্ষুধার্ত পশুপাখি আর দাড়িপাকা বুড়োদের ওসিলায় আমাদের ওপর মেহেরবানি করো।' লোকজনও তাঁর সাথে হাত উঠাল। মূসা ﷺ-এর দুআর জবাবে আল্লাহ্ তাআলা বললেন, 'তোমাদের মধ্যে এমন এক জন লোক আছে, যে চল্লিশ বছর ধরে আমার নাফরমানি করছে। তুমি বের হয়ে যেতে বলো তাকে। তার কারণে আমি বৃষ্টি দিচ্ছি না।' মূসা ﷺ ঘোষণা দিলেন—'হে ওই গোনাহগার বান্দা, যে চল্লিশ বছর যাবৎ আল্লাহ্র নাফরমানি করছ! বেরিয়ে যাও তুমি আমাদের মধ্য থেকে। তোমার কারণে বৃষ্টি থেকে বঞ্চিত হচ্ছি আমরা।'

মূসা ﷺ-এর ঘোষণা শুনে পাপী বান্দাটি ডানে-বামে লক্ষ করল কেউ বেরোয় কি না। কিন্তু কেউই বেরোল না। সে বুঝতে পারল, এই অনাবৃষ্টির হাত থেকে বাঁচতে হলে তাকেই বেরোতে হবে। কিন্তু এতগুলো মানুষের সামনে নিজের পরিচয় প্রকাশ করতে লজ্জা বোধ করছিল সে। লোকটা ভাবছিল—'বেরিয়ে গেলে লোকদের সামনে মুখ দেখাব কী করে! আর যদি বসে থাকি, তো আমার জন্যে সবাই বৃষ্টি থেকে বঞ্চিত হবে।'—কথাগুলো ভাবার সময় তার দু-চোখ

বেয়ে অনুতাপের অশ্রু গড়িয়ে পড়ল। সে নিজের চেহারা কাপড়ে ঢেকে বলল, 'আল্লাহ গো, চল্লিশ বছর ধরে তোমার নাফরমানি করে যাচ্ছি, কিন্তু আমার অপরাধ আড়াল করে রেখেছ তুমি। বারবার সুযোগ দিচ্ছ আমায়। আজ তাওবা করছি তোমার কাছে। তুমি আমায় কবুল করো।'

লোকটি এভাবে কাকুতি-মিনতি করতেই থাকল। হঠাৎ ঘন মেঘে ছেয়ে গেল আকাশ। গুড়ুম-গুড়ুম ডাক শুরু হলো গগনতলে। বৃষ্টি নামল মুষলধারায়। অবাক হলেন মূসা عليه السلام। তিনি বললেন, 'আল্লাহ, শুকরিয়া তোমার। তুমি আমাদের বৃষ্টি দিয়েছ। কিন্তু কেউ তো বের হয়নি আমাদের মধ্য থেকে।' আল্লাহ তাআলা বললেন, 'মূসা, যার কারণে বৃষ্টি আটকে রেখেছিলাম, তার জন্যেই তো বৃষ্টি দিলাম। তাওবা করেছে সে।' মূসা عليه السلام বললেন, 'আল্লাহ, আমি দেখতে চাই তোমার এই ভাগ্যবান বান্দাকে।' আল্লাহ তাআলা বললেন, 'যখন সে আমার নাফরমানি করত, তখনই তো আমি তাকে অপদস্থ করিনি। এখন কিভাবে আমি তাকে অপদস্থ করব, যখন সে আমার আনুগত্য করছে?'[২৩৯]

কী মনোমুগ্ধকর একটি কাহিনি! কী চমকপ্রদ এক কাহিনি!

বোন আমার, এতটা প্রেমময় আচরণ যিনি করেন, তুমি কিভাবে তাঁর থেকে দূরে সরে থাকবে? কেন হীনম্মন্যতায় ভুগবে, যখন আল্লাহ ভালোবেসে তোমাকে 'বন্ধু' বলে সম্বোধন করেছেন?

> "তোমার কি জানা নেই, আসমান ও জমিনের কর্তৃত্ব (একমাত্র) আল্লাহরই? আর আল্লাহ ছাড়া তোমাদের কোনো বন্ধু বা সাহায্যকারী নেই।"[২৪০]

বন্ধু কি বন্ধুকে অপমান করতে পারে বলো? আল্লাহ তোমাকে কখনোই মানুষের সামনে অপমানিত হতে দেবেন না। প্রশ্নই আসে না। শয়তানকে বলে দাও, 'দুনিয়া ও আখিরাতে আমার বন্ধু ও সাহায্যকারী স্বয়ং আল্লাহ। তিনিই আমাকে অপমানের হাত থেকে বাঁচাবেন। আমার গোনাহ গোপন রাখবেন। আমাকে রহমতের চাদরে ঢেকে নেবেন। তোর কানকথায় কিচ্ছু আসে যায় না।'

---

[২৩৯] আরিফি, মৃত্যুর বিছানায়, পৃষ্ঠা : ১২৬-১২৭।
[২৪০] সূরা বাকারা, ০২ : ১০৭।

> "মনে রেখো, আল্লাহর বন্ধুদের কোনো ভয় নেই। আর তারা বিষণ্ণও হবে না।"[২৪১]

এখন হয়তো মনে হতে পারে, বুঝলাম—তিনি আমার বন্ধু। কিন্তু কাছের বন্ধু না দূরের বন্ধু?

আরে পাগল! তাঁর থেকেও কাছের কেউ আছে নাকি? প্রেমিকের চোখের জল দেখে ভেবো না, ও তোমার সবচেয়ে কাছের। আজ তোমার ভার্জিনিটি আছে, তাই ছায়ার মতো লেগে আছে পেছনে। যেদিন এটা নষ্ট হয়ে যাবে, সেদিন আর ওকে খুঁজে পাবে না। দেখবে—তোমার চোখের সামনেই অন্যের হাত ধরে কনসার্টে যাবে ও। কিন্তু তোমার সেই বন্ধু—যিনি তোমায় সৃষ্টি করেছেন—তিনি কোনো অবস্থাতেই তোমায় ছেড়ে যাবেন না। তুমি শুধু তাঁকে ডাকবে, আর সাথে সাথে তিনি সাড়া দেবেন।

> "আমি তো কাছেই আছি। কেউ যখন আমাকে ডাকে, তখন আমি তাঁর ডাকে সাড়া দিই।"[২৪২]

একবার তাঁকে ডেকেই দেখো না। একবার তাঁর দিকে ফিরেই দেখো না। বিশ্বাস করো, তুমি যদি পুরোপুরি ফিরে আসো আল্লাহর দিকে, তবে বেপর্দা-গীবত-যিনা... যত যা-ই হোক না কেন, ওগুলো কাউকে জানতে দেওয়া হবে না। কাউকে না। এপারে কিংবা ওপারে—গোপন রাখা হবে উভয় জায়গায়। কেবল আল্লাহ ও তোমার মধ্যেই তা সীমাবদ্ধ রাখা হবে।

> "তোমাদের কেউ প্রতিপালকের নিকটস্থ হলে তিনি রহমতের আবরণ বিস্তার করে জিজ্ঞেস করবেন, 'তুমি কি এই কাজ করেছ?' সে বলবে, 'হ্যাঁ।' আল্লাহ আবার জিজ্ঞেস করবেন, 'তুমি কি এই কাজ করেছ?' সে তখনো বলবে, 'হ্যাঁ।' আল্লাহ এভাবে তার স্বীকারোক্তি নেবেন। তারপর বলবেন, 'আমি দুনিয়ায় তোমার ওসব (পাপ) গোপন রেখেছিলাম। আমি আজও তোমার জন্যে তা ক্ষমা করে দিলাম।'[২৪৩]

---

[২৪১] সূরা ইউনুস, ১০ : ৬২।

[২৪২] সূরা বাকারা, ০২ : ১৮৬।

[২৪৩] বুখারি, ৭০০৬; মুসলিম, ৬৭৫৯।

বোন আমার, সাহস করে পদক্ষেপটা নিয়েই ফেলো না। তুমি যতটুকুন এগোবে, আল্লাহর রহমত তার চেয়েও দ্বিগুণ পরিমাণে অগ্রসর হবে। যদি এক বিঘত এগোও, তবে তাঁর দয়া ও ক্ষমা এক হাত পরিমাণ প্রসারিত হবে। যদি হেঁটে অগ্রসর হও, তবে তাঁর রহমত দৌড়ে আসবে তোমার দিকে।

> "আমার বান্দা আমার সম্পর্কে যেমন ধারণা করে, আমি তেমনই। যখন সে আমাকে স্মরণ করে, তখন আমি তার সঙ্গে থাকি। সে যদি আমাকে মনে মনে স্মরণ করে, আমিও তাকে মনে মনে স্মরণ করি। যে যদি আমাকে কোনো জমায়েতে স্মরণ করে, আমি তাকে তাদের চেয়ে উত্তম জমায়েতে স্মরণ করি। সে যদি আমার দিকে এক বিঘত পরিমাণ এগিয়ে আসে, আমি তার দিকে এক হাত পরিমাণ এগিয়ে যাই। সে যদি আমার দিকে এক হাত এগিয়ে আসে, আমি তার দিকে প্রসারিত বাহু পরিমাণ এগিয়ে যাই। আর সে যদি আমার দিকে হেঁটে আসে, আমি তার দিকে দ্রুত এগিয়ে যাই।"[২৪৪]

আমি বুঝি না, পরকালের ব্যাপারে মানুষ এতটা ন্যাকামো করে কিভাবে। যে জীবনের সাথে জড়িয়ে আছে চিরস্থায়ী সুখ-শান্তি, কিভাবে এড়িয়ে যায় সে জীবনকে। মানুষ কি ঘুণাক্ষরেও ভাবে না, আল্লাহর সামনে তাকে দাঁড়াতে হবে একদিন?

বোন আমার, কেন খামটি মেরে বসে আছ পাষাণীর মতো? আমার কথাগুলো কি তোমার হৃদয়ে পৌঁছোচ্ছে না?

পৌঁছোবে কী করে। হৃদয়ে তো আল্লাহভীতি নেই। ওখানে তো রাখোনি আল্লাহকে। ওখানটায় সুদর্শন পুরুষ বাস করে। সেদিন গুনগুন একটা গান গাইছিলে না—'মন পাজরে শুধু তুমি আছ, কেউ তো আর থাকে না। ভালোবাসি আমি শুধু তোমায়, চোখেতে চোখ রাখো না...' তোমার মনে যে রবের জন্যে কোনো জায়গা নেই, তা কি আর খাতা-কলমে লিখে বোঝাতে হবে? হৃদয়ে যদি আল্লাহর জন্যে সামান্য জায়গাও থাকত, তবে তো তাঁর বিরহে একটু হলেও কাঁদতে। কেঁদেছিলে কখনো? বলো তো, শেষ কবে তাঁর জন্যে চোখের জল ফেলেছিলে?

---

[২৪৪] বুখারি, ৭৪০৫; মুসলিম, ৬৭০০।

দেখতে দেখতে এতগুলো বছর পেরিয়ে গেল। শৈশব থেকে চলে এলে যৌবনে। দেখবে, একদিন মৃত্যু এসে ঠিক কড়া নাড়বে দরজায়। চলে যাবে দুনিয়া ছেড়ে। সবকিছু পেছনে ফেলে। শুরু হবে নিঃসঙ্গ কবরের জীবন। সে জীবন পার করার পর দাঁড়াবে আল্লাহর সামনে। তিনি জিজ্ঞেস করবেন, 'হে অমুক, আমি কি তোমায় সম্মান দান করিনি... মিলিয়ে দিইনি তোমার জুটি, আরাম-আয়েশের মধ্যে পানাহারের ব্যবস্থা করিনি?'[২৪৫] তিনি আরও বলবেন, 'হে অমুক, তোমার যৌবন কিভাবে কাটিয়েছ?'[২৪৬]

'সেজেগুজেই কূল পাইনি, কিছু করব কিভাবে?'—উত্তরে এটা বলবে নাকি?

ওহে অভাগী, কোন মুখ নিয়ে সেদিন আল্লাহর সামনে দাঁড়াবে?

সেদিন অপমানিত হওয়ার চেয়ে সাবধান হয়ে যাও আজই। এখনই। ফিরে এসো আল্লাহর দিকে। আল্লাহর দিকে ফিরে আসতে গেলে শিরনি রান্না করে খাওয়াতে হবে না। গিলাফ চড়াতে হবে না মাজারে। হুজুর ডেকে মিলাদও পড়াতে হবে না। ওগুলো হিন্দি কিংবা বাংলা সিনেমায় লাগে। বাস্তবে তাওবা করতে ওসবের প্রয়োজন পড়ে না। তাওবার পদ্ধতিটা খুবই সিম্পল। বলছি শোনো। আচ্ছা, তোমার কি ওজু আছে? না থাকলে ওজুটা করে এসো। একটিবার আমার অনুরোধ রাখো। প্লিজ, যাও।

> "কোনো ব্যক্তি যদি গোনাহ করে ফেলে, এরপর সে উঠে পবিত্রতা হাসিল করে সালাত আদায় করে এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায়, তবে আল্লাহ তাআলা তাকে অবশ্যই ক্ষমা করে দেন।"[২৪৭]

এখন দু-রাকআত সালাত পড়ো। জাস্ট দু-রাকআত। এরপর বলো, "রব আমার, তুমিই বাদশাহ। তুমি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তুমি আমার প্রভু আর আমি তোমার দাস। আমি নিজের ওপর জুলুম করেছি, আর এখন অপরাধ স্বীকার করে ক্ষমা চাচ্ছি। সুতরাং আমার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করে দাও। নিশ্চয়ই তুমি ছাড়া আর কেউ অপরাধসমূহ ক্ষমা করতে পারে না। তুমি আমায় উত্তম পথে পরিচালিত করো। তুমি ছাড়া কেউ উত্তম পথে পরিচালিত করতে পারে না। কেউ মন্দ আচরণ থেকে আমায় বিরত রাখতে পারে না। রব আমার,

---

[২৪৫] মুসলিম, ৭১৬৯।
[২৪৬] তিরমিযি, আস-সুনান, ২৪১৬।
[২৪৭] তিরমিযি, আস-সুনান, ১৩৯৫।

আমি হাজির তোমার কাছে, আর প্রস্তুত আছি তোমার আদেশ পালনে। সমস্ত কল্যাণ তোমারই হাতে। আর কোনো অকল্যাণ বর্তায় না তোমার প্রতি। আমি তোমার সাহায্যেই প্রতিষ্ঠিত আছি এবং তোমার দিকেই প্রত্যাবর্তন করছি। তুমি মঙ্গলময়। সুমহান। আমি তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি আর তোমার দিকে ফিরে আসছি।"[২৪৮]

তুমি দেখে নিয়ো, ফিরে এলে সামান্য কষ্টেই মেজাজটা আর বিগড়ে যাবে না। খামোখা ঝগড়া লাগবে না কারও সাথে। না পাওয়ার বেদনা তাড়া করবে না কখনো। হতাশা নামক শব্দটা হারিয়ে যাবে তোমার অভিধান থেকে। অন্যরকম প্রশান্তি আসবে হৃদয়ে। ফুরফুরে লাগবে সবকিছু। কেমন জানি একটু বেশিই সতেজতা অনুভব করবে। আকাশটা আগের চেয়ে নীল মনে হবে। দখিনা বাতাসটাকে উপলব্ধি করতে পারবে আরও প্রবলভাবে। আকাশের জোছনা কথা বলবে তোমার সাথে। গগনের মেঘ ইশারায় ডাকবে তোমাকে। বৃষ্টিবিলাস পুলকিত করবে। কাননের সুবাসিত হাওয়া মুগ্ধ করবে বারেবারে। আপন মনে হবে রোদ্দুরকে। ঢেউয়ের ভাষা তুমি বুঝতে পারবে। পাহাড়ের কলতান, ঝর্নার বহমান ধারা, পুবালি বাতাস, শীতের শিশির, ফুলের সুবাস, জোনাকির আলো—সবকিছু কেমন যেন নতুন মনে হবে। কেমন জানি এক অন্যরকম রোমাঞ্চ অনুভব করবে। এই তুমি এক নতুন তুমিতে রূপান্তরিত হবে।

ওগো ইসলামের সন্তান, তোমার মধ্যেই খাদিজা, আয়িশা আর ফাতিমা-রা লুকিয়ে আছে। নিজের সে প্রতিভাকে গলাটিপে হত্যা কোরো না। তাকে বিকশিত হতে দাও। পৃথিবী তোমার প্রতীক্ষায়... তুমি ফিরবে বলে...

[২৪৮] দুআটা নবিজি ﷺ আমাদের শিখিয়েছেন। [নাসাঈ, আস-সুনান, ৯০০; আলবানি, সহীহ আত-তিরমিযি, ৩৬৬১]

তুমি যে পথে হাঁটছ, ওটা অন্ধকারের পথ। বিন্দুমাত্র আলো নেই সেখানে। ও পথ যতই পাড়ি দেবে, ততই হারিয়ে যাবে নিকষকালো আঁধারে। তুমি অন্ধকারে হাঁটবে আর পথহারা হবে। দুরুদুরু বক্ষে তোমার গা শিউরে উঠবে বারে বারে। ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত হয়ে পা পিছলে হঠাৎ তলিয়ে যাবে ভয়ানক খাঁদে। একা, একাকী পড়ে রইবে ওখানে। ধীরে ধীরে আঁধারের ভীতি তোমায় গ্রাস করে নেবে। বেদনায় কাতরাতে থাকবে তুমি। দুঃসহ যন্ত্রণায় তড়পাতে থাকবে। কিন্তু কোনো সাথি খুঁজে পাবে না। কেউ সাড়া দেবে না তোমার আর্তচিৎকার শুনে। এরপর... এরপর একরাশ হাহাকার আর বুকভরা বেদনা নিয়ে সমাপ্তি ঘটবে একটি নির্মল জীবনের।

পথিক! তোমায় আলোর পথে ডাকছি আমি। এ পথে কোনো আলোআঁধারি খেলা নেই। কালোছায়ার ভীতি নেই। নেই আঁধারের বাঁদুরের কোনো উৎপাত। এখানে চারিদিকে কেবল আলো আর আলো। আলো থেকে ছিটকে-পড়া রশ্মিগুলো তোমায় ডাকছে হাতছানি দিয়ে। আলোক-আভা তোমার সাথে আলিঙ্গন করার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে। এ পথে হাঁটলে তুমি কখনো পথহারা হবে না। হারিয়ে যাবে না চোরাবালির অতল তলে। এখানে কেবল শান্তি আর শান্তি। সুখ আর সুখ। এ পথে চলতে থাকলে নিশ্চিন্তে-নির্ভয়ে পৌঁছে যাবে এর শেষ প্রান্তে। এর শেষটা যে মিশে আছে জান্নাতের সাথে।

তুমি ফিরবে না?

শিকদার ম্যানশন
১২ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মুঠোফোন: ০১৮৮৮৭১৭১২৯